পাঁচটি বাংলা উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাসে যুগান্তরের সূচনা

[illegible]

Dhaka University Library
400477

400477

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

২০০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

পাঁচটি বাংলা উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাসে যুগান্তরের সূচনা পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ড. আনিসুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। এ-বিষয়ে তাঁর উপদেশ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার কাজের সহায়ক-শক্তি। প্রথম থেকে ছুটি না নিয়ে গবেষণা কর্মের দুঃসাধ্য প্রয়াসটি শেষপর্যন্ত পরিণতি লাভ করলো তাঁরই সস্নেহ-সহযোগিতায়।

গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে সুচিন্তিত পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. হায়াৎ মাহমুদ একটি দুস্প্রাপ্য মূলগ্রন্থ জোগাড় করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ ও ঋণী করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. স্বপন মজুমদারও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনার সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌গ্রন্থাগার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে এসব গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রবীন্দ্রভবনের শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রতনকুমার দাস ও মুহম্মদ আমান উল্লাহ্‌র সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক প্রয়াত মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌র সাহায্যও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

অভিসন্দর্ভের পরিমার্জনা ও মুদ্রণের জন্য শেষ বছরটিতে কর্মস্থলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ সময়টিতে আমার ছুটি মঞ্জুর করায় আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণার কাজ সমাপ্ত করতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমাকে নিরন্তর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে সাগর রায় ও আবদুল জব্বার। মুদ্রণকর্মে সতর্কতা এবং তৎপরতার জন্য গ্রাফিক্স এ্যাড-এর কর্মীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

400477

স্বপ্না রায়
বাংলা বিভাগ
ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
কুমিল্লা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	১
প্রথম অধ্যায় বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা	৪
দ্বিতীয় অধ্যায় গোকুল নাগ ঃ পথিক	২৩
তৃতীয় অধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ পাঁক	৪৫
চতুর্থ অধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ বেদে	৭১
পঞ্চম অধ্যায় জগদীশ গুপ্ত ঃ অসাধু সিদ্ধার্থ	১০২
ষষ্ঠ অধ্যায় বুদ্ধদেব বসু ঃ সাড়া	১৩৯
উপসংহার	১৭৭
গ্রন্থপঞ্জি	১৮৮

400477

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

যে-কোন সাহিত্যে কোন যুগ বা যুগান্তরের কাল স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা কঠিন। কেননা সাহিত্যে যেমন রাতারাতি নতুন প্রবণতার সূচনা হয় না, তেমনি পুরনো প্রবণতাও আকস্মিকভাবে তিরোহিত হয়না। তবু কোন কোন প্রবণতার আবির্ভাব, স্পষ্টতা ও প্রাধান্যের দিকে লক্ষ রেখে আমরা নতুন যুগ চিহ্নিত করায় প্রয়াস পাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পাশ্চাত্যের নানা সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাব নির্দেশ করা হয়েছে। আবার একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। এ যুগের নানাধরনের প্রবণতাকে নানারকম আন্দোলন বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তবে এসবের সাধারণ লক্ষণ উনিশ শতকের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে নতুন ভাব ও রূপের অনুসন্ধান করা।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা উনিশ শতকের প্রথম থেকে আধুনিক যুগ গণ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু খানিক পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে, খানিক আমাদের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রবণতার বিকাশের ফলে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাংলা সাহিত্যে যে- ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়, তাতেও আধুনিক বা অতি-আধুনিক যুগের আবির্ভাব ঘোষিত হয়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *ভারতী* (১৯১৫-২৩) পত্রিকায় এর পূর্বসূচনা, দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগ- সম্পাদিত *কল্লোলে* (১৯২৩-৩০) তার পরিণতি। এক্ষেত্রেও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা হয়েছে এবং রচনারীতিতে প্রয়াস পাওয়া গেছে নতুনত্ব আনার। বিশ্বাসের জায়গায় দেখা দিয়েছে জিজ্ঞাসা ও সংশয়, প্রথাগত শিক্ষার বদলে যুক্তি ও বিচারবোধ চালনা করেছে লেখককে।

আমাদের সাহিত্যের এই পর্বকে যে- নামই দেওয়া হোক না কেন— আধুনিক, অতি-আধুনিক বা *কল্লোল* যুগ— পরিবর্তনের যে হাওয়া একটা বয়েছিল, তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। বনফুলের মতো বিশিষ্ট লেখক অবশ্য নতুন যুগের কথা স্বীকার করেননি, বরঞ্চ তাকে হুজুগ বলে উপহাস করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক কালের বিতর্ক ও সমালোচনা থেকে এবং পরবর্তীকালের সাহিত্য আলোচনায় এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি মেলে। এটাকেই আমরা যুগান্তর বলতে চেয়েছি— একটা বড় সময়ের মধ্যেও খণ্ড খণ্ড ভাগ থাকতে পারে। এই যুগান্তরের সূচনা কখন, কীভাবে, কাদের হাতে ঘটল, এ-প্রশ্ন স্বভাবতই দেখা দেয়। একালের সমগ্র সাহিত্যে নয়, শুধু বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা তা সন্ধান করতে চেয়েছি। আমাদের মনে হয়েছে, তথাকথিত অতি-আধুনিকতার সূচনাপর্বে পাঁচটি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই পাঁচটি উপন্যাস হলো গোকুল নাগের (১৮৯৪-১৯২৫) *পথিক* (১৯২৫), প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-৮৮) *পাঁক* (১৯২৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-৭৬) *বেদে* (১৯২৮), জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৯২৯), বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) *সাড়া* (১৯৩০)। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০— এই পাঁচবছরের মধ্যে উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে *পথিক* ও *বেদে* ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় *কল্লোল* পত্রিকায়। এই পাঁচজন লেখকের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন জগদীশ গুপ্ত এবং সর্বকনিষ্ঠ বুদ্ধদেব বসু। বয়সে বাইশ বছরের পার্থক্য। তবু এঁদেরকে এক প্রজন্মের লেখক বলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরা অসঙ্গত হবে না। উল্লিখিত সবগুলি রচনাই লেখকদের প্রথম উপন্যাস– যদিও জগদীশ গুপ্তের *লঘুগুরু* (১৯২৯) বেরিয়েছিল *অসাধু সিদ্ধার্থের* আগে। *পথিকে* আছে কলকাতা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব জীবনচিত্র; *পাঁকে* দরিদ্র বস্তিবাসীর কুৎসিত জীবন অঙ্কিত হয়েছে– এর অকস্‌ফোর্ডে শিক্ষিত নায়কও স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নিজেকে নামিয়ে এনেছে হতশ্রী দরিদ্রদের পর্যায়ে। *বেদে* উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অনবগুণ্ঠিত যৌনতা– প্রায় শ্রেণীনিরপেক্ষভাবে। *অসাধু সিদ্ধার্থে* পাশ্চাত্ত্য বাস্তবতাবাদের আদলে পাই দীন ও কুশ্রী জীবনযাত্রার ছবি– পাত্রপাত্রীরা যদিও সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তই। *সাড়ায়* রয়েছে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র, তার জোরটা পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক ভাবুকতার ওপরে।এর মধ্যে আমরা নবযুগের যে-লক্ষণ দেখতে পাই, তা হলো, এতকাল পর্যন্ত সাহিত্যে অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার ছবি, জুগুপ্সিত জীবনধারার উদ্‌ঘাটন, যৌনতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও বন্ধনহীনতার প্রতি আকর্ষণ। এইসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপরে জোর পড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। সংশয় জেগেছে প্রচলিত মঙ্গলচেতনায়, দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতায়, নিরীহ সামাজিক হওয়ার পলায়নপর মনোবৃত্তিতে। ব্যক্তি চেয়েছে সমাজকে ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে অতিক্রম করে নিজের দৈন্য বা সম্পদ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। উপন্যাসগুলি সম্পর্কে এই প্রাথমিক ধারণা থেকে আমরা অগ্রসর হয়েছি তার বিচার-বিশ্লেষণে এবং অনুসন্ধান করেছি এসব উপন্যাসসংশ্লিষ্ট ঔপন্যাসিকদের পরবর্তী রচনাকে এবং অন্য ঔপন্যাসিকদের কতখানি প্রভাবান্বিত করেছে।

অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে বিবৃত হয়েছে উদ্ভবকাল থেকে মোটামুটি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের বিকাশের ধারা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মনোবিশ্লেষণ এবং প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব কীভাবে বিকশিত হয়েছে, এখানে তা লক্ষ করার চেষ্টা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের রূপের বদল হচ্ছিল এবং পাশ্চাত্য উপন্যাসের প্রভাব, অনুসরণ ও অনুবাদ যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করেছি। *কল্লোল* পত্রিকার আবির্ভাব এবং তাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিতর্কের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এখানে এবং এই আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতও আলোচিত হয়েছে।

এরপর পাঁচটি অধ্যায়ে যথাক্রমে গোকুল নাগের *পথিক*, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *বেদে*, জগদীশ গুপ্তের *অসাধু সিদ্ধার্থ* ও বুদ্ধদেব বসুর *সাড়া* উপন্যাসের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচনা করেছি– তা থেকে লেখকদের নিজস্ব পরিবেশের একটা পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তারপর উপন্যাসটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। সবশেষে লেখকের অন্যান্য উপন্যাসে তাঁর প্রথম রচনার ছায়াপাত কতটা ঘটেছে, তা দেখার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, গোকুল নাগ একটিই উপন্যাস লিখেছিলেন, তাই তাঁর ক্ষেত্রে শেষোক্ত অনুসন্ধানের সুযোগ ছিল না।

ছয়টি অধ্যায়ের শেষে আছে উপসংহার। এখানে আমরা প্রথমে সন্ধান করতে চেয়েছি আলোচিত পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে সাযুজ্য। এই সাযুজ্যই নির্দেশ করবে যুগলক্ষণকে। সে- লক্ষণ ঔপন্যাসিকদের নিজেদের রচনায় কতখানি স্থিতিলাভ করেছিল, তা আমরা পাঁচটি উপন্যাসের স্বতন্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

করেছি। উপসংহার অংশে তার পুনরুক্তি করে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে এই পাঁচজন ঔপন্যাসিকের প্রথম রচনার জের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে কতটা টানা হয়েছিল, তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি।

বলা বাহুল্য, অভিসন্দর্ভের সীমিত পরিসরে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হয় নি। যদিও আলোচ্য উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি ভাব, ভাষা ও রচনারীতির প্রতি, কিন্তু তাঁদের পরবর্তী উপন্যাস এবং পরবর্তীকালের উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা মূলত দেখতে চেয়েছি ভাবের বিস্তারকে। সবক্ষেত্রে প্রভাবের সন্ধান সঙ্গত নয়। তাই এই আলোচনাকে এভাবে দেখা সঙ্গত হবে না। কিন্তু আলোচিত পাঁচটি উপন্যাস সমকালীন আলো-বাতাস থেকে যে ভাব আহরণ করে নিয়েছিল, তার মধ্যে অভিনবত্ব ও সাহসিকতা যদি থেকে থাকে, তাহলে তা অন্যদেরও প্রেরণা দেবে, এটা স্বাভাবিক। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে-ভাবের তিরোভাব ঘটাও স্বাভাবিক। কিন্তু একটা সময়ে তা যদি আমাদের সাহিত্যধারাকে ভিন্নখাতে অগ্রসর করে থাকে, তাকেই আমরা যুগান্তর বলব।

এই অভিসন্দর্ভে উপন্যাস থেকে যেখানে আমরা উদ্ধৃত করেছি, সেখানেই সংক্ষেপে ওই উপন্যাসের কিংবা ওই ঔপন্যাসিকের রচনাবলীর খণ্ড ও পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা

মানুষের গল্প শোনার সহজাত আগ্রহ থেকেই সাহিত্যের জন্ম। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপন্যাস– যা কিনা সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক কালের সৃষ্টি– তার উদ্ভবের মূলে যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনজনিত, তেমনি মানুষের মানসিক পরিবর্তনজনিত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ, অন্যদিকে ব্যক্তিমানসের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি এ পরিবর্তনের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। গদ্যের সূত্রপাত হতেই, নানানপথে চলতে চলতে একসময়ে সাহিত্যধারায় সূচিত হয়ে যায় উপন্যাসের পথ। উপন্যাস গদ্যনির্ভর। মানবজীবন ও সমাজপটভূমি মিলিয়ে সামগ্রিক জীবনরূপের সন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা উপন্যাসের বিষয়। এ সামগ্রিকতা রূপায়ণ-প্রয়াসের মধ্যে জীবন সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধানও মেলে। জীবন সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য তাঁর ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। ধ্যানধারণার পার্থক্যের জন্যেই একই বিষয়াশ্রয়ী হয়েও দু'টি উপন্যাস ভিন্ন হতে বাধ্য। বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মননসমৃদ্ধ কল্পনাই ঔপন্যাসিকের প্রধান অবলম্বনের বিষয়। লেখকের নির্বাচনীক্ষমতা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ ঘটনা, চরিত্র ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি নির্বাচনের মাধ্যমেই জীবনের গোটারূপকে আভাসিত করে তোলেন তিনি। সামগ্রিক জীবনরূপের সন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা মেলে উপন্যাসে। এ বিচারে উপন্যাস একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধক শিল্পমাধ্যম। আধুনিক মানুষের সুতীব্র জীবনপিপাসা উপন্যাসের জন্মের উৎস। নিজের জীবন-প্রতিবিম্বকে প্রত্যক্ষ করতে চায় সে উপন্যাসের অবয়বে। শুধু কাহিনী, চরিত্র ও তাদের ক্রিয়াকলাপকেই উপন্যাসের বিষয় বলা যায় না। এর মূলে রয়েছে 'বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যের রূপক'[১]। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন বা বক্তব্য আবার সৃষ্ট শিল্পের মর্মনিহিত ব্যাপার। অর্থাৎ শিল্পের কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনাপরম্পরা– সবকিছুর সমন্বয়েই এর বক্তব্য নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবার ও পরিবর্তনশীল সমাজের সম্পর্ক তার বিস্তৃত পটভূমির বিষয়টিও আসে। তার কর্মময় বা অনুভূতিময় সংবেদনশীল সত্তাকে রূপময় করে তোলেন লেখক। উপন্যাসকার যেহেতু সমাজেরই মানুষ এবং এ সমাজ-অবয়ব আবার সব দেশকালে একইরকম নয়, তাই দেশকাল সাপেক্ষে তাঁর বিষয়ভাবনা, কাহিনীসংস্থাপন, দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য এগুলোরও পার্থক্য হয়। দেশকাল-আশ্রিত এই বিষয়গুলো থেকেই উপন্যাসের একটা শিল্পরূপ গড়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনী কিংবা চরিত্র একক বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সমষ্টির মূল্যবোধের নানা দিক এদের সঙ্গে জড়িত। কাজেই পটভূমিও উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঔপন্যাসিকের বিষয়চেতনা তাঁর সৃষ্ট শিল্পের প্রকাশচেতনা কিংবা আঙ্গিকসচেতনতা নয়, এ আরো ব্যাপক কিছু। উপন্যাসে সৃষ্ট পরিস্থিতির সঙ্গে বাস্তবের মিল ও অমিল এবং এই অমিলজনিত অসমন্বয়ের সমস্যা-যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। এ সমস্যাযন্ত্রণা অবশ্যই আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা। ঔপন্যাসিক তাঁর বিষয় স্থির করেন কাল, সমাজ, ইতিহাস এবং ব্যক্তিমানস সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থেকে। উপন্যাসের বিষয় ক্রমেই ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

বাহ্যিক জীবন, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিকে অতিক্রম করে তার অন্তর্লোককে আশ্রয় করছে, প্রাধান্য পাচ্ছে মানুষের অনুভূতির জগৎ।

পৃথিবীর সবদেশেই বুর্জোয়াশ্রেণীর উত্থান, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন, পত্রপত্রিকার প্রকাশ ও তার মাধ্যমে পাঠকসমাজের সৃষ্টি—এগুলো উপন্যাসের জন্ম এবং বিকাশে সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নগরসমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ। মূলত এরাই উপন্যাসের লেখক এবং পাঠক। আধুনিক জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, নগরকেন্দ্রিক শ্রমজীবী, চাকুরিজীবী ও পেশাজীবীশ্রেণী গড়ে ওঠায়,নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচনে—সবমিলিয়ে নতুন সমাজমানসের অনিবার্য প্রভাবের ফল এই উপন্যাস। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক জীবন প্রধানত ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্র-আশ্রয়ী। এসবের প্রসার হলে স্বভাবতই কর্মসূত্রে বিভিন্নশ্রেণীর উদ্ভব হয় সমাজে। তাদের জীবন জীবিকার নানাবিধ দাবি ও চিত্র দিনে দিনে তৈরি করে চলে উপন্যাসের উপকরণ। স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপন্যাস দেখা দেয় একটি জনপ্রিয় সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কঠোর যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিক ভাবধারা মানুষের চিন্তাজগৎকে নাড়া দেয়। ব্যক্তিমানুষের বিদ্রোহ, মানুষের নিভৃত আত্মার আনন্দ, সাধারণ মানুষের জন্যে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রবল হয়ে ওঠে। পরিবেশবাদ, বংশগতি এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ যখন চিন্তালোকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তখন দেখা দিয়েছিল ন্যাচারালিজম বা প্রাকৃতবাদ। তারপর দেখা দেয় বাস্তববাদ। পরবর্তী পর্যায়ে জোর পড়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং অর্থনৈতিক জীবনের দিকটিতে।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা ঊনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে উপন্যাস সৃষ্টি-প্রয়াসের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যে ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ইউরোপে উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছিল, বাংলাদেশে তার অভাবে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। ঊনিশশতকে কলকাতা প্রায় হঠাৎই নগরীর মহিমায় উন্নীত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানি একে রাজধানী করেছিল, ফলে ইংরেজি শিক্ষা, মুদ্রাযন্ত্র, শিল্পকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা—এইসব দিক আশ্রয় করে কলকাতা নগরী এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। নতুন অর্থনীতিকে আশ্রয় করে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠে নগর কলকাতায়। শিক্ষাদীক্ষালব্ধ রুচি, বিশেষকরে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনা, শিক্ষা ও শিল্পসংস্কৃতির প্রভাব ক্রমেই এদের মানসিকতা ও জীবনবোধকে বদলে দিচ্ছিল। এ যুগের সাহিত্য, বিশেষকরে উপন্যাস-প্রয়াস শুরু হয়েছিল এদেরই হাত দিয়ে এবং এদেরই জীবন ও চিন্তাভাবনাকে আশ্রয় করে। নগর কলকাতার অগ্রগতি, মধ্যবিত্তের উদ্ভব, বিকাশ ও সৃষ্টিপ্রয়াসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যধারার এক অন্তর্গূঢ় যোগসূত্র বর্তমান। উপন্যাস-বিকাশের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল ছিল আধুনিক যুগের সমাজ-মানসের নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও অস্থিরচিত্ততা।

উপন্যাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে পাশ্চাত্যের ভূমিকাকে গৌণ বিবেচনা করা চলে না, বরং এসবকিছুকে আত্তীকৃত করেই উপন্যাসের উদ্ভব, বিকাশ ও অগ্রগতি। বাস্তব জীবনের বিচিত্র উপলব্ধির রূপায়ণ দেখা যায় বাংলা উপন্যাসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের কলকাতার জীবন-অবয়ব,

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার প্রচলন, মানুষের কৌতূহলী মানসতৃষ্ণা– সবমিলে তৈরি হয়েছিল উপন্যাসের প্রাথমিক পটভূমি। *সমাচার দর্পণ* (১৮২১) পত্রিকায় 'বাবু' চরিত্র তুলে ধরার মধ্যদিয়ে নক্‌শা ও ব্যঙ্গচিত্র রচনার সূচনা হয়। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৫৮) *নববাবু বিলাস* (১৮২৩), হ্যানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্সের *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) বাংলা উপন্যাসের পথ নির্মাণে সাহায্য করেছিল। ক্রমান্বয়ে পাঠকের মানসপরিবেশও উপন্যাসের অনুকূলে গড়ে উঠতে থাকে। চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নগরসম্পৃক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তুলেছিল ধর্মীয় ও সামাজিক নানাবিধ সংস্কার-আন্দোলন, গড়ে উঠেছিল গ্রামকেন্দ্রিক কৃষক-সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। ফলে, বিকাশমান মধ্যবিত্তের চিন্তার জগৎ আলোড়িত হয়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন জিজ্ঞাসায়।

উনিশশতক নবজাগরণের কাল, প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মবোধ থেকে এ সময়কার ব্যক্তিচেতনা ও মানবপ্রত্যয় দ্বিধামুক্তির পথে অগ্রসর হতে শুরু করে। উনিশশতকীয় বাঙালি শিল্পিমানস উদ্দীপিত হয়েছিল যে মুক্তিপিপাসা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে, তা থেকেই নারী বিবেচিত হতে শুরু করে স্বতন্ত্র সত্তা রূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীর গুরুত্ব তাই এতো বেশি। বাস্তবতার বাধার পাশ কাটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) লেখেন রোমান্স এবং বাস্তবজীবনের চিত্র অঙ্কন করেন মাত্র কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসে। তবু প্রাত্যহিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের পাত্রপাত্রীর দেখা পাওয়া সেকালে ছিল দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের উপযোগী রসবাহী গদ্য তৈরি করে নেন। ঘটনার গতিময়তা, চরিত্রের মর্মোদ্‌ঘাটন, গল্প বলার অসাধারণ নৈপুণ্য, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উপন্যাসকে শিল্পগুণ ও জনপ্রিয়তা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *চোখের বালির* (১৯০৩) প্রকাশ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পথই, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, অনুসৃত হয়েছিল। যেমন, রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯) লিখেছিলেন ঐতিহাসিক রোমান্স ও সামাজিক উপন্যাস। নতুনত্ব এনেছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ব্যঙ্গ উপন্যাস লিখে এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) সামাজিক উপন্যাসে রূপকথার রস সঞ্চার করে।

রবীন্দ্রনাথের '*চোখের বালির* প্রকাশ থেকে বাংলা উপন্যাসে নতুন যুগের সূচনা হয়। সমালোচক যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, দু'টি লক্ষণের দ্বারা এই যুগ-পরিবর্তন সূচিত হয়ঃ (ক) ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোভাব; (খ) সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার প্রবর্তন।[২] পরিবর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যেমন তাঁর উপন্যাসে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায় এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়ে এক নতুন চেতনাও তাতে প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনকে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন বৃহত্তর মানবিক পটভূমিকায় এবং মানবধর্মকে স্থান দিয়েছেন সকলের ঊর্ধ্বে। তাঁর ভাষার কারুকার্য, ঘটনার মোহনীয় সংস্থাপন, সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে গভীরতর সহানুভূতি একদিকে, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ এবং নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা উপন্যাসকে অসাধারণ সমৃদ্ধি দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রধারার ঔপন্যাসিকের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) নাম উল্লেখ-যোগ্য। মানব জীবনের নিভৃত স্তরের সমস্যাজটিল দিকগুলো উন্মোচন ও পরিবেশনের চেয়ে এর উপরতলের ছোট ছোট বৈচিত্র্যময় ঘটনার প্রতিই তিনি অধিক আগ্রহ পোষণ করতেন, তবে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বিশ্লেষণ-কৌশলের পরিচয় তাঁর উপন্যাসে তেমন দেখা যায় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বলেছিলেন যে, তিনি সাহিত্যে গুরুবাদ মানেন এবং এই প্রসঙ্গে *চোখের বালির* উল্লেখ করেছিলেন।[৩] তবে *চোখের বালির* পরবর্তীকালের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিবৃত্তির যে-পথ অবলম্বন করেন,শরৎচন্দ্র সে পথে অগ্রসর হননি। তিনি এঁকেছেন প্রধানত গ্রামজীবনের ছবিঃ সে গ্রামজীবনে কুসংস্কার, দলাদলি, সংকীর্ণতা ও ক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। সামাজিক সমস্যার সমাধান দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তবে সে-সমস্যার প্রকৃতি-উন্মোচন, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির প্রতি গভীরতর সহানুভূতির প্রকাশ, সমাজবিগর্হিত প্রণয়ের মোহময় উপস্থাপন, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ, গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও সৌন্দর্য-আবিষ্কার, গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা এবং ভাষার সরলতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ-শক্তির সংযোগ–এ সবই শরৎচন্দ্রকে দান করেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তা।

বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনের আন্দোলনের নেতারূপে পরিচিত হলেও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) উপন্যাসের গঠনরীতি নিয়ে নতুন পরীক্ষা করেছিলেন। বুদ্ধির দীপ্তি, হাস্যরসের যোগ, শাণিত বিদ্রূপ এবং অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব তাঁর উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর প্রভাব-বলয়ের বাইরে উপন্যাস রচনায় এক বা একাধিক ধারা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। প্রথমে যাঁদের দেখি, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উল্লেখ অনিবার্য। তবে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)-সম্পাদিত ও পরিচালিত *ভারতী* (১৯১৫-২২) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। *ভারতী*গোষ্ঠীর প্রবণতা ও লক্ষণগুলিকে সুকুমার সেন নিম্নলিখিতভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন ঃ

> (১) সাহিত্যদৃষ্টিতে গতানুগতিকতার ঠুলি পরিত্যাগ, (২) রচনারীতিকে সরল ও সরস করা ও কথ্যভাষার কাছাকাছি আনা, (৩) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় ঘটানো, (৪) সমসাময়িক সমাজের গ্লানির প্রতি– বিশেষ করিয়া পতিত নারীর দুর্দশার প্রতি– গল্প উপন্যাসে সমবেদনা আকর্ষণ, (৫) শিল্প-অনুরাগ এবং জীবনচর্যায় শিল্পানুরাগের অভিব্যক্তি, আর (৬) মোগল চিত্রকলার অনুশীলনের আনুষঙ্গিকরূপে ফারসি হস্তলিপির মতো মোলায়েম ফারসি শব্দের প্রতি ঝোঁক।[৪]

চতুর্থ প্রবণতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল পাওয়া যাবে বিশেষভাবে, তবে তৃতীয় লক্ষণটি সম্পূর্ণ অভিনব।

> ইউরোপীয় (কন্টিনেন্টাল) উপন্যাস কাহিনী– অবশ্য ইংরেজী অনুবাদ হইতে– বাঙ্গালায় প্রকাশ করা ভারতী-গোষ্ঠীর একটা প্রচেষ্টা ছিল। এই কাজের ভার লইয়াছিলেন ভারতীর চারজন প্রধান লেখক। মণিলাল অনুবাদ করিলেন 'ভাগ্যচক্র' ওলন্দাজ ভাষা হইতে,

Dhaka University Institutional Repository

সৌরীন্দ্রমোহন লিখিলেন 'মাতৃঋণ' ফরাসী হইতে, সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন 'জন্ম-দুঃখী' নরউইজীয় হইতে, আর চারুচন্দ্র লিখিলেন 'আগুনের ফুলকি' জার্মান ভাষা হইতে।[৫]

এইভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব ও বিষয় বাংলায় আমদানি হতে শুরু করে। তাতে যেমন রোমান্টিক ধারার রচনা ছিল, তেমনি ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যে নবাগত বাস্তববাদের পরিচয়। এক দ্রুত পরিবর্তনশীল পটভূমিতে বাংলাসাহিত্যে সূচিত হয় এই নতুন সাহিত্যধারা। শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই পরিবর্তনের শুরু, তবে তা প্রকট হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে বাঙালির উনিশশতকীয় সুস্থ ও প্রত্যয়সিদ্ধ জীবনবোধে যে ধাক্কা লাগে, তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্যে। এ প্রতিবাদ প্রথমে অহিংস আন্দোলন ও পরে সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদের পথধরে এগিয়ে যায়। নগরকেন্দ্রিক পরিবর্তনের সূত্রে শিক্ষিতের হার বাড়লেও তাদের কর্মের সুরাহা না হওয়ায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছিল। এরই মধ্যে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)। বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশে সৃষ্ট হয় নানাবিধ সংকট। তার উপর পর্যায়ক্রমে আসে ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্বরাজ প্রদানের অঙ্গীকারভঙ্গ, শাসনকার্য-পরিচালনার প্রয়োজনে নানাবিধ সংস্কার (মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার ১৯১৯), আইন প্রণয়ন (রাউলাট আইন ১৯১৯) ও দমননীতি (জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১৯১৯)এবং তার ফলে জনমনে সৃষ্ট ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও সংস্কার যুবসমাজের কর্মপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। ফলে বেকারত্ব-জর্জরিত এবং বিপর্যস্ত শিক্ষিত মানস গান্ধীজীর (১৮৬৯-১৯৪৮) অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। বঙ্গভঙ্গ-রদ (১৯১১) হবার পরে স্বদেশি আন্দোলনের প্রাণবন্যা স্তিমিত হয়ে এলেও উপর্যুক্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি দেশবাসীকে প্রত্যাশিত সুস্থজীবনে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়নি। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৫) ও কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস[৬]— এগুলো উপর্যুক্ত ঘটনাপরম্পরারই প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া আইন-অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) যুক্ত হবার ফলে কিশোর-যুবকদের মধ্যে সূচিত হয়েছিল মানসিক ও চরিত্রগত পরিবর্তন। যুক্তি ও বিচার ব্যতিরেকে কোনোকিছুকেই তারা মেনে নিতে বাধ্য থাকছিল না। সামাজিক ও সাহিত্যিক গতিপরিবর্তনে এ বিষয়গুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য।

সমকালীন রাজনৈতিক জীবন তরুণ লেখকদের যেমন করে টানতে পারতো, তা টানেনি। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল সামাজিক জীবনের অলক্ষ্য পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত রূপের দিকে।[৭] আমেরিকা ও ইংলন্ডের অর্থনৈতিক সংকটের ফলে এই উপমহাদেশেও সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বেকার সমস্যা। দুঃসহ বেকারত্ব ও অর্থসংকটের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের কিছু কিছু ঘটনা ও তত্ত্বপ্রচার এদেশের শিক্ষিত মানসকে আলোড়িত করেছিল। বার্ণার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০) ও ফেবিয়ানদের নব অর্থনৈতিক চিন্তা তখনকার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের উদ্বুদ্ধ, উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) যুগান্তকারী মনোসমীক্ষণতত্ত্বের (১৯১৩) ইংরেজি অনুবাদ একটির পর একটি প্রকাশিত এবং প্রচারিত হতে থাকে এ সময়ে।[৮] ফ্রয়েড এবং তাঁর শিষ্য আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭) এবং কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) ছাড়াও প্রেমের দেহবাদী যৌনমূলক ব্যাখ্যা বিশেষভাবে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত করেন ফ্রয়েডের অপর শিষ্য হ্যাভলক এলিস(১৮৫৯-১৯৩৯)।[৯] তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে অবচেতনের অন্ধকারময় স্তর ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। দেহমনের অন্তরালে অবচেতনের ক্রিয়াকলাপ এবং প্রেম সম্পর্কে নতুন তথ্য ও ব্যাখ্যা মানুষের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলে উদ্দীপিত করে তোলে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ও নিস্তেজ যুযচিত্তকে। যৌবনের নিষিদ্ধ বৃত্তিগুলো প্রাধান্য পায় তাঁদের চিন্তায়। মনস্তত্ত্ববিদদের চিন্তা ও তত্ত্বের প্রচার দেশের রক্ষণশীল মূল্যবোধেও আঘাত হানে। বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তন এবং তাকে জানবার অদম্য কৌতূহল স্বাভাবিক কারণেই তরুণ সাহিত্যিকদের পাশ্চাত্যমুখী করেছিল। জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের নতুন নতুন দ্বারোদ্‌ঘাটনের সন্ধান লাভ করায় প্রেমে একনিষ্ঠতা, সতীত্ববোধ, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে বিচিত্র জিজ্ঞাসা দেখা দিতে লাগল তাঁদের মনে। সনাতন সমাজনীতি ও প্রচলিত মূল্যবোধ এই তরুণদের করে তুলেছিল সন্দিহান ও বিদ্রোহী। দাম্পত্যবন্ধনকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার পরিবর্তে তাঁরা করলেন জৈবাস্তবতার দিক থেকে। দাম্পত্য সমস্যা ও জটিলতার ক্ষেত্রে যৌনতা ও মনস্তত্ত্বের বিষয় তাঁদের বিবেচনায় গুরুত্ব পেলো বেশি। প্রেম ব্যাখ্যাত হলো যৌনসত্যের আলোকে। মানুষের মর্মজগতের যেসব রহস্য উন্মোচিত হয়ে পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায় ধরা পড়েছিল, সেসব তত্ত্ব দেশীয় সাহিত্যশিল্পেও ব্যবহৃত হতে থাকে। যৌনতা ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্র প্রসারিত হবার ফলে তাঁদের সৃষ্টিতে বিচিত্র বিষয় সংযোজিত হতে থাকে।

ওমর খৈয়ামের (১০৪৮-১১২৪) ভোগবাদী বা ইহজাগতিক এবং অকুণ্ঠ মানবতাবাদী দর্শনকে তাঁরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং সেইসব তথ্য মানুষের গতানুগতিক বোধকে নাড়া দিচ্ছিল। ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কৃত সূত্র থেকে জানাযায়– উনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক জড়বাদের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত এক তথ্য– প্রকৃতি রাজ্যের সবকিছুই কার্যকারণ নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ নয় এবং প্রকৃতিতে ধ্রুব বা শাশ্বত বলে তেমন কোনো কিছু নেই। ফলে এক্ষেত্রে মানুষের মনে সূচিত হলো সংশয়। ভূতত্ত্ববিদ এবং গ্রহতত্ত্ববিদগণ দেখালেন– মানুষই সৃষ্টি জগতের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। অন্যসব প্রাণের মতোই সেও একটা আকস্মিক সৃষ্টি। নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে উপলব্ধি ঘটে যে, ধর্ম ঈশ্বরদত্ত কোনো ব্যাপার নয়, বরং বহুদিনের গড়ে ওঠা একটা সংস্কার এবং অভ্যাসমাত্র।[১০] উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের মনের তিনটি ক্রিয়া– শুভবুদ্ধি, রুচি ও নীতিবোধ যথাক্রমে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সঙ্গে জড়িত। ফ্রয়েডের নতুন প্রচারিত তত্ত্ব এ বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়। তিনি জানান– মানুষের অবচেতন স্তরে জমা থাকে তার অবরুদ্ধ বাসনা-কামনা ইত্যাদি। এগুলোকে দীর্ঘদিন অবদমিত রাখলে মনের মধ্যে নানারকম Complex সৃষ্টি হয় এবং আচরণ বিকৃত হয়ে পড়ে। এই স্তরের শক্তি বেশি এবং এর উপরে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এইসব আবিষ্কারের ফলে আর এক ভাবগত আন্দোলন শুরু হয়। এর পরিচয় মেলে তখনকার শিল্পে এবং সাহিত্যে। এসব ক্ষেত্রে শুরু হয় ব্যাপক পরিবর্তনের জোয়ার। এভাবেই চিন্তা ও সাহিত্যজগতে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তিত হল। এমনিতর যুগপরিস্থিতিতে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল একদল তরুণ কবি ও কথাকারের জীবন ও সাহিত্যিক মানস।

Dhaka University Institutional Repository

নগরকেন্দ্রিক এই তরুণ সাহিত্যিকরা ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রায় কেউই যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। ভূমির সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিলনা, তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। জন্মসূত্রে, শিক্ষাদীক্ষায়, আত্মসম্মানবোধে ভদ্রলোক হয়েও সঙ্গতিতে এঁদের অধিকাংশই নিঃস্বপ্রায়। ফলে, তাঁরা যেমন পারছিলেন না উঁচু সমাজে পৌঁছতে, তেমনি পারছিলেন না নিচুতলায় নামতে। আর যেখানে তাঁদের অবস্থিতি– সেখানে কর্ম জোটেনা, জুটলেও তাতে সংসারের দায় যোচেনা– এই ছিল এঁদের জীবনবাস্তবতার এক সাধারণ চিত্র। এ সময়ের কথাসাহিত্যে এর প্রকাশ ঘটেছে নানামাত্রিকতায়। তাই আধুনিক কথাকারগণ যে নতুন কিছু করার ঝোঁকেই বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, তা ঠিক নয়। জীবনের যে দিকগুলো তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে, তা-ই রূপায়িত করেছেন তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিতে। সমকাললগ্ন তারুণ্যের স্বাভাবিক লক্ষণ–আশা-নৈরাশ্য, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ– সবমিলিয়ে এক রোমান্টিক আনন্দবেদনার যুগলক্ষণ বিদ্যমান ছিল তাঁদের মধ্যে। মানবচরিত্রের ইতিবাচকতায় একদিকে জেগেছিল সন্দেহ, অন্যদিকে তার অনন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা লাভ করেছিলেন আশা ও বিশ্বাস। অস্থিরতাশাসিত সময়– বিশশতকের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পসাহিত্যের রীতি ও প্রবণতা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল–তার ঢেউ এসে লেগেছিল এদেশেও। ফলে কাললগ্ন এইসব লক্ষণ স্পষ্টতা পায় এঁদের রচনায়। তাঁদের সৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় সমাজনিষিদ্ধ প্রেম সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নিচুতলার মানুষের প্রতি সহানুভূতি, নরনারীর সম্পর্কবিচারে সংস্কারমুক্ত নির্মোহ মনোভাব। এ সবকিছু এঁদের চিন্তাজগতের এক ব্যাপক পরিবর্তনকেই ব্যক্ত করে। তাঁদের এই জীবনবোধ থেকে সূচিত হয়েছিল এক নবভাবনা ও শিল্পের প্রেরণা। বার্ণার্ড শ' এবং বর্ট্রান্ড রাসেলের যুক্তিবাদ, হ্যাভলক এলিসের যৌনজীবন-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত — এই সবকিছু সমন্বিত হয়ে তাঁদের রোমান্টিকতাআশ্রয়ী মানসপ্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। ফলে কল্পনাপ্রবণতা, বিদ্রোহী মনোভাব, সমাজনীতি-শৃঙ্খলা ও বাস্তবের সীমাবদ্ধতায় অসহিষ্ণু আক্ষেপ, স্পর্শকাতরতা, আদর্শ ও সুন্দর মানবসমাজ সম্পর্কে আশাবাদ প্রভৃতি লক্ষণগুলো এই তরুণ সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্রে ধরা পড়েছে।[১১] তাঁরা কখনো আশ্রয় করেছেন যাযাবর-ধরনের চরিত্র, রোমান্টিক মানসজনিত এক বাধাবন্ধনহীন মুক্তজীবন, পথে পথে বিচরণ করে নানান অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়, কখনো আবার অদৃশ্য কল্পনাপ্রিয়ার সন্ধান-বাসনা– এ সবই হচ্ছে যাযাবরী লক্ষণ। এঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা কখনো কখনো বোহেমিয়ান, একই কারণে সব পেয়েও তারা অপ্রাপ্তিজনিত এক অব্যক্ত অনুভূতির পীড়নে বেদনার্ত। কখনো সমাজ সংসারের প্রতি অভিমানবশত যাযাবর জীবনকে আশ্রয়সূত্রে একের পর এক প্রেমে লিপ্ত হয় তারা। এরা যে নারীকে কামনা করেছে, সে বিশেষ কোনো দেহধারিনী নয়। কল্পনালোকের এক 'অব্যক্ত মূর্তি' তাদেরকে নিয়ত অন্বেষণরত রেখেছে।[১২] সমাজ প্রচলিত নীতি ও শৃঙ্খলার প্রতি এ তরুণ সাহিত্য স্রষ্টাদের ছিল অসহিষ্ণুতাজাত অবজ্ঞা বা বিরূপতা। এ বিরূপতায় আবার যুক্তির চেয়ে তাঁদের রোমান্টিক অসহিষ্ণুতাই ছিল বেশি বিদ্যমান।

এই নতুন সাহিত্যধারার–বিশেষত উপন্যাসের ধারার–পূর্বসূচনা করেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, তবে এই নতুন উপলব্ধির সবল প্রকাশ দেখা দেয় বিশেষ করে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮) উপন্যাসে। চারুচন্দ্রের অনেক রচনার বিষয়বস্তু বিদেশি সাহিত্য থেকে নেওয়া, তবে *স্রোতের ফুল* (১৯১৫), *পরগাছা* (১৯১৭), *দুই তার* (১৯১৮), *পঙ্কতিলক* (১৯১৯), *দোটানা* (১৯২০) ও *হাইফেন* (১৯২৬) প্রভৃতি তাঁর মৌলিক রচনা। একদিকে গৃহচ্যুত নারী, জোচ্চোর, সাধু, গাঁটকাটা, ভবঘুরে প্রভৃতি চরিত্রের বাস্তবসম্মত উপস্থাপন, অন্যদিকে বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয় ও যৌনচেতনার নিঃসংকোচ প্রকাশ এবং জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তবে বিভিন্নমুখী সমস্যার পরিবর্তে নাটকীয় পরিস্থিতির আশ্রয় নিয়ে পাঠকমনে চমক সৃষ্টি করতেই তিনি বেশি আগ্রহী। তাঁর সৃষ্ট নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে কেবল হৃদয়সঞ্জাত প্রেম নয়, এর গভীরে নিহিত দেহচেতনার রহস্যকেও উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। এদিক দিয়ে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের অধিকারী তিনি। পরে, *কল্লোল*গোষ্ঠীর লেখকদের হাতে সাহিত্যের উপাদান, বিষয় ও তাৎপর্যবোধের অনেক বেশি পরিবর্তন হয়েছিল নিঃসন্দেহে, তবু প্রগতিশীল ও আধুনিক বিদ্রোহী চিন্তা চেতনার অধিকারীরূপে চারুচন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁরই পথ ধরে তরুণ আধুনিক রচয়িতারা এগিয়েছেন এবং নানাভাবে পূর্ববর্তীদেরকে অতিক্রমও করে গেছেন। তবু সাহিত্যের প্রবাহের ধারায় পূর্ববর্তী সাহিত্যপর্যায় বিচার করলে চারুচন্দ্রের রচনার সাহিত্যিক-মূল্যের অতিরিক্ত ঐতিহাসিক মূল্যটি ধরা পড়ে।

এই দিকটি আরো বিশদভাবে প্রকটিত হয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৬৪) উপন্যাসে। সুকুমার সেনের ভাষায়,—'কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায়,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২)'[১৩]। এই পত্রিকা নরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। *শুভা* (১৯২০), *শাস্তি* (১৯২১) ও *পাপের ছাপ* (১৯২২) তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন যে, 'তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি যৌন ও অপরাধতত্ত্ব বিশ্লেষণকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন'।[১৪] যৌনপ্রবণতার বিশ্লেষণে নরেশচন্দ্র পথিকৃৎ না হলেও সাহসিক, তবে অপরাধতত্ত্বমূলক কাহিনী রচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। আইনজীবী হিসাবে তিনি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন, সেই সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন 'তীক্ষ্ণ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য'।[১৫] বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব তাঁর উপরেও ছিল, তবে সেখান থেকে প্রেরণা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতায় জারিত করেছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসের বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে।

শরৎচন্দ্র যেখানে বলেছেন যে, 'আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে কোথাও দিতে পারিলাম না',[১৬] সেখানে তাঁর তরুণ সমসাময়িকেরা নরনারীর নিরুদ্ধ যৌনকামনা এবং সমাজ-অস্বীকৃত সম্পর্ক ও যৌন মিলনের এমন রীতিবিরুদ্ধ চিত্রাঙ্কনে সাহসী হলেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের গভীর পরিচয়, অন্যদিকে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের প্রভাবের কথা ভাবতে হবে। প্রবীণদের সামনে যেখানে ছিল ভিক্টোরিয় যুগের নীতিশাসিত ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শ, তরুণদের সামনে সেখানে ছিল ইউরোপের অন্যান্য ভাষার সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। প্রধানত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমেই এসব রচনা তাঁদের লভ্য হয়েছিল, তবে কেউ কেউ মূল ভাষাও কোনো কোনোটা জানতেন। এই সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং চিত্র রচিত হয়েছিল, তার পোষকতা তাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

পরে দেখেছিলেন ডি.এইচ.লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) মতো বিতর্কিত ইংরেজি ঔপন্যাসিকের রচনায়ও। সুতরাং তাঁরা প্রচলিত নীতিবোধ ও সংস্কার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে এবং সমাজস্বীকৃত সম্পর্কের বাইরে হৃদয়সম্মত মানবিক সম্পর্ককে মূল্যবান বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন। ধর্ষকাম ও মর্ষকামের বিষয় কতটা তাঁরা সাহিত্য পড়ে জেনেছিলেন, আর কতটা অভিজ্ঞতাসূত্রে লাভ করেছিলেন, তা বলা শক্ত। তবে গৃহবন্ধনহীন নারীর সমস্যা, নানাধরনের অপরাধপ্রবণতা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ। যৌনজীবনের অনবগুণ্ঠিত প্রকাশের পাশাপাশি দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও বিকৃত জীবনের কথাও তাঁরা বলেছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছিল বিশেষ করে *কল্লোল* (১৯২৩) পত্রিকাকে আশ্রয় করে। *কল্লোলের* পথে পরে অগ্রসর হয়েছিল কলকাতার *কালিকলম* (১৯২৬) ও ঢাকার *প্রগতি* (১৯২৭)। তবে *কল্লোলের* প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে,এদুটি পত্রিকা বিবেচিত হয় *কল্লোলযুগের* অন্তর্ভুক্ত বলে।

দীনেশরঞ্জন দাশের (১৮৮৮-১৯৪১) সম্পাদনায় ও গোকুলচন্দ্র নাগের (১৮৯৪-১৯২৫) সহসম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *কল্লোল* (১৯২৩)। এর প্রথম কার্যালয় ছিল দীনেশরঞ্জনের মেজদাদা বিভুরঞ্জনের বাড়িতে।[১৭] ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দুইকক্ষ বিশিষ্ট ভাড়াবাড়ির একতলার ছোট্ট বৈঠকখানায় একটি তক্তপোশ, খানদুই চেয়ার, একটি ক্যানভাসের ডেকচেয়ার, একটি ছোট আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি আলমারি, ভেতরের দিকে দরজায় ঝোলানো একটি পর্দা—এই সামান্য কয়েকটিমাত্র উপকরণ নিয়ে *কল্লোল* অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই সামান্যের মধ্যেই সেদিন বাংলাসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল সাত বছরের আয়ুর এই পত্রিকাটি। আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেছিল *কল্লোল*। *কল্লোলেরই* একজনের ভাষায়ঃ

> "কল্লোল" একটা বিশেষ ঠিকানার ছোট একটা ঘর কি ছাপানো মাসিকপত্রমাত্র নয়, সাহিত্যের একটা উত্তাল ঢেউ, যা সেদিনকার বাংলার যৌবনের বুকের তলা থেকে উথলে উঠে আরো অনেক কিছুর মত সাহিত্যের জগৎও তোলপাড় করে তুলছে।[১৮]

বৈশাখ ১৩৩০ থেকে শ্রাবণ ১৩৩১ পর্যন্ত বিশেষ করে বিকেলে আড্ডা বসতো এখানে। আমহার্স্ট স্ট্রিট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে দীনেশরঞ্জনের এক বন্ধুর প্রেস থেকে কমখরচে মুখপত্র, ভূমিকা ও সম্পাদকীয় নিবেদনহীন *কল্লোলের* প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 'আলোচনা' বিভাগে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পরিচয়, বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা ও সাহিত্যভাবনা প্রকাশিত হতো। গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়ে *কল্লোলকে* ছোট আকারে, ডিমাই সাইজের পনেরো ফর্মার মতো করে প্রকাশ করা হতো। এতে করে পাঠকের সুবিধে হলেও বিজ্ঞাপন পেতে অসুবিধে হতো পত্রিকার। প্রথম তিন বছর এভাবেই চলে, পরে গোকুল নাগের মৃত্যুর পর ডবল-ক্রাউন আকারে এটি পরিবর্তিত হয়। গোকুল নাগ বেঁচে থাকলে হয়তো এ পরিবর্তন ঘটতো না। লেখা এবং আকৃতি সবকিছুতেই *কল্লোলের* যা নিজস্ব চারিত্র্য তাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতেন।[১৯]

কল্লোলের প্রথম সংখ্যাটি শুরু হয় দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল' কবিতা দিয়ে। নামের দিক দিয়ে সঙ্গতি থাকলেও *কল্লোল*-প্রবণতার লক্ষণ এরমধ্যে ধরা পড়েনি। *কল্লোলের* প্রায় সাতবৎসর আয়ুষ্কালের

Dhaka University Institutional Repository

সাতাশ সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি ছাড়াও মোট বারোটি মৌলিক উপন্যাস এতে প্রকাশিত হয়েছে। সে সব উপন্যাস ও তার রচয়িতারা হলেন– গোকুলচন্দ্র নাগ ঃ *পথিক* (১৩৩০), হরিপদ বসু ঃ *ঘাটের পথে* (১৩৩০), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ *পান্থবীণা* (১৩৩০) ও *ডাক-পিওন* (১৩৩৫), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ *স্মৃতির আলো* (১৩৩২), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ *রূপছায়া* (১৩৩৩), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ *বেদে* (১৩৩৩), নরেন্দ্র দেব ঃ *যাদুঘর* (১৩৩৪), দীনেশরঞ্জন দাশ ঃ *দীপক* (১৩৩৪) ও *রাতের বাসা* (১৩৩৬), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ঃ *অপরূপ* (১৩৩৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ *মিছিল* (১৩৩৫)। মনস্তত্ত্বের জটিল জগৎ নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন গোকুল নাগ, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ অধিকাংশ কথাকার। মানবমনের অন্তরালবর্তী জটিল এবং গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক সত্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের হাত দিয়ে এ সময়কার সৃষ্টিপ্রয়াস হয়েছিল বৈচিত্র্যময় ও তাৎপর্যবহ। রচনার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে লেখকের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও জিজ্ঞাসার উদ্ভাসন এ সময়কার সৃষ্টির বিশেষত্ব। অন্তরের নিভৃতে এই তরুণ লেখকগণ ধারণ করেছিলেন আশা ও নৈরাশ্যের যুগলমিলন ও ব্যথিতপীড়িত আত্মাকে লালন করার যুগসম্পৃক্ত লক্ষণ। বিহ্বল ভাববিলাস,বাস্তব সৃজন-প্রয়াসে দরিদ্রজীবন চিত্রায়ণ ও এ জীবনের সংগ্রামমুখীনতা—সবকিছু মিলেই গড়ে উঠেছিল *কল্লোল*গোষ্ঠীর মানসিকতা। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায়—

> "কল্লোল" বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।[২০]

সত্য এবং শক্তির সপক্ষে নির্ভীক চিত্তের প্রতিষ্ঠা ছিল *কল্লোল*প্রবাহের লক্ষ্য। এক বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গিকে ধারণ করে শুরু হয়েছিল *কল্লোল*সঙ্ঘের অভিযাত্রা। তাদের এ বিদ্রোহ ছিল যৌবনের স্বাভাবিক দাবির পক্ষে, মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবন ও চলার পথের পরিপন্থী সব ভণ্ডামি ও কপটতার বিরুদ্ধে। নারীপ্রগতিতে *কল্লোলে*র আস্থা লক্ষ করা গেছে মহিলা লেখকদের সমাদরে। বয়সোচিত কারণে রচনায় যথার্থ পরিপক্বতার অভাব থাকলেও সামাজিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন *কল্লোলে*র লেখকরা। দেহাশ্রিত বাস্তবতাও স্থান পেয়েছে তাঁদের রচনায়। যুগধর্মকে শিরোধার্য করেই তাঁরা উপন্যাসের ধারায় নতুনমাত্রা সৃজনে সমর্থ হয়েছিলেন। *কল্লোল*চেতনা বলতে শুধু *কল্লোল* পত্রিকার নয়, এর সমধর্মী ও সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার মর্মলক্ষণকেও বোঝায়। এইসব পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অধিকাংশ তরুণ রচয়িতার হাত দিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল এক নব সাহিত্যধারা। বলাবাহুল্য *কল্লোল* এ ধারার প্রথম উদ্‌গাতা।

ভারতী ও *কল্লোল*গোষ্ঠীর সাহিত্যপ্রবণতার তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, *ভারতী*গোষ্ঠীর রচয়িতারা দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন— প্রধানত, সমাজ ও পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে নতুন ও প্রত্যক্ষ বাস্তব এক জীবনের অস্তিত্ব নির্দেশে, উদার-সত্য-নতুনতর মূল্যবোধের ইঙ্গিতদানে। প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার না করেও নতুন ধরনের বাস্তবতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন তাঁরা। এর মূলে তাঁদেরকে উৎসাহ এবং প্রেরণা জুগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারিত দৃষ্টি এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ। পারিবারিক ও সামাজিক সত্তার উর্ধ্বে নরনারীর অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা ব্যতিক্রমী ও দুঃসাহসী হয়েছিলেন– নিচুতলাবাসীদের জীবন চিত্রায়ণে এবং নরনারীর যৌনরহস্য উন্মোচন প্রয়াসে। তবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করেই তাঁরা বিদ্রোহচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এর মূলে নিহিত ছিল মানবতা-আশ্রয়ী উদার আদর্শবাদ। অবশ্য, সর্বত্র বাস্তবের সঙ্গে এই আদর্শবাদের শিল্পসম্মত ভারসাম্য বজায় থাকেনি। এই বাস্তবতার চেতনা তাঁদের ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। এঁদের বাস্তবতা একধরনের লঘু রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার দিক দিয়ে বাস্তব হলেও ঘটনা সন্নিবেশে কিংবা চরিত্রচিত্রণে বাস্তব আবেদন তাঁদের ক্ষুণ্ন হয়েছে। বরং *কল্লোলের* লেখকদের রচনায় এই বাস্তবতা জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁরা সমাজ ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এক মৌলিক সাহিত্যধারার প্রবর্তন করলেন, যা পূর্বতন সাহিত্যধারার অনুবর্তন হলেও তার থেকে স্বতন্ত্র এবং নতুন। এঁদের মতো বিদেশী শ্রেষ্ঠসাহিত্যের মর্মলোকে প্রবেশ করে তার সুগভীর ভাবসৌন্দর্য আত্মস্থ করার প্রবণতা বা প্রতিভা *ভারতী*গোষ্ঠীর লেখকদের অনেকেরই ছিল না। সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজনীতিকে বর্জন করেছিলেন কল্লোলীয়রা পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশি সুসঙ্গতভাবে। *ভারতী*গোষ্ঠীর রচনায় মনস্তাত্ত্বিক সত্য উদ্‌ঘাটনের যে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, তারই পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় এই তরুণ রচয়িতাদের সৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যের সূচনা রবীন্দ্রনাথের কালেই শুরু হয়েছিল, বলাযায়– রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর পথ তৈরি করে রেখেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিক্ষেত্রে নিজেই নিজের সীমাকে অতিক্রম করেছিলেন বারবার। তাঁর ক্রমনবায়মান ও রূপান্তরধর্মী সৃজনশীলতার ধারা তাঁদেরকে এক নতুন সাহিত্যান্দোলনে উদ্দীপ্ত করেছিল, যা রবীন্দ্রনাথ নিজে এমন বেপরোয়াভাবে করেননি। *কল্লোল*কে আশ্রয় করে যে তারুণ্যের প্রবল উদ্দামতায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে উৎসাহী হয়েছিলেন, তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল পশ্চিম থেকে আগত ভাবধারা। আগেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রোত্তর কথা সাহিত্যের সূচনা এঁদের দ্বারাই প্রথম গড়ে ওঠেনি। কল্লোলীয়দের মতো সোচ্চার ভঙ্গিতে না হলেও *ভারতী*গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে এটি লক্ষ করা গেছে। তবে তাঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম কিংবা অস্বীকার করতে প্রয়াসী হননি। বরং রবীন্দ্রনাথের অনিঃশেষ ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত থেকেছেন। রবীন্দ্রযুগের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেননি তাঁরা, যা লক্ষ করা যায় *কল্লোল*পন্থীদের রচনায়।

তবে এটাও ঠিক যে, তারুণ্যের জোয়ারজনিত অস্থিরতার কারণে সাহিত্যে বাস্তবতার চেয়ে কিছুটা আতিশয্যই বরং তাঁরা প্রদর্শন করেছিলেন। দরিদ্রজীবন বলতে নগরজটিল জীবনের বিত্তহীন মানুষের ছবিই তাঁরা ফুটিয়েছেন তাঁদের রচনায়। গ্রামজীবনকে প্রায়ই অনুল্লেখ্য রেখেছেন। বয়ঃসুলভ রোমান্টিক স্বপ্নাতুরতার জন্যে তাঁদের বাস্তবতা প্রায়ই তেমন তীক্ষ্ণ তীব্ররেখায় ফুটে ওঠেনি। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ—কিছুটা প্রবীণদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও তার পরে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, আর নবীনদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়—যাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

নিছক রবীন্দ্রবিরোধিতার জন্যেই সাহিত্য রচনা করেননি। জীবনের নগ্ন, ক্রূর ছবি তুলে ধরেছেন তাঁরা, জীবন সম্পর্কে এক সংশয়ী, বিষণ্ন ও হতাশ দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করে। রবীন্দ্রদর্শন-বিরোধী আধুনিক সাহিত্যিকারেরা বাস্তবতা রূপায়ণে জীবনের যে বিচিত্র কূট, তির্যক ও জটিল চেতনাকে রূপ দিতে চেয়ে আঙ্গিকগত নানারকম শিল্পকৌশল উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এবং পরেও তা করেছিলেন। ব্যক্তির মর্মনিহিত নানান প্রশ্নকে বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক প্রকরণের মাধ্যমে রূপায়িত করেছিলেন তিনি। তাই, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করেই যে তাঁরা রবীন্দ্রধারা অতিক্রমনে অভিলাষী হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে বাস্তবতা-নির্মাণে দ্বৈত মানসিকতার পরিচয় দেন। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনি কল্পনামিশ্রিত বাস্তবতার চিত্রকর, অন্যদিকে নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে সত্যকে তুলে ধরার পক্ষপাতী। পরবর্তীকালে এ ধ্যানধারণাও তাঁর পাল্টে যায় এবং নগ্নবাস্তবতার বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি করেন। ফলে বিশশতকের তৃতীয় দশকের তরুণ লেখকগণ তাঁর বিরুদ্ধে জীবনবাস্তবতাকে আবেগ ও কল্পনার দৃষ্টিতে বিচারের এবং তাঁর সৃষ্টিতে বৃহত্তর নিম্নতলবাসী মানুষের অনুপস্থিতির অভিযোগ করেন। তিনিও আবার এঁদের বিরুদ্ধে কন্টিনেন্টাল লেখকদের অন্ধ অনুকরণ এবং অশ্লীলতার অভিযোগ করেন। এ-সবের পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদও উত্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, একসময়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যৌনমনস্তত্ত্ব রূপায়ণ, অস্পষ্টতা, অবাস্তবতা ও বিদেশি প্রভাবের যে অভিযোগ এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই একই অভিযোগ আনেন তরুণ লেখকদের বিরুদ্ধে। *শেষের কবিতা* (১৯২৮) উপন্যাসে এবং *বাঁশরি* (১৯৩৩) নাটকের মধ্যদিয়ে এঁদের প্রবণতাকে নানাভাবে পরিহাস করেন তিনি। তরুণদের থেকেও অভিযোগ এলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন-সম্পর্কিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। বাস্তবতার বিচারে তরুণ কথাকারেরা তাঁকে 'ভাববাদী' আখ্যা দেন এবং তিনি যে নিজস্ব দর্শনে মানুষের 'অনতিক্রম্য শরীরটাকে' উপেক্ষা করে গেছেন, তার উল্লেখ করেন।[২৯] রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে আধুনিক মানসের দ্বন্দ্ব এখানেই।

তরুণ সাহিত্যিকারেরা উপলব্ধি করেছিলেন, কী কাব্যে, কী কথাসাহিত্যে, রবীন্দ্রানুসরণের মধ্যে তাঁদের সৃষ্টির মুক্তি নেই। প্রেম কিংবা প্রেমের আধার নারীকে দেহাতীত মহিমায় চিন্তা করেননি তাঁরা। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বসম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রযুগাশ্রিত চিন্তা ও রবীন্দ্র মোহের ঘোর তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ তরুণদের মতোই যুগসংকটের পথ অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু এর দ্বারা তাঁর শিল্পিসত্তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়নি। তরুণ কথাকারগণ তাঁর রচনায় শুচিতার আতিশয্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে এঁদের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর *নষ্টনীড়* (১৯০১), *চোখের বালি* (১৯০৩), *চতুরঙ্গ* (১৯১৪), *ঘরে বাইরের* (১৯১৬) মতো গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন—নরনারীর যথার্থ পরিচয় তার সমাজ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা অনেকাংশেই তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। সমাজনীতিকে লঙ্ঘন না করেও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে নরনারীর জীবন বা মর্মরহস্যের অমোঘ আকর্ষণকে তিনি অস্বীকার করেননি। তাঁর শেষ জীবনের রচনায়ও (চার অধ্যায়- ১৯৩৪ উপন্যাস, 'ল্যাবরেটরি'- ১৯৪০ গল্প) রয়েছে এর পরিচয়। দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে মানুষের চাওয়া পাওয়া সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে বলে মুক্তির আনন্দ সেখানে নেই—

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বা 'অতি আধুনিক' তরুণ লেখদের বিবাহের চেয়ে বড়ো-র আইডিয়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর *শেষের কবিতায়* (১৯৩২) তুলে ধরেছেন। তাঁর *দুইবোন* (১৯৩২), *মালঞ্চ* (১৯৩২) উপন্যাসেও রয়েছে এই একই ধরনের বক্তব্য যে, মানুষের এমনকিছু চাওয়া রয়েছে, যা দাম্পত্যসম্পর্কের সীমাবদ্ধতার মধ্যে মেলেনা। তরুণ লেখকদের মানসপ্রবণতার অনেকাংশই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এসব বিচারে দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের পার্থক্য সত্ত্বেও আসলে আধুনিকদের পূর্বগামী তিনি। তরুণ কথাকারেরা যে নতুন পথের পথিক, রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই তার নিশানা তাঁদেরকে দিয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দর্শন, জীবনবোধ ও প্রত্যয়ে ছিলেন অটল। তাই *সবুজপত্রে* (১৯১৪) তরুণদের অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দিত করেও তাঁদেরকেই আবার কঠিন সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। বস্তুত তাঁদের যৌন-রূপায়ণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আপসহীন। তাঁকে 'ভাববাদী' কিংবা 'সমাজনীতি লঙ্ঘনকারী' যা-ই আখ্যা দেওয়া হোক, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করেই তিনি বিচার বিবেচনা ও সাহিত্য রচনা করে গেছেন আজীবন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সত্ত্বেও তরুণ সাহিত্যকারদের অধিকাংশই ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী। নিজেদের রচনার নামকরণে এবং অন্যান্যভাবে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এনেছেন তাঁরা, তাঁর কবিতা ও গানের চরণ ব্যবহার করেছেন অসংখ্যবার। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের চিন্তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। আপাত-বিরোধিতার অন্তরালে তাঁদের সুগভীর শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়টি কবিতা ও একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে *কল্লোলের* বিভিন্ন সংখ্যায়। তাঁর রচনা বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধের সন্ধান মেলে কমপক্ষে নয়টি।[২২] তাঁকে নিয়ে লেখা একটি কবিতাও ওতে রয়েছে।[২৩] বিদ্রোহের প্রথম উদ্দামতা কেটে যাবার পরে যতই দিন গেছে ততই বেশি করে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজেদের ঋণ উপলব্ধি করেছেন তাঁরা। কাজেই রবীন্দ্রপন্থী না হলেও এঁরা যথার্থভাবে রবীন্দ্রবিরোধীও নন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি-প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রবৃত্তে অবস্থিতির অনুকূল ছিল না, তবু তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের অক্লান্ত পাঠক। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায়ঃ

> লক্ষ করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেইসব তরুণ লেখক, যারা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত, অন্তত একজন যুবকের কথা জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে।[২৪]

বাংলাসাহিত্যে নতুনের মাত্রা সূচনাকারী এই তরুণ সাহিত্যিকদের পথ কিন্তু নিষ্কণ্টক ছিল না। তাঁদের ব্যতিক্রমী প্রবণতা রক্ষণশীলদের ক্ষুণ্ন করেছিল, তাই এঁদের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন তাঁরা। এমনি ধরনের সমালোচনার মুখপত্র ছিল *শনিবারের চিঠি* (১৯২৪-৪৩)। এটি প্রকাশিত হয়েছিল *প্রবাসীর* (১৯০১) সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৮২) প্রবর্তনায়। প্রথম থেকে এর সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের (১৮৫৭-১৯৫০) পুত্র যোগানন্দ দাস (১৮৯৩-১৯৭৯)। তিনি ছিলেন একাধারে সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর। *প্রবাসী* প্রেসে এটি মুদ্রিত এবং সুন্দরীমোহনের বাড়ির ঠিকানায় প্রকাশিত হতো। জন্মলগ্ন থেকেই নানান বিষয় নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করার এবং সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা করার প্রবণতা ছিল এর। এভাবেই এপত্রিকাটি বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নির্ভেজাল আনন্দদানের উদ্দেশ্য নিয়ে পদযাত্রা শুরু করলেও তরুণ সাহিত্য-রচয়িতারা এর বিদ্রূপের শিকার হয়েছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে এর অভিযোগ ছিল অশ্লীলতার, দুর্নীতির, যৌন-ব্যভিচার প্রশ্রয়ের, জীবনবিমুখ রোমান্স-প্রবণতার, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অপব্যাখ্যা ও সমাজভাঙন-প্রয়াসের। ছিল রচনার ভাব, ভাষা, বানান, শব্দ ও আঙ্গিকগত ঐতিহ্য-অস্বীকৃতি ও নৈরাজ্য-সৃষ্টি, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার অভিযোগ। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সাহিত্য থেকে বক্তব্য, উপাদান এমনকি ভাষাভঙ্গি পর্যন্ত চুরি করার দায় চাপিয়েছে পত্রিকাটি অনেকের কাঁধেই।[১৫] আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধাচরণে এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। অথচ যতদূর জানা যায়— *শনিবারের চিঠি*গোষ্ঠীর অনেকেই ব্যক্তিজীবনে ছিলেন যথেষ্টই প্রগতিপন্থী। মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) মতো 'আধুনিকোত্তম'ও শুধুমাত্র তরুণ লেখকদের বিরোধিতা করতে চেয়ে প্রগতি-বিরোধী রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ কিছুদিন পূর্বেও তিনি ছিলেন *কল্লোলেরই* একজন। 'দেহবাদী নবদীক্ষিত তরুণ সমাজের' তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান।[১৬] নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬)-বিদূষণ দিয়ে *শনিবারের চিঠির* যাত্রা শুরু। *কল্লোলের* জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) 'রজনী হ'লো উতলা' গল্প, আষাঢ়ে অচিন্ত্যকুমারের (১৯০৩-৭৬) 'গাব আজ আনন্দের গান' কবিতা, শ্রাবণে যুবনাশ্বের (১৯০২-৭৯) 'পটলডাঙার পাঁচালি' নাটিকা, ফাল্গুনে প্রকাশিত হয় আবার বুদ্ধদেবের কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'। এ বছরেই *কালিকলমের* (১৯২৬-২৭) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' এবং আশ্বিনে 'অনামিকা' কবিতা। একই বছরে নানাভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এতোগুলো রচনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে *শনিবারের চিঠির* আক্রমণ-প্রবণতাকে আরো ইন্ধন জুগিয়েছিল। সাহিত্য-রচনা কিংবা বক্তব্যের মাধ্যমে এঁদেরকে সমর্থন করার অপরাধে শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র প্রমুখ প্রবীণকেও পত্রিকাটি রেহাই দেয়নি। নানাভাবে আক্রমণের পর ১৩৩৩ সালের ২৩ ফাল্গুনে অশাস্ত্রীয় রচনার দ্বারা সাহিত্যাঙ্গনকে কলুষিত করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিচার চেয়ে চিঠি লেখেন *শনিবারের চিঠির* অন্যতম সম্পাদক সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২)। তিনি নরেশচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, মণীশ ঘটক, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব প্রমুখ লেখকের রচনার বিষয়, ভাব, রীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রবীন্দ্রনাথকে দলে টানার প্রয়োজনে একই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে,

> ঠিক যতটুকু পর্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশি আপনি কখনও যাননি। অথচ যেসব জিনিস নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেইসব জিনিসই আধুনিক লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করতো ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখলে কি ঘটত ভাবতে সাহস হয় না।

তারপর কবির বাসভবন জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে—দু'টি বিশেষ আলোচনার অধিবেশন হয় ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসের ৪ ও ৭ তারিখে। প্রথমদিন অনুপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় দিন *শনিবারের চিঠি* ও রক্ষণশীলদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সজনীকান্ত দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩২), মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার (১৯০২-৯৩), অশোক

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ। আধুনিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, রাধারাণী দেবী (১৯০৩-৮৯), দীনেশরঞ্জন দাশ প্রমুখ। আর কিছুটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), প্রশান্ত-চন্দ্র মহলানবীশ (১৮৯৩-১৯৭২), অপূর্বকুমার চন্দ (১৮৯২-১৯৬৭), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), কালিদাস নাগ (১৮৯২-১৯৬৭) প্রমুখ। অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরোপুরিভাবে *শনিবারের চিঠি*র পক্ষাবলম্বন না করায় এ-গোষ্ঠীর ক্ষোভ প্রায় রবীন্দ্রসংঘাতে রূপলাভ করে।[২৭] অচিন্ত্যকুমার ও নরেশচন্দ্রকে প্রশংসা করায় ১৩৩৬-এর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় *শনিবারের চিঠি* রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে। ১৩৩৮ কার্তিকের *বিচিত্রায়* 'নবীনকবি' শীর্ষক রচনায় বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করায় *শনিবারের চিঠি* তার পৌষের 'প্রসঙ্গ-কথা'য় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে 'কাঁটাগাছের আবাদ' বলে মন্তব্য করে। বিভিন্ন সংখ্যায় এছাড়াও রয়েছে সংঘাতের আরো পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ বলে প্রমথ চৌধুরীকে আক্রমণ করে পরোক্ষভাবে তাঁকেই আঘাত দিতে প্রয়াসী হয়েছে এটি।[২৮] প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ও রচনারীতিকে তরুণরা আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও বিভিন্ন সময়ে তাঁদেরকে সমর্থন ও প্রশংসা করে শনিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব ভাষাগত চিন্তাও তাঁদের অভিযোগের কারণ হয়েছিল। শরৎচন্দ্রকে নিজেদের দলে টানতে এবং আধুনিকদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন তাঁরা।[২৯] তরুণদের নবধারা প্রবর্তনের আয়োজনকে সমর্থন জানানো এবং মর্বিড-সাহিত্য রচনা করার অপরাধে নরেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) প্রমুখ সাহিত্যকারকেও তাঁরা কম নাজেহাল করেননি। *শনিবারের চিঠি*র ছিল 'বাঙালভাষা'র প্রতি বিদ্বেষ। ঢাকার বুদ্ধদেব এবং তাঁদের উক্তিতে 'পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট' অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যভাষার বিরুদ্ধেই পত্রিকাটি ছিল বেশি সোচ্চার। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২) প্রমুখ কবির বিরুদ্ধে ছিল দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। জীবনানন্দের বিরুদ্ধে অর্থগত দুর্বোধ্যতা, অন্যদের শব্দগত।

*শনিবারের চিঠি*র প্রবর্তক, সম্পাদক এবং লেখকদের উইট, হিউমার ও স্যাটায়ার রচনায় ছিল অসাধারণ দক্ষতা। এ দক্ষতাকে তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন আধুনিক সাহিত্যের বিরোধিতার কাজে। এ বিরোধিতা স্বল্পসময়ের মধ্যেই সরাসরি আক্রমণে রূপ নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল তাঁদের অপরিসীম ধৈর্য, অসাধারণ দক্ষতা ও সুনিপুণ পরিবেশন-চাতুর্য। তরুণ কথাকারদের 'অশ্লীল' রচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা কদর্যতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রচনা থেকে অশ্লীল ভাবযুক্ত বাক্য ও শব্দ সংগ্রহ করে করে নিজেদের 'মণিমুক্তা' বিভাগে প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই 'অনাবশ্যক হিংস্র'তার পথ পরিহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁদেরকে। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁরা ব্যবহার করতেন যুক্তিপ্রয়োগ, তাত্ত্বিক আলোচনা, প্রতিবাদ-রচনা, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যম। প্রতিপক্ষের প্রতিভাকে অস্বীকার এবং তাঁদের ছিদ্রান্বেষণই ছিল এসবের লক্ষ্য। আক্রমণসূচক সব রচনাই প্রকাশিত হতো বেনামে না হয় অনামে। বিরোধিতার বিভিন্ন কার্যক্রম অল্পবিস্তর চলেছিল যোগানন্দ দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬)— এঁদের সবার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনাকালেই। পরিমল গোস্বামীর পর সজনীকান্ত পুনরায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে *বঙ্গশ্রী* (১৩৩৯) পত্রিকা বের হয়, সজনীকান্ত তার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। *বঙ্গশ্রী* ছেড়ে আসেন দু'বছর পর ১৩৪১-এর পৌষে। *শনিবারের চিঠি*তে যোগদান করেন ১৩৪৩-এর শ্রাবণ, প্রায় দেড় বছর-কাল বেকার থাকার প'র। মাঝের এই সময়টুকুতে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন পরিমল গোস্বামী (পৌষ ১৩৩৯ থেকে আষাঢ় ১৩৪৩)। ১৩৩৪- এর ভাদ্র থেকে ১৩৩৬- এর কার্তিক পর্যন্ত সোয়া দু'বছরের *শনিবারের চিঠি*র পরিচয় মুখ্যত হাস্যরসের পত্রিকা হিসেবেই। এই কালসীমার মধ্যে সম্পাদক তিনজন—যোগানন্দ দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং সজনীকান্ত দাস। তবে নামে যিনিই থাকুন, 'সংবাদ সাহিত্যে'র টিপ্পনীতে, 'মণিমুক্তা'র সংকলনে অথবা স্যাটায়ার রচনার তুলনাহীন দক্ষতার কারণে সজনীকান্তের ভূমিকাই ছিল প্রধান। আধুনিক সাহিত্যের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও তাঁরা নিজেরা কিন্তু এথেকে মুক্ত ছিলেন না। শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে এঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হয়েছেন।[৩০] *শনিবারের চিঠি*র ভূমিকা *কল্লোলে*র জন্যে শাপে বর হয়েছিল। কারণ, নিন্দা-সমালোচনা করতে গিয়ে পক্ষান্তরে আধুনিক সাহিত্যের প্রচারই বাড়িয়ে চলেছিল এটি। তরুণ আধুনিকদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ ও অনুকরণের অভিযোগ করলেও *শনিবারের চিঠি*র মুখপাত্ররা নিজেরাও যে এতে অনাগ্রহী ছিলেন না তা জানা যায় সজনীকান্তের বক্তব্যে।[৩১]

কল্লোল স্বল্পজীবী হয়েও একটি সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল—যার সৃষ্ট সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। *শনিবারের চিঠি* দীর্ঘজীবন লাভ করেও এমন কোনো গোষ্ঠীজোয়ার তুলতে সমর্থ হয়নি। ব্যঙ্গ-কটূক্তির বিশেষত্ব নিয়ে আবির্ভূত এই পত্রিকাটি *কল্লোলে*র মতো স্থায়ী সাহিত্যমূল্যের পরিচয়ও রাখতে পারেনি। এর অন্যতম সদস্য অমল হোম (১৮৯৩-১৯৭৫) এই তরুণ সাহিত্যকারদের ব্যঙ্গ করে 'অতি আধুনিক' এবং তাঁদের সৃষ্ট-সাহিত্যকে 'কামায়ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এওতো সত্য, এতদিনকার সাহিত্যে অনাবিষ্কৃত কিংবা অস্বীকৃত নানান বিষয় সম্পর্কে সত্য স্বীকারে আমাদের দ্বিধা দূর হয়েছে এঁদেরই কারণে। সাহিত্যে এতদিন যা ছিল নিষিদ্ধ, এমনকি অভাবিত কিংবা অস্পষ্টভাবিত, তাকেই তাঁরা স্পষ্টবাক্ করে তুলতে চেয়েছেন তাঁদের রচনায়। নরনারীর যৌন আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁরা অকপটে। প্রেম, বিয়ে, সতীত্ব ও নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে নতুন নতুন প্রশ্ন তুলে ব্যাপক চিন্তার দ্বার উন্মোচন করেছেন।[৩২] কল্লোলীয়দের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসকে 'পথরেখাহীন অরণ্যানী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩৩] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রবণতার পরিবর্তন হচ্ছিল, তাই এঁদের সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কোনো ঢালাও মন্তব্য করা সম্ভব ছিল না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে একথাও তিনি স্বীকার করেন যে, সমাজসমর্থিত নীতিনিয়মকে লঙ্ঘন করলেই সাহিত্য অপকৃষ্ট হয়ে পড়ে না। সমাজনীতির, অর্থাৎ কি হওয়া উচিত, তার সঙ্গে সাহিত্যনীতির, অর্থাৎ কি হয়ে থাকে—এখানেই পার্থক্য। মানুষের জীবনে এসবকিছু ঘটে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসহ এর যথার্থতা প্রমাণ করে দেখানো হয় সাহিত্যে। ইউরোপীয় বিখ্যাত সব সাহিত্যে রয়েছে এর পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষের অবচেতন স্তরে নিহিত সুপ্ত কামচেতনার দ্বারা প্রায়ই তার বাহ্যিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়,

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মবিশ্বাস ও সমাজনীতির প্রয়োজনকে মানতে গিয়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও দেহসম্পর্কিত এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। তরুণ সাহিত্যস্রষ্টাদের এই ধারা পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। সংস্কারের খাতিরে স্বাভাবিকত্বকে অস্বীকার না করে জীবনের বিচিত্র দুর্জ্ঞেয়, অপ্রত্যাশিত ও অপ্রকাশিত বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করার মানসিকতা দান করেছে। পুরনোর সীমারেখা ভেঙে উপন্যাসকে নতুন আকার দেওয়া এবং নতুন পথে পরিচালিত করার এঁদের যে কৃতিত্ব তা অনস্বীকার্য। *কল্লোলের* আবির্ভাব এবং তার অপ্রতিরোধ্য তারুণ্যজোয়ারে আলোচ্য দশকটি চিহ্নিত। একে ঘিরে সেদিন যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল নতুন সাহিত্য-চিন্তা ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রবর্তনায়।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮),পৃঃ ২৬।

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (পঞ্চম সংস্করণ; কলকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৭২),পৃঃ ১৩৭।

৩. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *শরৎচন্দ্র* (ষষ্ঠদশ সংস্করণ; কলকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৪),পৃঃ ১১।

৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯১৯), পৃঃ ১৭৫।

৫. ঐ, পৃঃ ১৭৭

৬. জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসু-সম্পাদিত, শ্রমজীবীদের মুখপত্র *সংহতি* প্রকাশিত হয় ১৯২৩-এ। প্রসঙ্গত নজরুলের *লাঙল*-এর নামও করা যায়।

৭. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, *বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা* (কলকাতাঃ জয়দীপ ঘোষাল, ১৯৯২), পৃঃ ৩০৫।

৮. *The Interpretation of Dreams* (১৯১৩), *The Psychology of Everyday Life* (১৯১৪), *On Dreams* (১৯১৪)।

৯. তাঁর *Studies in the Psychology of Sex* (১৮৯৭-১৯২৮) নামক গ্রন্থে যৌনতা বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সে সময়ের চিন্তা-জগতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮০),পৃঃ ২৮।

১১. 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বিশেষ সংস্করণ; ১৯৭৬),পৃঃ ৫৬০।

১২. অচিন্ত্যকুমারকে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠিতে রয়েছে এমনিতর ইঙ্গিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ* (সপ্তম সংস্করণ; কলকাতাঃ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৯৫), পৃঃ ১৩-১৪।

১৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩।

১৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৪।

১৫. ঐ, পৃঃ ৪৩৭।

১৬. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *শরৎচন্দ্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭-৩৮।

১৭. পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন কর্পোরেশনের কর্মচারী।

১৮. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'কল্লোলের কাল', *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭),পৃঃ ৩২।

২০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

২১. বুদ্ধদেব বসু, *রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য* (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯),পৃঃ ৯৭।

২২. লেখকরা হলেন– বীরবল, শান্তাদেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, ভবানী ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং রাধারাণী দত্ত।

২৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্রনাথ' *কল্লোল*: ১০ম সংখ্যাঃ ১৩৩৩।

২৪. বুদ্ধদেব বসু, *সাহিত্য চর্চা* (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১),পৃঃ ১২৬।

২৫. সোনামণি চক্রবর্তী, *শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য* (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশণী, ১৯৯২),পৃঃ৩১।

২৬. *কল্লোলের* ৫ম সংখ্যা, ১৩৩২ এবং ৮ম সংখ্যা, ১৩৩২-এ যথাক্রমে 'পান্থ' ও 'প্রেতপুরী' নামে তাঁর দু'টি দেহবাদী কবিতা প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়—*কল্লোল*ধর্মী পত্রিকা *কালিকলমে* প্রায়ই তিনি লিখতেন, যার মধ্যে 'কল্লোলগন্ধী' লেখাও ছিল বর্তমান।

২৭. সোনামনি চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

২৮. ঐ, পৃঃ ১১৫।

২৯. ঐ, পৃঃ ২১৩।

৩০. *'নকুড়ঠাকুরের আশ্রম'* রমন্যাস লেখা ও প্রকাশের দায়ে সজনীকান্ত ধৃত হয়ে পঞ্চাশটাকা জরিমানা দিয়েছিলেন। 'নাগার্জুন' ও 'নারীবন্দনা' লিখে অশ্লীলতার অভিযোগে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার।

৩১. সজনীকান্ত দাস, *'আত্মস্মৃতি'* প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬১),পৃঃ ১১৮।

৩২. দেবকুমার বসু,*কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য* (কলকাতাঃ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৩৮৭), পৃঃ ২০৩।

৩৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৫।

৩৪. গৌতম ভট্টাচার্য, *কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতাঃ প্যাপিরাস, ১৩৯৪),পৃঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোকুল নাগ ঃ পথিক

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোকুল নাগ ঃ পথিক

কলকাতার অক্রুর দত্ত লেনের এক বাড়িতে গোঁড়া ব্রাহ্মপরিবারে গোকুলচন্দ্র নাগের জন্ম (২৮ জুন, ১৮৯৪)। মতিলাল নাগ ও কমলা নাগের তিন পুত্র ও দুই কন্যাসন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয়। শৈশবেই তিনি পিতা ও মাতাকে হারান। এই অবস্থায় অগ্রজ কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬) ও অন্য ভাইবোনসহ মামা বিজয় বসুর আশ্রয়ে চলে আসেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় তেমন অগ্রসর হতে পারেননি গোকুলচন্দ্র। পরে, কলকাতার আর্ট স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্যে তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় পার্সিব্রাউন ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব এবং যামিনী রায়, অতুল বসু ও ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহৃদয় সাহচর্য তাঁর শিল্পীসত্তা-বিকাশে দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু অন্তর্পরিচয়ে হেঁয়ালী-স্বভাবের এই মানুষটি শিল্পচর্চা থেকে সরে, ঝুঁকে পড়েন সাহিত্যকর্মের দিকে। একসময়ে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৫-১৯৩০) অধীনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চাকরি গ্রহণ করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে অল্পসময়ের ব্যবধানেই তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।[১]

চেহারায় শুষ্ক রুক্ষ, মিতভাষী ও বাহ্যিক আচরণে নিরাসক্ত মানুষ গোকুল নাগ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া তেমন না করতে পারলেও দেশ-বিদেশের বিচিত্র সাহিত্যপাঠে ছিলেন দারুণ আগ্রহী। গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম এবং বসবাস সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের গভীরে নিহিত ছিল নিঃশব্দ-বিদ্রোহের বীজ। আর্টস্কুলে পড়াশোনা শুধু নয়, ছায়াছবিতে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। রক্ষণশীল সমাজের বিধি ও বিধানকে পরোক্ষভাবে লঙ্ঘন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি এভাবেই। মামা বিজয় বসুর আশ্রয়ে থাকাকালে তাঁর ফুলের দোকান দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল গোকুল নাগের ওপর। এ সময়ে দীনেশরঞ্জন দাশের (১৮৮৮-১৯৪১) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। দু'জনের সম্মিলিত উদ্যোগ ও আগ্রহে এবং অন্যসব সহযোগীর আনুকূল্যে জন্ম নেয় *কোর আর্টস ক্লাব* বা চতুষ্কলা সমিতি (১৯২১-২২)। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ ও পারিপার্শ্বের প্রতিবন্ধকতার মুখে নারীপুরুষের সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র আধুনিক রুচিশোভন এই প্রতিষ্ঠানটি বেশিদিন টিকে থাকতে সমর্থ হয়নি। যে-সম্ভাবনার মূল নিহিত ছিল এই সাহিত্যিক আড্ডাটির মধ্যে, তা পরে দীনেশরঞ্জন ও গোকুল নাগের মিলিত প্রয়াসে মাসিক সাহিত্যপত্র *কল্লোল* (১৯২৩-২৯) রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কল্লোল প্রকাশের পূর্বেই গোকুল নাগের অনেকগুলো গল্প *প্রবাসী*, *ভারতী*, *নব্যভারত* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাসনা ও বিক্ষোভ যা কিনা যৌবনধর্মের দুই ভিন্নরূপ— তার লক্ষণ ফুটেছে তাঁর ওইসব সৃষ্টির মধ্যে। তবে বাস্তব জীবন ও পরিস্থিতি তাঁকে সাহিত্যচর্চায় আনুকূল্য দেয়নি। একদিকে স্বাস্থ্যহীনতা, অন্যদিকে অর্থলাভের অনিশ্চয়তা, তার উপর চারটি সন্তানসহ বিধবা বড়োবোনের দায়িত্ব গ্রহণ। দাদা কালিদাস নাগ তখন য়ুরোপে পড়াশোনা করছেন ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্যে। সংসার চালাবার প্রয়াসে গোকুল নাগকে করতে হতো প্রাণান্তকর পরিশ্রম। *কল্লোলের* সহসম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি করেছেন লেখালেখির কাজ। *কল্লোলের* কাজকর্ম সারতে সারতে রাত ন'টা-দশটা হতো। কলকাতার অপর প্রান্তে তাঁর বাসস্থান, পয়সার অভাবে হেঁটেই যেতে হতো তাঁকে। পরেরদিন খুব ভোরে ছাপাখানায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বলে রাত থাকতেই ফের হাঁটতে শুরু করতেন।[২] এর মধ্যেই

Dhaka University Institutional Repository

কল্লোলের জন্যে জুগিয়ে গেছেন তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস *পথিকের* কিস্তি। ১৯২৩ সাল থেকেই মাঝে মাঝে জ্বর হতো তাঁর। ১৯২৫-এ ধরা পড়ে যক্ষ্মা রোগ। দার্জিলিংয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)। স্যানাটোরিয়ামে টি, বি, ওয়ার্ডে থাকাকালে *কল্লোলে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর *পথিক* উপন্যাসটি ছাপা হচ্ছিল কাশীতে, ইন্ডিয়ান প্রেসে। ডাকে আসা প্রুফ সংশোধন করতেন তাঁকে দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪)। পরিবর্তন প্রয়োজন হলে গোকুল নাগ তা মুখে মুখে বলে দিতেন।[৩] ১৯২৫ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রকাশনায় ২২/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে চারশ' চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

গোকুল নাগ, সুনীতি দেবী, দীনেশরঞ্জন দাশ ও মনীন্দ্রলাল বসুর সহযোগে রচিত ও প্রকাশিত হয় *ঝড়ের দোলা* (১৯২২) গল্পসংকলন। এর মধ্যেকার 'পাগল', 'মাধুরী', 'শ্রীপতি' ও 'জয়মালা' এই চারটি গল্পের দ্বিতীয়টির লেখক তিনি। টেনিসনের *দি প্রিন্সেস* কাব্য অবলম্বনে ছোটদের জন্যে তিনি রচনা করেন *রাজকন্যা*। মানবজীবনের কান্নাহাসি, অতৃপ্তির বিষয় অবলম্বনে রচিত নয়টি কথিকা জাতীয় রচনার সংকলন *রূপরেখা* (১৯২২)। বড়োগল্পগ্রন্থ *সোনার ফুল* (১৯২২)। এসব গল্প ও কথিকায় অনুভব করা যায় যথার্থ আঙ্গিক, প্লট ও বাস্তব পরিবেশের ব্যতিক্রম একধরনের গীতিধর্মিতার লক্ষণ। অবশ্য *কল্লোলে* তার স্বতন্ত্র রূপ। স্বপ্নাতুর আবেগময়তার চেয়ে জীবনকে অনেক কাছে থেকে দেখার ও অনুভব করার প্রবণতা বিদ্যমান তাঁর এ সময়ের সৃষ্টির মধ্যে। *সোনার ফুল* নারীর কামনা-বাসনার বিষয়াশ্রিত বলে রক্ষণশীলদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। 'বসন্তদোলা' গল্পের মধ্যে বিধবা নারীর অতৃপ্ত যৌবনের তৃষ্ণার্ত বাসনার কথা উচ্চারিত। মেটারলিঙ্কের *ব্লু-বার্ড* নামক নাটকের বিষয় নিয়ে তিনি ছোটদের জন্যে রচনা করেছেন উপন্যাস *পরীস্থান* (১৯২৪)। *পথিক* (১৯২৫) বড়োদের জন্যে লেখা তাঁর একমাত্র উপন্যাস। *কল্লোলের* প্রথমসংখ্যা থেকে দু'একটি সংখ্যা ছাড়া দেড় বছরে মোট ষোলোসংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশ পায়।[৪] উনিশটি গল্পের সংকলন নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় *মায়া মুকুল* (১৯২৭)।

কলকাতার এক ধনী আধুনিক পরিবারের বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে গোকুল নাগের *পথিক* উপন্যাসের কাহিনী। বীরেন্দ্রনাথ ও স্ত্রী করুণার দু'সন্তানের মধ্যে বড়ো শ্রীশ, স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী। কন্যা দীপ্তি। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তাভাবনায় এক সহজ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি এদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান। এ পরিবারে এসে যুক্ত হয়েছেন করুণার বড়োবোন সুবর্ণ। চিন্তা ও আচরণে সুবর্ণ এঁদের মতো প্রগতিশীল নন। মায়া তাঁরই সন্তান, কিন্তু চিন্তাচেতনায় জননীর সঙ্গে তার মিল নেই। সপ্তাহ শেষে সে হোস্টেল থেকে আসে, এসেই বাড়িময় আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। শ্রীশের জেলফেরৎ বন্ধুরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে পরিচিত হয় মায়া, দীপ্তি ও তাদের মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে। নতুন সম্পর্কের সূত্র ধরে এদের কারো কারো মধ্যে সূচিত হয় প্রেমের সম্পর্ক। প্রেম থেকে ঘটে মিলন কিংবা বিচ্ছেদ। জন্ম নেয় এদের জীবন-পথের একেকটি কাহিনী। কাহিনীর সূত্রে জানা যায় তাদের সংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তা ও মতামতের বিচিত্র দিকের কথা। তাদের মেলামেশা ও প্রাণোচ্ছল বন্ধুত্বের মধ্যদিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র রহস্যময় জগৎ। নতুন যুগের স্বপ্নকল্পনা এবং জীবন সম্পর্কে লেখকের নতুন সিদ্ধান্ত এদের বক্তব্য ও আচরণের মধ্যদিয়ে রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসের সর্বত্র। মূল কাহিনীতে অসংখ্য চরিত্রের ভিড়। প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে শ্রীশ, বিকাশ, সুপ্রকাশ, জীবন, মুনি, অসিত, মায়া, দীপ্তি,

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণী, তটিনী, কমলা, শান্তা, উমা ও রাধা। রয়েছেন এদের কারো কারো জনকজননীরাও। রয়েছে তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

শ্রীশ এ কাহিনীর নায়ক। একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল। পোশাক পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে সর্বত্র তার যত্নহীনতার সাক্ষ্য। মনে প্রাণে সে একজন খাঁটি স্বদেশী। গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন সে দেখতে চেয়েছে ঘরে-বাইরে সর্বত্র। পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেল খেটেছে, Ancient civilization-এর উপর থিসিস লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদের আমন্ত্রণ পেয়েছে, কিন্তু সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে সে খুলেছে খদ্দরের কারখানা। ঘাড়ে বয়ে খদ্দর বিলি ও বিক্রি করে সে বন্ধুদের নিয়ে। কিন্তু এ বাহ্যিকতার আড়ালে তার বুক জুড়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এক যন্ত্রণার লাভাস্রোত-ধারা। তটিনীর প্রেমের অমৃত-আহ্বান কে অস্বীকার করে এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে সে গোপনে, নিজের মধ্যে নিজে রক্তাক্ত হয়ে। এ আত্মপীড়নের মধ্যেই সে অনুভব করে অপার আনন্দ।

> যেখান হইতে তটিনীর দেওয়া আঘাতগুলি সবার অলক্ষ্যে অতি সহজে সে পাইতে পারে, এমনস্থান, সময়, সুযোগ সে খুঁজিয়া বাহির করিত। একান্ত নিষ্ঠার সহিত ঐ বেদনাকে সে আপনার বক্ষে ধারণ করিত। পৃঃ ৪৩৯

শ্রীশের মধ্যে রয়েছে এক বোহেমিয়ান স্বভাব- প্রবণতা। অবশ্য মরুভূর শূন্যতা পুষেও সে জীবনবিমুখ নয়। মায়া, দীপ্তি ও তাদের বন্ধুদের প্রয়োজন- অপ্রয়োজনের উপকরণ জুগিয়ে জুগিয়ে সে তাদেরও দাদা, মায়ার ভাষায় Public property.

মায়ার রয়েছে এক সহজ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি, যা তার কথায় ও আচরণে প্রকাশিত। প্রাণবন্যায় ভরপুর এ তরুণীটি নতুন চিন্তা, মত ও পথের প্রতিনিধি। প্রচলিত সমাজগণ্ডী থেকে মুক্তির অভিলাষ তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। মুক্ত আত্মার অধিকারিণী মায়া কোনো বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে সহস্র কাজের মধ্যদিয়ে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতেই আগ্রহী। অভিভাবকের অবিশ্বাস সন্তানের মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে কিভাবে খর্ব করে দেয় মায়ার উক্তিতে রয়েছে তার পরিচয়। সন্তানদের সম্পর্কে অভিভাবকের চিন্তাভাবনায় অবিশ্বাস, যার মূল পরোক্ষত অশ্রদ্ধায় নিহিত, তার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী হয়েছে। প্রতিবাদী হয়েছে স্নেহ কিংবা শাসনের নামে তাঁদের জবরদস্তির বিরুদ্ধেও। সভ্যতার কিংবা আভিজাত্যের নামে যে সমাজ মানুষকে হেয় বিবেচনা করে সেই তথাকথিত 'সভ্যসমাজে'র বিরুদ্ধে তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ক্ষোভ। পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রচনায় তার কোনো জড়তা নেই, বরং সহজ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সে তাদের সঙ্গে কথা বলেছে, আচরণ করেছে, আহ্বান করেছে বন্ধুত্বে। শ্রীশের সঙ্গে হ্যাভলক এলিসের *Sex Psychology* পড়তে এবং কন্টিনেন্টাল লেখকদের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করেনি সে। সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ স্পষ্ট হয়েছে তার প্রগতিশীল চিন্তা ও প্রতিবাদী উক্তিতে। সংসারে সন্তানের জন্যেই পুরুষের ভার্যার প্রয়োজন, 'নারী তাঁদের কাছে শুধু স্ত্রী আর কিছু না'— নারীত্বের এহেন অবমাননাসূচক প্রবাদ ও বিবেচনার বিরুদ্ধে সে ক্ষুব্ধ-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সমালোচক জীবেন্দ্র সিংহরায় এই মায়াচরিত্রটিকে শুধু বর্তমানের প্রতিনিধি নয় ভাবীকালেরও দোসর বলেছেন।[৫] তার চোখের দিকে তাকিয়ে বাইরের জগতের ব্যাপকতাকে প্রত্যক্ষ করেছে দীপ্তি। মায়ার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আভাসিত হয়েছে মূলত লেখকেরই নতুন সমাজ নির্মাণের অভিলাষ। এই সমাজভাবনার সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে মায়ার নারীবাদী ব্যক্তিসত্তা, যা কিনা 'সহস্র সহস্র বৎসরের শৃঙ্খলিত

Dhaka University Institutional Repository

নারী' হৃদয়ের প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা পালন করেছে। পুরুষের কারণে নারীর অধিকারের প্রতিবন্ধকতা তাকে ক্ষুব্ধ ও আহত করেছে। তার কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরেছে, যেহেতু সমাজনিয়মের দোহাই দিয়ে নারীকে হাজারো অবিচারের প্রতিবিধান চাইতে হয় পুরুষেরই কাছে, যেখানে ন্যায় ও নিরপেক্ষতা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করা চলেনা। স্বীয় প্রাগ্রসর চিন্তা ও চেতনার আলোকে সে উপলব্ধি করে— নারীর সহযোগিতা ছাড়া পুরুষের শক্তি অসম্পূর্ণ। মায়া লেখকের মানস-আদর্শের আদলে গড়া নিছক পুতুলপ্রতিমা মাত্র নয়, বরং প্রাণচাঞ্চল্যে, মানসিক পরিপক্বতায়, নারীত্ব ও মাতৃত্বের অনুভূতিতে পূর্ণ বিকশিত এক মানবী। তার নারী সত্তার দু'টি দিক— নারীত্ব ও মাতৃত্ব জেগে উঠেছে যথাক্রমে জীবন ও বিকাশকে আশ্রয় করে। সে বলেঃ

> ছেলেমেয়ে না হলে বাঁচব কি ক'রে ? Eternal Feminine তটি, মা আমাদের হতেই হবে। নিজের না হোক পরের ছেলের। পৃঃ ৪৫৪

আর মুকুলকে আশ্রয় করে জাগ্রত হয়েছে তার সুপ্ত প্রেমানুভূতি। লোকালয়ে, দিনের আলোয় সবার জন্যে সে প্রাণবন্যা ছড়িয়ে চলে, আবার রাতের নিভৃত অবকাশে মুখোমুখি হয় নিজের মর্মবাসী নিঃসঙ্গ আত্মার। এ নিঃসঙ্গতার মূলে রয়েছে তার নিজেরই স্বাতন্ত্র্যধর্মী মানসগঠন।

মমতা আর সেবাময়তা বিকাশ চরিত্রটির স্বভাবের অন্যতম বিশেষত্ব। শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীর দুঃখেও তার চোখে জল আসে। তাই তার বন্ধুরা তাকে ডাকে 'মিস বোস' বলে। সমাজ ও দেশের বাইরে দীর্ঘ বসবাস এবং রক্তধারা সূত্রে মাতাপিতৃহীন বিকাশ অর্জন করেছে মুক্ত চিন্তা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বিবাহনীতি সম্পর্কে তার মতামতের মধ্যে রয়েছে এর পরিচয়। নিজের জীবনকে নিঃস্ব করে দিয়েও নিয়মভাঙা এ মতকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তার মতে, সামাজিক বিধিসম্মত বিয়ের নামে স্ত্রী পুরুষের শারীরিক বন্ধনটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আত্মাকে করা হয় অস্বীকার।

> একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তাদের মনের সমস্ত বিশ্বস্ততা নিয়ে যদি পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায় আর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উভয়কে আশ্রয় ক'রে নতুন মানবপ্রাণ জগতে বেড়ে ওঠে, তাহলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধটা কেন স্থায়ী হবে না? পৃঃ ৯৪

একদিকে সে বিদ্রোহী, অন্যদিকে শিল্পী। ফলে পরবর্তীকালে একধরনের রোমান্টিক বেদনার পীড়ন হয়েছে তার নিয়তি। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ-সমর্থিত সংস্কার সম্পর্কে লেখকের নবচিন্তা, যুক্তি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে বিকাশের বিভিন্ন বক্তব্য ও আচরণের মধ্যে। ধর্ম সম্পর্কে প্রাগ্রসর দৃষ্টিকোণ-আশ্রিত মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তার উক্তিতেঃ

> ধর্ম জিনিসটার ভিত্তি আছে মনুষ্যত্বের ওপর, এই মনুষ্যত্বে যেখানে গলতি, সেখানে ধর্মের বাঁধন টেঁকেনা। তাছাড়া ধর্ম যে বাঁধন খোলবার জিনিস, বাঁধন কাটাবার। ধর্মকে আশ্রয় ক'রে আমি যখন আপনার পাশে এসে দাঁড়াব, তখন যে আমি মাটিতে থেকেও আমার মন থাকবে মাটির বাইরে, কিন্তু মাটিতে যখন আছি তখন মাটির বাঁধনকে অগ্রাহ্য করব কেন ? পৃঃ ৯১

নির্বিরোধী স্বভাবের মেয়ে দীপ্তি। মায়ার প্রতিবাদী বক্তব্য ও আচরণে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হতে থাকে, বুকের নিভৃতে তোলপাড় করে ওঠে বিপ্লবের আলোড়ন, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ কিংবা নিয়মভাঙার দুঃসাহস তার নেই। তার চিন্তা ভাবনার শেকড় মূলত সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজমাটির গভীরেই প্রোথিত। অথচ

Dhaka University Institutional Repository

দেহেমনে সে প্রাণরসে সঞ্জীবিত এক নারী। অমলের প্রত্যাখ্যান তাকে যেমন মর্মাহত করে, তেমনি বিকাশের উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ তার মধ্যে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা জাগায়। এমন কি, বিকাশের দেহস্পর্শহীন প্রেম ও আচরণের একপর্যায়ে তার এও মনে হয়—

> পুরুষ কেন এমন হয় ? শক্তি সুযোগ, সুবিধা তাহার আয়ত্তের মধ্যে থাকিতেও সে কেন তাহা ব্যবহার করিবেনা ?... বিকাশ এমন করিয়া তাহার অনুমতির অপেক্ষায় না থাকিয়া যদি— হাঁ, যদি আজ তাহাকে চুম্বন করিত, সে একটুও রাগ করিত না, ... পৃঃ ২৯২

দৃঢ়তা ও স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতারহিত একধরনের পরনির্ভরশীলতা তাকে করেছে দোলায়িতচিত্ত। বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাবার পর মা-বাবার অনুমতি লাভের পূর্বেই অসিতের সঙ্গে বিয়েতে সে মত দিয়েছে, মত দিয়েই আবার সিদ্ধান্তহীনতায় ছটফট করেছে, বিয়ে ভেঙে দিতে অনুরোধ করেছে জননীকে। অন্ত-র্যাতনার ধারাবাহিকতায় বিয়ের রাত থেকেই অসিতের প্রতি সে বিমুখ হয়ে ওঠে এবং অন্যঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করে। আবার, অসিতের জবরদস্তিহীন ব্যবহারের কারণে তার এটাও মনে হয়েছেঃ

> বিদ্রোহ সেইখানেই প্রবল হইয়া উঠে, যেখানে মানুষ বিদ্রোহ দমনের জন্য পাশবিক শক্তির প্রয়োগ করে। কিন্তু বিনা বিচারে এবং প্রতিবাদে মানুষ যখন তাহার সমস্ত অধিকারের দাবী বিদ্রোহীর হস্তে সমর্পণ করে, বিদ্রোহী সেখানে অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়, বিদ্রোহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। পৃঃ ৩৫৩

শুধু তাই নয়, স্বামীর সহৃদয় ব্যবহারের কারণে তার মনে কখনো কখনো দেখা দিয়েছে বিমুগ্ধ বিস্ময়—

> কি সুন্দর পুরুষ, কি নির্মল ইহার স্নেহের বন্ধন! পৃঃ ৩৬৭

দুর্বল মানসগঠনের কারণে এ চরিত্রটির অনেকটা অংশই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পূর্ণ।

সুধাপুরের জমিদারের সন্তান অসিত, কাকার হিংস্র চক্রান্তে কৈশোরে পিতাকে হারায়। শেষে বেঁচে থাকার জন্যে, মকবুল আলী নাম গ্রহণ করে জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেতে পলায়ন করে। সেখানে, শুধুমাত্র মনের জোর সম্বল করে, অতি নিম্নমানের এক হোটেলে কাজ নিয়ে, মানুষের ফেলে দেওয়া এঁটোকাঁটা খেয়ে অবশেষে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। চেহারায় তার 'রৌদ্রতাপের একটা ঝলসানো ভাব' এবং রুক্ষদগ্ধ 'পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে', লোকের বিবেচনায় সে এখন 'Millionaire' এবং 'Tons of money'-র অধিকারী। সংসারের ক্রূর কুটিল রূপ দেখে দেখে সে বড়ো এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্ভবত এরই প্রতিক্রিয়ায় জীবনকে, সংসারকে, জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে সে ব্যবসাদারী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করেছে। ব্যবসায়ী চিন্তার নিরিখে বিচার করেই দীপ্তিকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়েছে। কিন্তু দীপ্তিকে লাভ করার পর তার মমতা ও প্রেমের উষর ভূমিতে সে অনুভব করেছে প্রাণের সঞ্চার। এভাবে তার হৃদয়ানুভূতি জাগ্রত হয়েছে এবং চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও উপন্যাসে তার মানসপরিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাইনা, তাই তা আকস্মিক বলেই মনে হয়, তবু অনুমান করা যায়— এর মূলে কাজ করেছে তার নবলব্ধ জীবনানুভূতি। দীপ্তিকে পেয়ে সে স্বামিত্বের চেয়ে বন্ধুত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং স্নেহ দিয়েও যেন ওর উপর অত্যাচার করে না ফেলে সে-বিষয়ে সতর্ক থেকেছে। সে উপলব্ধি করেছে 'স্ত্রীর বন্ধুত্ব না পেলে পুরুষের শক্তি অনেকখানি

Dhaka University Institutional Repository

পঙ্গু থেকে যায়'। শ্রীশের বিবেচনায়— পুরুষের উপযুক্ত শরীর শুধু নয়, মনটাও তার পুরুষের উপযুক্ত। কারণ, প্রতারক এবং অনিষ্টকারী অমলকে শিক্ষা দিয়েছে সে-ই।

শিল্পী মুকুল জন্ম-পরিচয়হীন এক যুবক। ফলে শৈশব থেকেই মায়ামমতা, স্নেহাদর থেকে বঞ্চিত সে। অনাথ-আশ্রমে বড়ো হবার ফলে জীবন সম্পর্কে একধরনের নেতিবোধ কাজ করে তার মধ্যে। সে হয়ে উঠেছে উদাসীন, বন্ধন-অসহিষ্ণু এবং বোহেমীয় স্বভাবের অধিকারী। স্নেহ, প্রেম, মমতাকে সে উপদ্রবরূপে গণ্য করেছে, হৃদয়ানুভূতির অসহ্য আয়োজনকে এড়াতে স্থানত্যাগ করেছে দ্রুত। 'কোন নারীকে জয় করতে মুকুলের তিন দিনের বেশী সময় লাগেনা। কোন বিজিত নারীকে সে সাতদিনের বেশী সহ্য করেনা'— তার সম্পর্কে বিমলের এই মন্তব্য সত্ত্বেও মায়া এবং কমলা এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে— যদিও দু'জনের মধ্যেকার আকর্ষণের ধরন ভিন্ন— বাঁধা পড়েছে তার সঙ্গে। মায়া এবং কমলার হৃদয়মাধুর্যের পরিচয় লাভ করে মুকুলেরও মনে হয়েছে— এতোদিন যেন সে মৃতের পৃথিবীতে বেঁচে ছিল। কিন্তু স্বভাবে বোহেমিয়ান এ মানুষটি তো স্নেহে, মায়ামমতায় বাঁধা পড়ে থাকার নয়! সে বলে—

> আমার জীবন সব যুক্তি-তর্কের বাইরে। আপনাদের কোন বিধি-বিধান আমার জন্য নয়। পৃঃ ৪১৫

মায়া ও কমলাকে ভালোবাসতে শুরু করে এবং নিজে ভালোবাসার বন্ধনে ধরা পড়ার আশঙ্কায় সে তাদের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে যায়। বিদায় নিয়ে পথের টানে ভেসে চলে অনির্দেশের উদ্দেশে।

অমিতাচারী এক জমিদার জনকের সন্তান জীবন, শৈশবেই পিতৃহীন। জমিদারীর বাৎসরিক আয় প্রায় ষাটহাজার টাকা হলেও তার পরলোকগত পিতার ছয়লক্ষ টাকা ঋণ ও একাধিক স্থান থেকে তাঁর পিতৃত্বের প্রমাণ নিয়ে কোর্টে নালিশ এবং এসবের ধারাবাহিকতায় জমিদারীর অনেকটা অংশ হাতছাড়া হয়ে যাবার অশান্তি বুকে নিয়ে জীবনকে বড়ো করেছেন তার জননী। স্বামীর বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ঔরসজাত সন্তানের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি তিনি। তাছাড়া অবয়বগত দিক দিয়ে জীবন ছিল তার পিতারই প্রতিরূপ। এসব কারণে শৈশব থেকেই জননীর স্নেহাদরবঞ্চিত সে। ফলে একধরনের অপরাধবোধ এবং আবেগমুক্ত মানসলক্ষণ আশ্রয় করে সে বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে গ্রহণ করেছে নিস্পৃহ ঔদাস্যে। আবার মর্মনিভৃতে যৌবনানুভূতির কুঁড়ি দল মেলে দিলে রোমান্টিক আবেগেও সে তাড়িত হয়েছে। পুলিশের লাঠির চোটলাগা মাথার ক্ষতে বেঁধে দেওয়া মায়ার শাড়ীর আঁচলের ছেঁড়া টুকরোটি সে রক্ষা করেছে সযত্নে। চিন্তা, অনুভূতি ও তা প্রকাশের মধ্যে তার রয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন, আবেগমুক্ত এক সরাসরি ভঙ্গিঃ

> দেখ বিমল, আমি মায়াকে ভালবাসি—... But I am going to treat this like a man— যা হয় একটা ঠিক করে ফেলতে চাই, দিনের পর দিন শূন্যে ঝোলাটোলা আমার দ্বারা বেশীদিন হয়ে উঠবেনা। পৃঃ ১৫৮

শুধু তাই নয় মায়াকে প্রস্তাব দিতে গিয়ে সে বলেছে—

> আপনাকে ভালবাসি একথা বললে কি আপনার অপমান হবে ? — কিন্তু ওটা সত্যি! পৃঃ ১৬০

মায়া তার প্রেমে সাড়া না দিলে ফের এভাবেই মায়াকে বলা কথাগুলো বিমলের কাছে সে ব্যক্ত করেছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

> আমার ভালবাসাটা এইখানেই শেষ করে ফেলতে চাই। তুমি আমায় ভালবাসবেনা, অথচ আমি তোমার জন্য রাত জেগে কবিতা লিখব, ছটফট করব, সে মানুষ আমি নই ... আমাকে অবহেলা করে চলে যাবে, তবু আমি কাদার মতো তোমার পায়ে লেগে থাকব, সে মানুষও আমি নই। —আমি চেয়েছিলাম তোমাকে, আমি দিতে চেয়েছিলাম আমাকে, দিলেনা নিলেনা।— ব্যস চুকে গেল, ... পৃঃ ১৬০

এই আবেগমুক্ত জীবনই আবার অপরিসীম ঔদার্যে কুমারী জননী সুধার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব নিতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থকরী কর্মগ্রহণের পরিবর্তে সাহিত্যসাধনায় নিয়োজিত হয়েছে— এই সব কিছুর মধ্যথেকে বাহ্যিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও তার নিভৃতচারী রোমান্টিক সত্তাটিকে খুঁজে নেওয়া যায়।

লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রবণতা ও মর্মলোকবাসী স্বপ্নকল্পনা বিম্বিত হয়েছে উপরিউক্ত চরিত্রগুলোর চিন্তা ও আচরণের মধ্যে। রোমান্টিক আবেগপূর্ণ হৃদয়ানুভূতি এদের সবারই সাধারণ লক্ষণ। এরই অতৃপ্ত হৃদয়তাড়না শ্রীশ ও মুকুলের দুঃখ-বিলাসের মূলে নিহিত। নিজের ভেতরে বাসনার ধূপ জ্বলে তার গন্ধে নিজেই বিভোর হয়েছে বিমল। মর্মবাসী তিক্ততা থেকে উদ্ভূত একধরনের মর্বিডিটি (Morbidity) আশ্রয় করেছে সুপ্রকাশ। অসুস্থ অতীত অধ্যায়ের স্মৃতি বয়ে চলেছে তার বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত মর্মদেশ, কিন্তু বন্ধুদের দুঃখ বেদনার ভাগ নিয়েছে সে সাগ্রহে। বলেছেঃ

> আমি যেন মিউনিসিপালিটির 'কনজারভেন্সী লরি'!— দুনিয়ার ময়লা বুকে নিয়ে বেড়াই। পৃঃ ৪১

আবার মাঝে মাঝে সে বিষাদমলিন হয়েছে, ক্ষিপ্ত হয়েছে কখনোবা, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে সরে যেতেও চেয়েছে।

উপন্যাসে রয়েছে প্রেমে ঔদার্যে পূর্ণ শান্তা, নেতিবাচক জীবন ও অবস্থাকে আশ্রয় করেও যে তরুণীটি আশাবাদকে বিসর্জন দেয়নি— সে-ই উমা, ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্নকল্পনায় উদ্ভাসিত স্বদেশী আন্দোলনকর্মী সুধীর, চিন্তা ও আচরণে সমাজপ্রচলিত অভ্যস্ত বিবাহনিয়মকে লঙ্ঘনকারিনী কমলা, নতুন যুগের জননী করুণা— যিনি সুস্থসবল সন্তানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননা, এবং গৌরববোধ করেন অসহযোগ আন্দোলনের সৈনিক পুত্রের জন্যে। উপন্যাসে আরো রয়েছেন শ্রীশের জনক রসনাবিলাসী ও বিজ্ঞাননস্ক বীরেন্দ্রনাথ, বস্তুবাদী ও রসিক মামা নগেন্দ্রনাথ। নিয়ত ত্রুটিসন্ধানী নারী— মাসী সুবর্ণ— পরছিদ্রান্বেষী বলে মন্দিরে গিয়েও তার ধর্মাচরণ সম্ভব হয়না। কোন মেয়ের প্রতি কোন ছেলের তাকানোর মধ্যে কি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে, মেয়েটিইবা কিভাবে সবার অলক্ষ্যে তাতে সাড়া দিয়েছে— এসব অনুসন্ধানেই তার সময় পার হয়ে যায়। দেহাবয়বে সৌন্দর্য থাকলেও মনের সুস্থসংযোগের অভাবে তাতে প্রাণধর্মের লক্ষণ নেই। অবশ্য পরে, নবজীবন-ভাবনায় উদ্ভাসিত এ পরিবার ও শ্রীশের তরুণ বন্ধুদের প্রভাবে তার মানসপরিবর্তন হয়েছে। স্মৃতিচারণ-সূত্রে এসেছে বিকাশের মামা দ্বিজেশের কথা। তিনি প্রেমিকা বিমলার পিতার কারণে দেশ ছেড়ে যান, দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়ে ফিরে আসেন ও বিমলার মৃত্যুর পূর্বে তার মৃত্যুশয্যাকে ফুলশয্যায় পরিণত করেন।

অসিতের বোন রাধা, পুতুলখেলার বয়স না কাটতেই 'স্বামীর পদাঘাত বুকে নিয়ে অসময়ে' জন্ম নেয় তার প্রথম মৃত সন্তান। এভাবে আরো দু'টি সন্তানকে হারাবার পর অবশেষে দু'জন জীবিত সন্তানের

Dhaka University Institutional Repository

জননী হয়েছে সে। স্বামীর নির্যাতন সত্ত্বেও সে বেঁচে থাকার প্রেরণা পায় ওদেরই আকর্ষণ থেকে। উপন্যাসে রয়েছে তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত নারীপুরুষের অনেকগুলো চরিত্র। এদের অনেকেই আবার একে অপরের নামে কুৎসা রটনায় পারঙ্গম।

অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে *পথিকের* কাহিনীধারা বজায় রাখা সম্ভব হবেনা— *কল্লোলে* ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হবার সময়ে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু গ্রন্থাকারে বেরোবার পরে *কল্লোলের* 'ডাকঘর' বিভাগে উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখা হয়—

> পথিক উপন্যাসখানা এতদিন পরে বেরুল। বাংলাদেশে এমন উপন্যাস আর বেরিয়েছে ব'লে কি মনে হয়? কল্লোলে যখন ধারাবাহিকভাবে বেরুত তখন সকলেই বলত গোকুলবাবু যে উপন্যাস খানিতে এতগুলি চরিত্র এনে জড় করেছেন, এগুলিকে নিয়ে শেষকালে হাঁফিয়ে পড়বেন।
> কিন্তু বাহাদুরি ঐখানে, ঠিক করে সব মানুষগুলিকে গুছিয়ে চলা খুউব বড় কারিগরের হাত বলতে হবে।[৬]

শুধু তাই নয়— পৌষ, ১৩৩৪-এ *প্রবাসীর* পুস্তক পরিচয় অংশে গোকুল নাগের *মায়া মুকুল* গ্রন্থের কথা বলতে গিয়েও *পথিকের* প্রশংসা করা হয়। সুকুমার সেন *পথিককে* আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭]

পথিক উপন্যাসে সমাজনিয়মের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রসঙ্গে এসেছে লেখকের নবজীবনোপলব্ধির পরিচয়। তরুণ-তরুণীর প্রেম, বিবাহসম্পর্কিত আধুনিক জীবনচেতনায় সমৃদ্ধ দৃষ্টি ও মনোভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সমরেশ মজুমদারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> উপন্যাস যে মনস্তাত্ত্বিক জীবন প্রকাশের আধার, গোকুলচন্দ্র 'পথিক' উপন্যাসের মাধ্যমে সে সত্য কল্লোলীয়দের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। মুকুল-মায়া, শ্রীশ-তটিনী, অসিত-দীপ্তি, সুপ্রকাশ-শান্তা প্রভৃতি যুগলের আচার আচরণের মধ্যদিয়ে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। প্রচলিত নৈতিকতার কূপমণ্ডুকতাকে ছিন্ন করেছেন, সংস্কারের দাসত্বের দায় থেকে নরনারীকে মুক্ত করেছেন।[৮]

প্রসঙ্গত জীবেন্দ্র সিংহরায়ের উক্তিও এখানে উল্লেখ করা যায়—

> এই যৌবন পথিক গোকুলচন্দ্র কল্লোলের পৃষ্ঠায় 'পথিক' উপন্যাসে বসালেন যৌবনের মেলা। সেখানে কত নারী পুরুষের দুরন্ত প্রাণের মিছিল। সকলেই চলছে, চলতে চলতে সুখদুঃখের বিচিত্র ঢেউয়ে দোলা খাচ্ছে এবং আপন আপন পথিকবন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যৌবনোচিত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তারা বাঁচতে শিখেছে।[৯]

গোকুল নাগের *পথিক* উপন্যাসে বিভিন্ন বক্তব্যের পাশাপাশি লেখকের ব্রাহ্ম-হিন্দু সম্পর্কিত ভাবনাও ধরা পড়েছে। এ বিষয়-জিজ্ঞাসার পথ ধরে এসেছে লেখকের বক্তব্য ও উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মুখনিঃসৃত উক্তি। উপন্যাসের প্রথমদিকে শ্রীশের জননী করুণার বক্তব্যে জানা যায়— ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে চালচলনগত ভিন্নতা এবং রুচিগত নিম্নতা লক্ষ করে হিন্দু তরুণীদের উদ্দেশে তাদের অশ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথা। মায়ার জননী সুবর্ণের উক্তির মধ্যদিয়ে ফুটেছে হিন্দু যুবকদের প্রতি তাঁর ব্রাহ্ম-

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মবিশ্বাসজাত উন্নাসিক মনোভাবের পরিচয়। শ্রীশের হিন্দু বন্ধুদের কথাবার্তার মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে উভয়ধর্মের রুচি, আচরণ, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কথা—

> ব্রাহ্মরা হিন্দু হতে পারে, কিন্তু বাঙালী নয়। ...আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সহজ সম্বন্ধটা বজায় নেই। কিন্তু কোথায় যেন মেলে না তা তোমায় বোঝাতে পারব না। পৃঃ ৪৪

কতিপয় ব্রাহ্মের উন্নাসিক মানসিকতা, তাদের রুচি ও সংস্কারের কৃত্রিমতার প্রতি লেখকের কটাক্ষের পরিচয় রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে যে নিদারুণ অন্তঃসারশূন্যতা বর্তমান, লেখক তা দেখিয়েছেন বিভিন্ন বক্তব্য ও ঘটনার মধ্যদিয়ে। 'এভাবে দেশের কাছ থেকে ব্রাহ্মসমাজ তফাৎ হয়ে গিয়েছে এবং এতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে' বলে উল্লেখ করেছে শ্রীশ। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রয়োজনে বাহ্যিক আড়ম্বর রক্ষা করতে গিয়ে যে বিড়ম্বনা সূচিত হয় পদেপদে, তা দেখানো হয়েছে এ উপন্যাসে। সামাজিক মেলামেশার নামে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও কুৎসা রটনাই যখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, নবপ্রজন্মের উপর তার কি প্রভাব পড়ে এবং এর ফলে তারা যথার্থভাবে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে গড়ে উঠতে আদৌ সমর্থ হয় কিনা— এ প্রশ্ন জেগেছে সুবর্ণের মনে। দীপ্তির সঙ্গে মায়ার কথাবার্তা থেকে জানা যায়— ব্রাহ্ম আদর্শ-অনুযায়ী নারীস্বাধীনতা অর্থে মূলত যে চিন্তাচেতনার পরিবর্তন— তা হয়নি, বরং তা সীমাবদ্ধ থেকেছে মেয়েদের চলাফেরা ও সাজপোশাকের ধরন পরিবর্তনের মধ্যে। ব্রাহ্মবাড়ির নিয়ম-আড়ম্বরের কথা চিন্তা করে অস্বস্তিআক্রান্ত যুবকদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় অনাগ্রহ প্রকাশের মধ্যে গোকুল নাগের ব্যক্তিজীবন ও চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। আবার হিন্দুসমাজের 'সহস্র বছরের তাগাতাবিজ, নিষেধ বিধানের' মধ্যে, নিগ্রহের মধ্যে বসবাস করে জীবন যে সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে— তারও উল্লেখ রয়েছে তাদের বক্তব্যের মধ্যে। এভাবে ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের অচলায়তনে বন্দী জীবন, আত্মার উন্মোচন ও তা বিকশিত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন গোকুল নাগ। ধর্ম সম্পর্কে, বিশেষ করে তার প্রচারের বিরুদ্ধে লেখকের উপলব্ধি ও প্রাগ্রসর দৃষ্টিকোণ-আশ্রিত মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে বিকাশের উক্তিতে—

> ধর্ম প্রচারটা যাঁদের পেশা বা জীবিকা-উপার্জনের উপায় তাঁরা কি আর ধর্মের মাধুর্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন? পৃঃ ৯২

সে বিশ্বাস করে— 'ধর্ম' জিনিসটার ভিত্তি রয়েছে মনুষ্যত্বের উপর।

ধর্ম ও সমাজভাবনা ছাড়াও *পথিক* উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে লেখকের জীবনদৃষ্টি। সংস্কার-সংস্কারমুক্তির প্রশ্নটিও জড়িত আছে তার মধ্যে। এর অধিকাংশ চরিত্রই বিবাহপূর্ব প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ, যেমন— কল্যাণী-মুনি, শান্তা-সুপ্রকাশ, কমলা ও সুধীর। কেউ কেউ আবার ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণাকে আশ্রয় করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যেমন— শ্রীশ, তটিনী এবং বিকাশ। শ্রীশের অমনোযোগজনিত জ্বালায় এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে শ্রীশদের পরিবারে একটির পর একটি সমস্যা তৈরি করে, তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতে চেয়েছে তটিনী। শ্রীশের বোহেমিয়ান স্বভাবের গভীরে নিহিত যে কারণ— তটিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদ— তার কথা জানা যায় কাহিনীর শেষ পর্যায়ে। শুরুতে এ ছিল শুধুই ইঙ্গিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ—

Dhaka University Institutional Repository

> এখন শুধু একটি মানুষ ওর কাছে যেতে পারে দীপ্তি, সে তুইও ন'স, আমিও নই।
> পৃঃ ১৯

বিবাহিতা নারীর পরকীয় প্রেমের প্রসঙ্গ রয়েছে সুপ্রকাশ এবং অজ্ঞাতনাম্নী রমনীর মধ্যে। সমাজপ্রচলিত এবং অভ্যস্ত বিবাহসংস্কারের মূলে নানাভাবে আঘাত হানার প্রয়াস পেয়েছেন গোকুল নাগ। বিয়ের ক্ষেত্রে সংস্কারের পরিবর্তে তরুণ তরুণীর হৃদয়াবেগকেই প্রাধান্য দিয়েছেন লেখক। ব্রাহ্ম কল্যাণী ও হিন্দু মুনির বিয়ের প্রসঙ্গে মুনির জননীর উক্তিতে এর প্রমাণ মেলে—

> দুটো মানুষের জীবনের সুখশান্তির কাছে ও [দুই সমাজের মধ্যেকার] গোলমালটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। পরের গোলমাল থামাতে গিয়ে নিজের 'মাথায় বাড়ি' নিয়ে ঘরে পড়ে থাকতে যদি দেখি আমাদের ছেলেমেয়েকে, সেটা কি এই বয়েসে সহ্য হবে?... মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের দেশের মানুষ গোলমাল থামাবার বিস্তর চেষ্টা করেছে, এবার যদি কেউ কেউ গোলমাল বাধিয়ে দেখতে চায় ব্যাপারটা কি হয়— দেখুননা।
> পৃঃ ২৫৩-৫৪

মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন হওয়া সত্ত্বেও কমলা ও সুধীর বিয়েতে অভিভাবকদের সম্মতি লাভ করেছে। বিকাশের জনক-জননী গতানুগতিক বিবাহবন্ধনকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বন্ধনবিহীন সম্পর্কের ফসলরূপেই বিকাশ পৃথিবীতে এসেছে। দীপ্তির সঙ্গে বিয়েতে সামাজিক অথবা রেজিস্ট্রিকরণ— কোনো রীতিকেই মানতে চায়নি সে-ও। শর্ত বা বিধির চেয়ে সে গুরুত্ব দিয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাসের ব্যাপারটিকে। বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের অন্তরালে অমর্যাদা ও অবিশ্বাস-আশ্রিত গ্লানিকর দিকটি আভাসিত হয়েছে কমলার উক্তিতে। বিয়ের সাক্ষী না রেখেও সম্পর্কটি যেমন অচ্ছেদ্য হতে পারে, তেমনি আইন কিংবা সমাজসমর্থিত বন্ধনের প্রমাণাদি সত্ত্বেও নানাকারণে দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ নেমে আসতে পারে। এ বিচ্ছেদ কখনো বাহ্যিক, কখনো মানসিক, কখনো উভয়ত। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে— মাধুর্য-নির্বাসিত দাম্পত্যের নিগড়ে বন্দী ক্লান্ত, বিক্ষত আত্মার মুক্তির মর্মান্তিক আর্তনাদ-ভাষ্য—

> আমাদের বিয়ে বিয়ে নয়— বিড়ম্বনা। এ বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি চাই আমরা— পৃঃ ২৫৮

অথচ সমাজের মুখ চেয়ে এদেরকে একত্রে বসবাস করতে হয়, সন্তানের জন্ম দিতে হয়। এর চেয়ে বড়ো অনাচার আর কোথায় আছে? এরই প্রকাশ মায়ার উক্তিতে—

> স্বামী বা স্ত্রী বেশ জানে যে, সে প্রতারিত হয়েছে বা প্রতারণা করছে, আর কোনদিনই তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলতে পারবেনা, অথচ তারই অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে, তারই ছেলেমেয়ের— পৃঃ ২৫৮

স্বামীর সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ায় জনৈকা নারী প্রণয়সম্পর্ক গড়ে তুলেছে সুপ্রকাশের সঙ্গে, বিবাহিতা তটিনীর মানসপ্রত্যাবর্তন ঘটেছে পূর্বতন প্রেমিক শ্রীশের কাছে, মিসেস ডি-র পার্টিতে আমন্ত্রিত জনৈক 'বিপুলকায়' তার ক্ষীণদেহ বন্ধুর কাছে নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে মন্তব্য করছে—

> Yes, a she-devil. পৃঃ ২০২

অথচ এসব দাম্পত্যসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সামাজিক শর্ত ও নিয়মকে রক্ষা করেই। আবার, স্বেচ্ছাচারী ও নির্যাতক স্বামীর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসার চিন্তা করতে পারেনা অসিতের বোন রাধা। পারেনা, 'অন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

স্থবির শাশুড়ি, দেবতার মত ভাসুর, বালিকা বিধবা একটি ননদ, আর... দুঃখসাগর মন্থন করা দুটি ছেলেমেয়ে'র নিভৃত আকর্ষণের জন্যে। সুস্থ দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রয়োজনে স্বামিত্বের চেয়ে বন্ধুসুলভ মানসিকতা ও আচরণের গুরুত্ব যে অধিক— তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে অসিত। লেখকের নব দৃষ্টিকোণআশ্রয়ী বক্তব্য আভাসিত হয়েছে বিকাশের জনকজননী ও মামামামীর মিলনের বর্ণনার মধ্যে। বিবাহহীন সম্পর্ক ও একত্র বসবাসের কথা রয়েছে শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসেও। স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতা ও লাঞ্ছিতা অভয়া রোহিনীর সঙ্গে বসবাস করতে গেছে বিয়ে ছাড়াই। বিয়ে যে আসলে দুটি মিলনোন্মুখ আত্মার বন্ধন, আইন বা সামাজিকতার কোনো বাধ্যবাধকতা এখানে অবান্তর—লেখকের এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে *পথিকের* বিভিন্ন চরিত্রের বক্তব্য ও আচরণের মধ্য দিয়ে। সুপ্রকাশের বক্তব্যে দান্তে -বিয়াত্রিচের প্রসঙ্গ এসেছে— তাঁরা বিবাহবন্ধনের মধ্যে না থেকেও গভীর ভালোবাসার মধ্যে বসবাস করেছিলেন এবং সন্তানের জনকজননী হয়েছিলেন।

প্রেমের সূত্রে আসে দেহবাদের প্রসঙ্গ। *কল্লোলের* এ বিষয়টি নিয়ে সমালোচকগণ নানারকম মন্তব্য করেছেন। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবজাত তরুণ লেখকেরা দেশীয় জলবায়ু ও সামাজিক পরিবেশের কথা মনে রাখেননি এবং এ ক্ষেত্রে প্রায়ই আতিশয্য প্রদর্শন করেছেন— এমনকথা বলেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়সহ[১০] অধিকাংশ সমালোচক। কিন্তু একথাও সত্য যে, মহাযুদ্ধোত্তর নানামাত্রিক অস্থিরতার মধ্যে নিহিত ছিল দেহবাদের মূল উৎস, বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব একে আনুকূল্য দান করেছে মাত্র। *পথিক* উপন্যাসে এই শরীরী আবেদন সরাসরি নেই বললেই চলে। সুপ্রকাশের সঙ্গে তার পূর্বতন প্রেমিকার দেহমিলনের বর্ণনার পরিবর্তে তার ইঙ্গিত রয়েছে। বিবাহরাতে ভীত-অবসন্ন দীপ্তিকে তার বিবাহিতা বন্ধুরা ঠাট্টা তামাশা করেছে এই বলে— 'এখন ভাবছিস জুজু, তেরাত্রি এক বিছানায় শুলে অন্য কথা বলবি'— (পৃঃ ৩৪১)। কিন্তু বিয়ের পরে কোথাও তার বাস্তব প্রতিফলনের চিত্রায়ণ নেই। নারীত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়া মুকুলের কাছে নিজের মুখ তুলে ধরে কিছু প্রার্থনা করলে মুকুল তাকে 'উপেক্ষা' উপহার দিয়ে বিদায় নেয়, বিয়ের অধিকার অর্জন করেও দীপ্তির দেহের পরিবর্তে মন জয় করতে আগ্রহী হয় অসিত। অন্যচরিত্ররাও প্রেমের অতি সংক্ষিপ্ত সুখনিবিড়তার পাশাপাশি সংযমকে রক্ষা করেছে। বলা যায় দেহকামনার আতিশয্যের পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত বাস্তবতাকে আশ্রয় করেছে তারা। প্রেমে দেহমিলন-বিষয়ে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আশ্রয় করেও শরীরের শুচিতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন *পথিকের* রচয়িতা। এ সম্পর্কে লেখকের মানসিকতার পরিচয় রয়েছে এখানে—

> প্রাণকে যাহারা পরম শ্রদ্ধা দান করিয়াছে, প্রেমকে যাহারা সর্বস্ব বলিয়া অনুভব করিয়াছে, শরীর তাহাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। কিছুতেই তাহারা ইহাকে কলুষিত হইতে বা দেখিতে পারেনা। প্রেমহীন, প্রাণহীন শরীরের প্রতি ইহাদের কোন মোহও থাকেনা। পৃঃ ৪২৬

অবশ্য, সংযমে আস্থাশীল হলেও *পথিকের* রচয়িতা শরীর সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত নন, তারও প্রমাণ রয়েছে উপন্যাসে। যেমন—

> কিন্তু এই দেহের মধ্যেই যে প্রেমের বাসা; শুক্তির বুকে মুক্তার মত প্রেম যে এই রক্ত-মাংস-পিণ্ডের মধ্যেই লুকাইয়া থাকে; প্রেমিক মানুষ ইহা জানে, ... পৃঃ ৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাসী-ভারতবর্ষের গোকুল নাগ *কল্লোলে* আত্মপ্রকাশ করেন স্বতন্ত্ররূপে। মানব মানবীর স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের বহুবিচিত্র অবস্থাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তব জীবনোপলব্ধির আলোকে। যুগধর্মসঙ্গত রোমান্টিকতা আশ্রয় করেও কল্পনাচারিতাকে গোকুল নাগ প্রশ্রয় দেননি *পথিক* উপন্যাসে। তাঁর সমাজবিদ্রোহের সুর স্পষ্টতা লাভ করেছে, কিন্তু সমাজবন্ধনকে অতিক্রম করতে পারেনি এখানকার সমাজনিষিদ্ধ প্রেমে জড়িত বিবাহিতা নারীটি। সুপ্রকাশের আবেগ-অধৈর্য-আহ্বান সত্ত্বেও সমাজ-সংসারের বাঁধন কাটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং অসহায়-উচ্চারণ নিঃসৃত হয়েছে তার কণ্ঠেঃ

> তাও কি হয়? আমি যে চারদিক দিয়ে বাঁধা,ও ছেঁড়বার আমার শক্তি নেই। পৃঃ ২৩৫

গোকুল নাগের *মায়া-মুকুল* (১৯২৭) গল্পগ্রন্থভুক্ত 'বসন্তবেদনা' গল্পের বিধবা সুরভীও তাই। তার বুভুক্ষিত অন্তরকামনা এবং সুতীব্র দেহবাসনার যন্ত্রণাকে গভীর মমতা ও সহানুভূতির আঁচড়ে অঙ্কিত করলেও সমাজবাস্তবতার দাবিকে তিনি লঙ্ঘন করেননি। এ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই সমাজপরিবর্তনের স্বপ্নকল্পনায় উজ্জীবিত হয়েছেন তিনি। *পথিকের* বিভিন্ন স্থানে রয়েছে তার সাক্ষ্য। সমাজবন্ধন অপসারণ— বিশেষত নারীর পক্ষে— খুব সহজ ব্যাপার বলে গোকুল নাগ ভাবেননি। তা জানা যায় সুপ্রকাশের কাছে শান্তার উক্তিতে—

> পুরুষের কাছে সমাজ থাকলেও যা, না থাকলেও তাই, ওতে তাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র আশ্রয়। পৃঃ ১১৭

মায়ার বেনামে উচ্চারিত হয়েছে সমাজসত্য বিষয়ে লেখকের উপলব্ধির পরিচয়—

> ওগো ঠাকরুণ, সমাজটা চিরদিনই হৃদয়হীন। আর সব সমাজই একরকম— 'আমাদের' ও 'ওদের' বলে বিশেষ পার্থক্য নেই পৃঃ ২৫

লেখক সমাজগণ্ডী থেকে বাইরে এনেছেন কোনো কোনো চরিত্রকে। বাস্তবতাকে অস্বীকার না করেও তিনি দেখেছেন এক উদার শোধিত সমাজরূপের স্বপ্ন। জবরদস্তিময় সনাতন নিয়মের প্রতিবাদ করেছে মায়া।

> ভাল হওয়ার যে সমস্ত নিয়মকানুন চোখের সামনে লটকে রেখেছেন আমাদের গুরুজনেরা, তা হচ্ছে শ্লেভ-মেন্টালিটির বীজ। পৃঃ ১৩

লাহোর থেকে এসে বাঙালি তরুণীদের আচরণ ও মানসিকতায় অকালবার্ধক্যের লক্ষণ আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছে সে। প্রতি মুহূর্তে চারিত্রিক স্খলনের ভয়ে তারা যেন সন্ত্রস্ত। কাহিনীতে তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের কথা এসেছে। এ থেকেই নিজস্ব স্বভাব, সামাজিক বিধি ও সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করার স্বপ্ন-কল্পনা আভাসিত হয়ে উঠেছে নানাভাবে। লোভী অসিত ও ছিদ্রান্বেষী সুবর্ণ তাঁদের স্বভাব পরিবর্তন করে ফিরে এসেছেন স্বাভাবিক মানুষদের সারিতে, অনিষ্টকারী অমল অপদস্থ হয়েছে, অবৈধ গর্ভধারণ সত্ত্বেও সুধা সমাজের নির্যাতন থেকে অব্যাহতির পথ পেয়েছে প্রাগ্রসর ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী জীবনকে আশ্রয় করে। জীবনের ভাষ্যে এ নির্যাতনের স্বরূপকে বর্ণনা করেছেন লেখক এইভাবে—

> সভ্য জগতে শুধু মা'র পরিচয়ে তার সন্তান বাঁচতে পারেনা। মা'র পরিচয়ের কোন মূল্যও নেই। দু'একটা দেশ ছাড়া। কিন্তু তুমি তাদের কেউ নও সুধা। ...তোমার ভুলের জন্য তোমাকে দুবে মানুষ মন হাল্কা করবে, ...তোমার সন্তানকে করবে পরিত্যাগ।—

Dhaka University Institutional Repository

> নিরপরাধী অকলঙ্ক জীবনটির জীবন্তসমাধির ব্যবস্থা করে দেবে তুমিই। তুমি একা তাকে বাঁচাতে পারনা সুধা, কিন্তু আমি পারি, খুব সহজে পারি। পৃঃ ৪৪৮

অশিষ্ট অতীতের কাহিনী জেনেও সুপ্রকাশকে গ্রহণ করে তার বিবেকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে শান্তা। উপন্যাসের শেষের দিকে নেতিবাচক ভূমিকা পরিত্যাগ করে প্রেমসৌন্দর্য ও স্মৃতিসৌরভে প্রসাধিত হয়ে নবমাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে তটিনী। লেখক এভাবেই নষ্ট সমাজস্তর থেকে মানুষকে আহ্বান করেছেন উদারতার অন্তহীন সৌন্দর্যলোকে। সমাজ-শৃঙ্খলকে অতিক্রম করার স্বপ্ন রচনা করেছেন গোকুল নাগ, কিন্তু সামাজিক সংস্কারের শক্তি ও সমাজবাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি তিনি। তাই কোথাও কোথাও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় আক্রান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কোনো চরিত্র। বিবাহিতা সেই নারীটির সঙ্গে সুপ্রকাশের মিলন হয়নি, বিকাশও দীপ্তিকে পায়নি।

বিষয় ও বক্তব্যবিচারে শরৎচন্দ্রের *শেষপ্রশ্নের* সঙ্গে *পথিক* উপন্যাসের কিছু কিছু সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। *পথিকে* আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পর্কের বাইরে থেকে একত্র জীবনযাপন করেছেন বিকাশের জনকজননী। *শেষপ্রশ্নে* অজিতের সঙ্গে এভাবে বসবাস করতে রওনা হয়েছে কমল। উভয় উপন্যাসেই ক্লাভ আর ক্যামিন রিলিফের উল্লেখ রয়েছে। *পথিকে* এসব সংস্থায় মুক্ত হাতে সাহায্য করেন বীরেন্দ্রনাথ, *শেষপ্রশ্নে* এর জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে রাজেন। মাড়বারের এক অজ্ঞাত পল্লীতে মহামারী আকারে প্লেগ শুরু হবার কথা জানা যায় *পথিকে*, আর *শেষপ্রশ্নে* মুচিপাড়ায় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। তটিনীর অভিলাষ-অনুযায়ী তার অনাথ আশ্রমের শিশুদের দায়িত্ব নিয়েছে শ্রীশ। তার মতে— এদের মতো একলাখ ছেলে যদি এদেশে জন্মায়, তাহলে দেশ আবার বেঁচে উঠবে। *শেষপ্রশ্নে* হরেনের আশ্রমের ছাত্ররাও দেশ উদ্ধারের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে— এমন স্বপ্নকল্পনা রয়েছে। বিয়ে-রেজিস্ট্রেশনের অসম্মানজনক দিকটির উল্লেখ পাওয়া যায় কমলার উক্তিতে— 'যদি সে আমার বিশ্বাস নিয়ে খেলা করে, আইনের প্যাঁচে ফেলে তার কাছ থেকে আমার বা আমার ছেলেমেয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারব এইত? কিন্তু কথাটা ভাবতেই লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করে'। (পৃঃ ৩২৬) শৈবমতের বিয়েতে কোনো প্রমাণ থাকেনা— একথার উত্তরে *শেষপ্রশ্নে* কমল বলে- 'হা অদৃষ্ট! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবেনা নাকি?... আর যে অনুষ্ঠানটিকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওকে রাখব বেঁধে'? *শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ*, নবম সম্ভার পৃঃ ৪৩

সমকালসূত্রে পরাধীন দেশে রাজনীতির প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক। *পথিক* রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, নরনারীর বিরহমিলনই এর প্রধানকথা। তবু কাহিনীর ফাঁকে, বিশেষ করে প্রথমদিকে— অসহযোগ আন্দোলন, পিকেটিং, বিলেতিবর্জন, চরকানীতি, খদ্দর ধারণ, কৃচ্ছ্রসাধন, পুলিশী অত্যাচার এবং ইংরেজ শাসনামলে আদালতের বিচার-প্রহসন প্রভৃতি রাজনীতি-সম্পর্কিত বিষয়ের সন্ধান মেলে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে রাজনৈতিক পটভূমি-আশ্রিত বক্তব্য, নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে অভিযোগ, রাজনৈতিক পরিচয়। তাদের আদর্শ-আদর্শহীনতা বিষয়ে সাধারণ মানুষের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে লেখকের উপলব্ধিজাত মনোভাবের ইঙ্গিত। শ্রীশ ও মুকুলের রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের মধ্যদিয়ে জানা যায়— বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে আদর্শের যোগ এত অল্প, আর এত দ্রুত-পরিবর্তনশীল যে, সাধারণ কর্মীদের অর্থহীন কষ্টস্বীকার করাই সার হয় এতে এবং এজন্যে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের অনুশোচনা জাগে। ভাবেঃ

Dhaka University Institutional Repository

What a blinking idiot I was. পৃঃ ৬৬

রাজনৈতিক আদর্শের নামে কর্মীদের অযৌক্তিক চিন্তা ও কর্মের সমালোচনা উচ্চারিত হয়েছে উপন্যাসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় আহারে বিহারে কৃচ্ছ্রসাধন প্রসঙ্গে করুণার উক্তিঃ

> তুই ভাবিস খুব খানিকটা উপবাস আর স্বার্থত্যাগ করতে পারলেই বুঝি দেশের কাজ করা হল। আমি ভাবি, এতে শুধু নিজের শরীর ও শক্তিকে পঙ্গু করা হয়, ... তোর একটা চাকরী ছাড়াতে কিম্বা উপবাস করার উপর দেশের সমস্ত ভাল নির্ভর করে নেই ... পৃঃ ৯

মত ও আদর্শকে প্রকাশ করতে গিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের কাজ ও আচরণ কখনো কখনো হয়ে পড়ে জবরদস্তিমূলক, যার সবটুকুই যথার্থ কিংবা সুস্থ নয়। করুণা ও শ্রীশের কথোপকথনের মধ্যে থেকে মেলে তারও পরিচয়। এরই সমর্থনে শ্রীশের উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের মতঃ

> তুমি এমন সংশয়ের মধ্যে এনে আমায় ফেলে দাও মা, যেখান থেকে আমার যুক্তিগুলোকে ঠিক দেখতে পাইনা—শক্তিকেও না। পৃঃ ১০

রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাসজনিত শ্রদ্ধাহীন বিদ্রূপের প্রমাণ মেলে তটিনীর বাড়িতে শ্রীশের প্রতি জনৈক ভদ্রলোকের উক্তিতে ঃ

> Propaganda works নাকি শ্রীশবাবু? আজকাল দেখা যায়, একজন মেয়েকে সামনে রাখলে আপনাদের কাজের ঢের সুবিধা হয়– পৃঃ ৪৩৭

রাস্তার মধ্যে মানুষের বিলেতি কাপড় কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে মার খাওয়া, জেলে যাওয়া সম্পর্কে সুবর্ণের বিরূপ উক্তি তখনকার প্রচলিত মনোভাবেরই দ্যোতক। কিন্তু লেখকের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা মোটেই বখাটে কিংবা ডাকাত নয়, বরং যথেষ্ট যোগ্য। রাজনৈতিক কর্মীদের বিচারপ্রহসনের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। সবল, সুগঠিত শরীরের অধিকারী বলে সুধীরের বিচার হচ্ছে—খুনী, গুণ্ডা ও ডাকাতের সমতুল্য বিবেচনা করে। অথচ ওর মতো রাজবন্দীদের কেউ কেউ কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন-করা ছাত্র। সেখানে পড়ার সময়ে এরা যুযুৎসু শিক্ষা নেয়, শৈশবে বাড়ির দরওয়ানের কাছে খেলাচ্ছলে লাঠিখেলা আর কলকাতার কলেজে এম.এসসি ক্লাশে পড়ার সময়ে বোমা তৈরি করতে শেখে পড়াশোনারই সূত্রে। তবু একে অপরাধরূপে গণ্য করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় চোর-ডাকাতের মতো সামাজিক অপরাধীদের পর্যায়ভুক্ত করে। এদের বিচার-প্রহসন নিয়ে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের পরিচয় আভাসিত হয়েছে– যার কোনো অপরাধই নেই, তাকে 'দয়া করে' লঘু শাস্তি 'ছয়মাস সশ্রম কারাবাস' দেওয়ার উল্লেখে। কাহিনীর ফাঁকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে– কোনো চরিত্রের স্মৃতিচারণ-সূত্রে। যেমন– কল্যাণীর পিতা প্রবোধবাবুর সঙ্গে মুনির পরিচয়পর্বের কথাবার্তায় জানা যায়– এর পূর্বে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল আদালতে, উকিল নিয়ে এই স্বদেশীদের পক্ষে লড়তে গিয়েছিলেন প্রবোধ বাবু। কমলাকে সান্ত্বনা দেবার সময়ে উমার কথায় রাজবন্দীদের Hard labour-এর কথা জানা যায়। এছাড়াও রয়েছে– পুলিশ কর্তৃক জীবনের মাথা ফাটানোর ইঙ্গিত, মুনি কর্তৃক ঘুষি মেরে সিপাহীর নাকের ডগা চেপ্টা করে দেওয়ার উল্লেখ,

Dhaka University Institutional Repository

খদ্দর দিয়ে তটিনীর পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি ও ঘর সাজানোর কথা, তার অনাথ আশ্রমে গড়ে ওঠা– একলাখ আত্মত্যাগী ছেলের স্বপ্ন দেখা– এ সবই রাজনৈতিক বিষয়বাহিত ঘটনা।

সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত বক্তব্য থাকলেও লেখক তাকে তত্ত্বভারাক্রান্ত করেননি, বরং ফাঁকে ফাঁকে নির্মল হাস্যরসের জোগান দিয়ে তাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। শ্রীশের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে যুবকদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সূচিত হয়েছিল– ব্রাহ্মবাড়িতে কড়া নিয়ম কানুনের সামনে তাদের সাজসজ্জা, আচরণ, কথাবার্তা ও আহার-বিহারের ত্রুটি ধরা পড়ায় আশঙ্কায়– তা প্রকাশের ধরনে হাস্যরসের সন্ধান মেলেঃ

> দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মুনি হাঁকিল–ঠাকুর, জীবন বাবুর ভাত বাড়ো।
> ঘরের ভিতর হইতে জীবন বলিল– হঠাৎ জীবনবাবুর ওপর এতটা অনুগ্রহের কারণ?
> মুনি।– অনুগ্রহ নয়, পরোপকার– আমি আজই তোমার ঐ সাড়ে-সাত সেরি bag-টার খবর ওঁদের দিতে চাই না। তাছাড়া ভাল জিনিস পেলে ওটা সাড়ে-আট বা নয়সেরি হতেও পারে, তার খবরটা আমার জানা আছে কিনা? তাই কিছু শাক-ভাঁটা দিয়ে 'hold'-টা ভরাট করে দেবার জন্যে কাল রাতেই ঠাকুরকে ফরমাশ করেছিলাম। পৃঃ ৭০

উমা এবং কমলার পাহারায় শ্রীশের 'এক বগ্‌গা ঘোড়ার মত ঘাড় কাত' করে খেয়ে চলায়, সস্তায় কিছু কেনার জন্যে নগেন্দ্রনাথের বিপুল পরিমাণ গাড়ি ভাড়া দেবার উল্লেখে লেখকের হাস্যরস সৃজনের পরিচয় রয়েছে। জীবন-ধারণের জন্যে 'চ' বর্ণ-যুক্ত তাঁর দুটি 'উচ্চাঙ্গের খাওয়া'র ইঙ্গিতও চমৎকার। কুৎসা রটনাকারীদের নেত্রী মিসেস ডি-র চেহারা ও আচরণের বর্ণনায়, মৃতবৎসা জননীর সন্তান 'এক ছাঁচে ঢালাই করা দুটি লোহার পুতুল' শুধু 'কৃতান্ত কিঙ্কর ও করালী কিঙ্কর' এই নামমাহাত্ম্যে বেঁচে যাওয়ার উল্লেখে, পরবর্তীকালে বিয়ের মাত্র ছয়মাসের মধ্যে কৃতান্তের সন্তান লাভের ঘটনায় এবং যুবকদের চাঞ্চল্য ও উক্তিতে রয়েছে হাস্যরসের পরিচয়ঃ

> Biologically এটা আমি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি–
> আর একজন বলিল–আরে রেখে দাও তোমার 'বাইয়োলজি', ও সব মানুষের বেলায় খাটে। যমদূত ন-মাস ছ-মাসের ধার ধারেনা– এসে পৌঁছালেই আমাদের মেনে নিতে হবে ঠিক সময়ে এসেছে। পৃঃ ১৯৪

এদের সন্তানসংখ্যা নির্ধারণে–

> তাঁহার পুত্রকন্যা যে ঠিক কয়টি তাহা বলা একটু শক্ত হইলেও আমাদের গরীবানা মতে হিসাব করিলে দেখি, তাঁহাদের কন্যাগুলিকে একটি সেকেন্ড ক্লাশ বদ্ধ গাড়ীতে ভর্তি করিলে পুত্রগুলিকে ছাদে বসিতে হয়। পৃঃ ১৮৯

'এ্যাটহোম'-এ নিমন্ত্রণ পাবার পর জননী ও তার কন্যার পোশাক-নির্বাচনে সূচিত দুর্গতিতে, খাবার টেবিলের নিচে মুনি ও কল্যাণীর পরস্পরের সঙ্গে পা ঠেকানোর খেলা হঠাৎ নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘটে গেলে–

> ওটা আমার মুনিবাবু, কল্যাণীরটা আর একটু বাঁ দিকে– পৃঃ ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

বলে নির্বিকার ভাবে খেয়ে চলায়, কল্যাণীর বিমাতাকে মুনির জনকজননী পাত্রী বলে ভুল করায়, বিভিন্ন দেশের বিবাহ-পদ্ধতির উল্লেখে–

> এই ধরুন না, দ্রাবিড়ি ভদ্রলোকেরা ভাগ্নিকে পেলে আর কাকেও বিয়ে করতে চায়না, ... মেয়েটির অন্য কাকেও বিয়ে করবার ইচ্ছে হলে মামাকে জিজ্ঞেস করে– মামা, আমি কি 'অমুক'কে বিয়ে করতে পারি? পৃঃ ২৮৬

দীপ্তির বিয়ের রাতে নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগাতে চেয়ে মুনি ও কল্যাণীর ধরা পড়ে যাওয়া ও জীবনের উপর মুনির হাড়ে হাড়ে চটে থাকার এবং জীবনের কোড়ন কাটায়ঃ

> রুচিকেও বলিহারি বাবা! তরকারী দই ক্ষিরে মাখামাখা শরীর নিয়ে– পৃঃ ৩৪৫

সংসার সন্তান নিয়ে কল্যাণীর লেখালেখি শিকেয় ওঠার প্রসঙ্গে তার উক্তিঃ

> আর বলিসনি ভাই, হাড়-মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল! দিনে ছেলে, রাতে ছেলের বাপ! পৃঃ ৪৬৩

সবমিলিয়ে অপূর্ব রসমণ্ডিত করে উপস্থাপনের শিল্পকৌশল পাঠককে মুগ্ধ করে। এছাড়াও রয়েছে লেখকের বাস্তব দৃষ্টিপ্রসূত সমাজ ও মানুষের বিচিত্র অসঙ্গতির চিত্র। কলকাতার লক্‌ঝড় মার্কা গাড়ির বর্ণনা, তথাকথিত সাহিত্যিকের আত্মভোলা ভাবভঙ্গি প্রদর্শন, গঙ্গার বিস্তীর্ণ জলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীপুরুষের একত্রে স্নান করার সময়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীর আচরণ।

কাহিনীবিন্যাসের দিক দিয়ে এই উপন্যাসের তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। শ্রীশের বন্ধুদের নিমন্ত্রণের ঘটনা থেকেই মূলত কাহিনীর শুরু। প্রথমপর্যায়ে তরুণ তরুণীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মিসেস ডি-র এ্যাট হোম-এ নিমন্ত্রণ থেকে শুরু হয়েছে এর দ্বিতীয় পর্যায়। বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে এসে যুক্ত হয়েছে নানান জটিলতা। তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ দীপ্তির বিয়ের সময় থেকে চরিত্র বা ঘটনার হয়েছে পুনর্বিশ্লেষণ। শ্রীশ-তটিনীর প্রেমকাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে এর পরই। শিথিলবদ্ধ প্লটের এ উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে মিত্র পরিবার থেকে, শাখা পল্লবে বিস্তৃত হয়ে তা আবার সেখানেই সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর ধারাবাহিকতার অভাব এবং কেন্দ্রচ্যুতি এর উপন্যাসধর্মকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র-নির্ধারণে পাঠকের সমস্যা সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। প্রথমথেকে যে মায়ার প্রাধান্য বিরাজমান, দীপ্তির বিয়ের পর থেকে সেই মায়াকেন্দ্রিকতার পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীশের সূক্ষ্ম প্রাধান্য স্পষ্ট হতে থাকে এর পর থেকে। পূর্বাপর ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করে কিছু কিছু চরিত্র হঠাৎ করেই বদলে গেছে। যেমন– সুবর্ণ ও অসিত। এদের মজ্জাগত স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হঠাৎ কিভাবে হলো তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেননি লেখক। যে মায়া প্রথম থেকেই কারো সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে জড়াতে চায়নি– সে হঠাৎ করে উপযাচিকা হয়ে মুকুল দেবের প্রেমপ্রার্থী, শুধু প্রেম নয় তার চুম্বন-অভিলাষী হয়ে ওঠার মধ্যেও চরিত্রটির সঙ্গতি নষ্ট হয়েছে। সুপ্রকাশের প্রেমিকা বিবাহিতা নারীটি সংস্কার কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি তার কাছে, এই মাত্র কারণ ছাড়া তাদের মধ্যেকার আর কোনো বিরোধের কথা জানা যায় না। অথচ সুপ্রকাশের বিতৃষ্ণা প্রকাশের ধরনে এ বিরোধ মাত্রাতিরিক্ত এবং অনেক গভীর বলে মনে হয়। আবার শান্তার বিবেচনায় 'সে সত্যি বড়'। এসব বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে,

Dhaka University Institutional Repository

গোকুলচন্দ্রের মুখ্য রচনা 'পথিক' ... উপন্যাসটিতে লেখকের দৃষ্টিতে যেন জীবনপথের চলচ্চিত্র ধরা পড়িয়াছে। সাধারণ উপন্যাসের সংহতি নাই, কিন্তু ভূমিকাগুলির উজ্জ্বলতায় এবং সংসারচিত্রের বাস্তবতায় কাহিনীর সে ত্রুটি ধরাই পড়েনা। 'পথিক' "আধুনিক" উপন্যাসের পথ দেখাইয়াছে[১১]।

বর্ণনায় সাধুরীতি এবং সংলাপে চলিত ভাষারীতি আশ্রয় করা হয়েছে *পথিকে*। চারশ' চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে কম করেও পাঁচশ' আটত্রিশটি ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের সন্ধান মেলে। এছাড়াও রয়েছে ইংরেজি রচনা থেকে উদ্ধৃতি। বর্ণনার ভাষা সহজ সরল হলেও কখনো কখনো বাক্যকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে জটিল বিন্যাসে–

ক. পাতলা ঠোঁটের আড়ালে মুক্তার মত দাঁতগুলি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে, শারীরিক নিয়ম পালন ছাড়া তাহারা ভুলিয়াও এমন কিছু করিয়া বসেনা যাহাতে সাধারণ মানুষের মন খুশী হইয়া উঠে। পৃঃ ৭

খ. কথাটি শেষ না হইতেই তাহার গালে যাহা আসিয়া আঘাত দিল তাহা বহুক্ষণ ধরিয়া কিশমিশের অরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও একেবারেই মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হয় নাই! পৃঃ ২১১

ভাষা কাব্যময় না হলেও নিরলঙ্কৃত নয়, এর পরিচয় রয়েছে গোকুল নাগের ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও আরো বিভিন্ন শিল্পকৌশল প্রয়োগের মধ্যে। যেমন–

উপমাঃ

ক. অনাগত স্রোতটির মধ্যে কোন বাধা আসিলেই যেমন জলরাশি উছলিয়া উঠে, মায়ারও সেইরূপ হইল। পৃঃ ১৬

খ. যে জমিটা একটু বেশী নীচু সেইখানেই সমস্ত জল আসিয়া জমা হয়। সুপ্রকাশের ঘরখানিরও ঐ রকমের একটি গুণ ছিল– বাইরের মানুষকে টানিয়া আনিয়া ভিতরে জড়ো করে। পৃঃ ৪০

গ. জলপড়ার শব্দ ঘুমপাড়ানী গানের মত ধীরে অতি ধীরে তাহার কানে মিলাইয়া গেল, সে-ও ঘুমাইয়া পড়িল। পৃঃ ৫৭

ঘ. ঝাল চাট্‌নি দেখিলে যেমন একটা লোভের চাহনি স্বভাবতই মেয়েদের চোখে ফুটিয়া উঠে, ঠিক সেইভাবে কল্যাণী মুনিকে এতক্ষণ দেখিতেছিল। পৃঃ ১১২

ঙ. নিবিড় নীল মেঘের চূড়ায় চূড়ায় রূপার পাতের মত চাঁদের আলো লাগিয়াছে। পৃঃ ১৪২

চ. দুই জনের হাতে দুইটি রুমাল, মরণাহত পাখীর মত বাতাসে ডানা ঝাপটিয়া মরিতেছে। পৃঃ ৪৫৬

উৎপ্রেক্ষা ঃ

ক. আকাশের তারাগুলি যেন কে ঘষিয়া মুছিয়া দিয়াছে! চারিধার নিস্তব্ধ! পৃথিবী যেন কিসের আশঙ্কায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছে! পৃঃ ৫৬-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াকলাপ আভাসিত হয়েছে এখানে। চরিত্রের মানসক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াজনিত মনোবিজ্ঞানের নানান তত্ত্ব পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। শ্রীশ নিজেকে পীড়ন করে যে আনন্দ– মর্ষকাম– তা পেতে চেয়েছে। তটিনী চেয়েছে অন্যকে কষ্ট দিয়ে প্রতিশোধ চরিতার্থতার আনন্দ– ধর্ষকাম। দীপ্তি তার দোদুল্যচিত্ততার জন্যে ভেতরে ভেতরে অস্থির ও ক্ষতবিক্ষত থেকেছে, নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে পরমুহূর্তেই তা থেকে সরে যেতে চেয়েছে– তার এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে বলা যায় অস্থিতচিত্ততা। পরিবেশের পরিবর্তন করে মানুষের স্বভাবে পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব– মনস্তত্ত্বের এ সত্য প্রতিফলিত হয়েছে সুবর্ণের মধ্যে। তাঁর অন্যের ছিদ্রান্বেষণপ্রবণ স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে প্রাগ্রসর রুচি ও চিন্তার অধিকারী তরুণদের সান্নিধ্যে এসে–

> আজিকার ঘটনা লইয়া জীবনে এই প্রথম দুটি বাহিরের মানুষের সহিত সুবর্ণের চিরবিদ্রোহী মন সন্ধিসূত্রে বাঁধা পড়িল। শুধু তাহাই নয়, এই দুঃসাহসী যুবক দুটির সহিত কথা কহিবার পর হইতে তাঁহার মনের মধ্যে অনেক বিষয়েরই পরিবর্তন হইতে শুরু হইয়াছিল। পৃঃ ১৩৭

এরপর থেকে তিনি সুপ্রকাশের মায়ের মতো, মুনির বড় মাসী, শ্রীশেরও তাই, বিকাশের সোনামাসী। শৈশব থেকে নিষ্ঠুরতা লাভ করে করে মনস্তাত্ত্বিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় একজন মানুষ ভবিষ্যতে অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হতে পারে। কিন্তু ভালোবাসা ও মায়ামমতা দিয়ে একে সারিয়ে তোলা সম্ভব। অসিত চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক তা দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের কোথাও কোথাও শিল্পরূপ লাভ করেছে লেখকের জীবনোপলব্ধি–

> ক. শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ যে শুচিতার জন্য এত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে তাহাদের কপালে শুধু যেমন অশুচি এবং অপবিত্র স্তূপ বহন করাই লেখা থাকে, সুবর্ণেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। পৃঃ৭
>
> খ. যে নিয়মের তরঙ্গ-আঘাতে, সংসার-সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদ জাগিয়া উঠে, সেই তরঙ্গের আঘাতেই তাহা মিলাইয়া যায়। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে এ বুদ্বুদের সৃষ্টি হইতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মিলায়না শুধু তাহার হাসি-কান্না অভাব-অভিযোগের সুর। তাহার বিরাম নাই। সে সুর যেন আপনার নিয়মে আপনি বাঁধা। অসীম তাহার উচ্ছ্বাস, ভীষণ তীব্র তাহার বেদনা। পৃঃ ৪৫৬

যে তরুণসমাজ কাললগ্ন এক নতুন দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করেছিল, প্রতিবাদী হয়েছিল সমাজপ্রচলিত চিন্তা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে; *পথিকে* রয়েছে তারই প্রতিফলন। এর মর্মনিহিত সুর একান্ত কঠিন স্পর্ধিত প্রতিবাদের না হলেও সমকালীন প্রত্যয় ও প্রবণতার প্রভাব-চিহ্নিত। *পথিক* উপন্যাসে লেখকের জীবনচেতনা ব্যাপকতর পটভূমিতে, একদল তরুণ তরুণীর স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আশা-নিরাশা, প্রেমবাসনার ব্যর্থতা-চরিতার্থতার বিচিত্র আবেদনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। মানুষের জীবনের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়– এমনসব প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তা ও কথায় প্রকাশ পেয়েছে। সে সুরে কিংবা বিদ্রোহে উচ্চকণ্ঠ-ঘোষণা নেই, রয়েছে লেখকের বন্ধনহীন নতুন জীবনের রোমান্টিক স্বপ্নময়তার লক্ষণ। জীবনের অর্থকে তিনি উপলব্ধি করেছেন সংকীর্ণতাহীন, হাসিকান্না ও বাসনাপ্রেমে উজ্জ্বল এক ব্যাপক বিস্তীর্ণতার মধ্যে। 'সমাজের সংকীর্ণতার প্রতি কিছু কটাক্ষ-বিদ্রূপ এর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে থাকলেও, মুখ্যত যৌবনের আবেগ, আনন্দ, আশা ও স্বপ্নের ছবিই এখানে বাস্তব প্রতিবেশে ফুটেছে।'[১২] *কল্লোল* প্রকাশিত হবার পূর্বেই *পথিক* রচিত হয়েছিল। তবু গোকুল নাগের মানস-প্রবণতা-আশ্রিত কল্লোলের যে স্বভাবলক্ষণ তা-ই রূপায়িত উপন্যাসের সর্বত্র জুড়ে। *কল্লোল*গোষ্ঠী বলতে তাঁদেরই বোঝায়, যারা ভাঙনধর্মী এক উদ্দাম যৌবনচেতনার আশ্রয়ী। রোমান্টিকতাপ্রসূত বোহেমিয়ান মানসধর্ম ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। *পথিক* উপন্যাসে এসবের অধিকাংশেরই সন্ধান মেলে। এক ধরনের দুঃখবিলাস ও বিষাদময়তার সুর এ যুগাশ্রিত পত্রিকা কল্লোলের সর্বত্র অনুরণিত। *পথিকে* তার সন্ধান দুর্লক্ষ্য নয়। অবশ্য সমাজের অন্ত্যজস্তরের মানুষ, প্রেমে দেহবাদ কিংবা যৌনমনস্তত্ত্বের বিষয়– যা কিনা কল্লোলভাবনার সঙ্গে যুক্ত– তা এখানে প্রাধান্য পায়নি। তবে প্রেমে দেহমিলন সম্পর্কে লেখকের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। রোমান্টিক ভাববিলাস ও স্বপ্নচারিতার কথা, বন্ধনবিমুখ বোহেমিয়ান চরিত্র সৃজন– এসব লক্ষণও রয়েছে। শ্রীশ ও মুকুল, বাইরে তাদের অশান্ত অক্লান্ত কর্মময়তা, আর নিভৃত মর্মলোকে অনন্ত বেদনাযন্ত্রণার ফল্গুধারা। উপন্যাসের শেষে প্রকাশিত হয়েছে মুকুলের বন্ধনহীন, সমাজ-প্রভাবহীন পথচারী-জীবনের অন্তহীনতার কথা। কি চেহারায়, কি সংসারানাসক্তিতে সে বোহেমিয়ানের লক্ষণযুক্ত। নিজের প্রতি মমতাহীনতার সঙ্গে এক রোমান্টিক বেদনাবোধের পরিচয় শ্রীশ ও মুকুলের সর্বত্র জুড়ে। দুঃখের সঙ্গেই জীবন চরিত্রটিরও মিতালী। মুকুলের জন্মপরিচয়ের মধ্যে রয়েছে কল্লোলচেতনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের প্রতিফলন। পিতৃপরিচয়হীন মুকুল এখানে অন্যতম প্রধান চরিত্ররূপে বিবেচিত হয়েছে। এভাবে গতানুগতিক সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে অতিক্রম করে নতুন জীবনপথের সন্ধান এই *পথিকের* চরিত্রদের লক্ষ্য।

> মায়া ও তার পথিকবন্ধুর দল মার্জিত চেতনার নিকষে সদসৎ ও সুন্দর কুৎসিতের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করেছে, নিজেদের জীবন দিয়ে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিচিত্র ভাঙাগড়ার মধ্যদিয়ে নিজেদের ব্যক্তিসত্তার আবিষ্কার ও সমাজসত্তার সঙ্গে তার যুগানুগ সাযুজ্য সন্ধান করেছে। এটা তারা জানে, সত্তার সেই প্যাটার্নও অব্যয় হবেনা, কারণ পথিক মানুষের পথচলার শেষ নেই। এই মায়াদের জীবনউপাদান ছড়িয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দেশ কালের মধ্যে।[১৩]

জীবনের অর্থকে তারা উপলব্ধি করেছে উদার, হাসিকান্না ও বাসনাপ্রেমে উজ্জ্বল এক ব্যাপক বিস্তীর্ণ স্বপ্নময়তার মধ্যে। তাদের কারো বা পথচারী জীবনের অন্তহীনতার কথা আভাসিত হয়ে উঠেছে উপন্যাসের মধ্যে। *পথিক* নামের তাৎপর্যও এভাবেই বিশ্লেষিত হয়েছে। 'সে পথিকদলে যারা আছে তাদের নামধাম আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তারা আমাদের চেনাজানা মহলেরই মানুষ, কিন্তু তবু সম্পূর্ণ অপরিচিত। নামধামে যত মিলই থাক মন ও হৃদয়ের জটিলতার পরিচয়ে তাদের মত মানুষকে সাহিত্যের অভিযানে আগে কখনো দেখা যায়নি'।[১৪] 'এই পথচলার মুক্তবন্ধ রোমান্টিক সুরই গোকুলচন্দ্রের তথা সমগ্র কল্লোলপর্বের জীবন-অনুভবের অন্যতম মূল প্রেরণা'।[১৫]

পথিক উপন্যাসে লক্ষ করা যায়– যুব সমাজের নতুন যুগের স্বপ্নকল্পনা। প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের গণ্ডী থেকে তাদের মুক্তির আকুলতা। জীবনভাবনা ও প্রেম সম্পর্কে তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের শিল্পাভাস সূচিত হয়েছে এখানে। যা পূর্ববর্তী উপন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করেনি, বরং তা থেকে অনেকক্ষেত্রেই ভিন্ন। উপন্যাসে কোনো কোনো চরিত্রের দ্বারা সূচিত– গতানুগতিকতার বাইরে,

Dhaka University Institutional Repository

নারীপুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ রচনায়– যেমন, শ্রীশ ও বিকাশের সঙ্গে মায়ার এবং সন্তানের স্বাধীন চিন্তাভাবনা ও স্বাধীনতার বিষয়ে করুণার উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে স্বয়ং লেখকেরই অভিমত।

রাজনৈতিক নানান মত ও তার বিচার-বিশ্লেষণ এখানে রয়েছে, রয়েছে সমাজপ্রচলিত ও অত্যন্ত বিবাহসংস্কারের মূলে আঘাত হানার প্রয়াস। ব্রাহ্ম-হিন্দু বিয়ে সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে এখানে।

তথাকথিত আভিজাত্যের প্রতি বিদ্রূপ, সমকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মূল্যায়ন, জন্মপরিচয়হীন যুবকের প্রতি, কুমারী জননীর প্রতি উদার বিচার-বিবেচনা– সব মিলিয়ে লেখকের সংস্কারমুক্ত মনোভাবের পরিচয় ফুটেছে উপন্যাসের পরিসরে।

বহির্জীবনের চেয়ে অন্তর্জীবন-বাস্তবতার শিল্পরূপদানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় এ উপন্যাসে। বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তা ও মতের মধ্যদিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন তার নিজেরই প্রাগ্রসর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে– যা কিনা একান্তই *কল্লোল*ভাবনাশ্রয়ী। মুক্তপ্রাণ একদল তরুণতরুণীকে আশ্রয় করে সৃজিত এ কাহিনীর পরিসরে স্ফুরিত হয়েছে তাঁর নতুনকালের প্রত্যাশা। কোথাও কোথাও বাক্যের অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের জীবনোপলব্ধির পরিচয়। বিমল ও জীবন কর্তৃক বীরেন্দ্রনাথের 'ভিটের মাটি' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ এবং অঙ্কনশিল্প সম্পর্কে মুকুল দেবের বক্তব্যের মধ্যে গোকুল নাগের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিফলন রয়েছে– এটা অনুমান করা যায়।

যৌবনের ধর্ম জীবনের আনন্দ, দুঃখবেদনা, ব্যর্থতা, হতাশা– এই সবকিছুকে নিয়েই মেতে থাকার অস্থির-আয়োজন। *পথিক* উপন্যাসে এলক্ষণ স্পষ্টতা লাভ করেছে। লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও স্বপ্নের প্রতিফলন এখানে লক্ষ করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে যৌবন-স্বপ্নচারী *কল্লোলের* প্রথম পথযাত্রার নায়ক গোকুল নাগের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন নবীন-প্রবীণ অনেকেই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. রবিন পাল,'কল্লোলিত কল্লোল', *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা.১৩৯৭ পৃঃ ১১০।

২. গোকুল নাগের মৃত্যুর পর *কল্লোলের* চতুর্থবর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যাঃ শ্রাবণ ১৩৩৩-এর ভাকঘর বিভাগে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ কথাগুলো উল্লেখ করা হয়।

৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোলযুগ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

৪. *কল্লোলের* প্রথমবর্ষঃ বৈশাখ ১৩৩০ থেকে দ্বিতীয়বর্ষঃ ৭ম সংখ্যাঃ কার্তিক ১৩৩১।

৫. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

৬. *কল্লোল*, তৃতীয় বর্ষঃ ৩য় সংখ্যাঃ আষাঢ় ১৩৩২।

৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৪।

৮. সমরেশ মজুমদার, *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর* (কলকাতাঃ রত্নাবলী, ১৯৮৬) পৃঃ ৩০৪।

৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (সপ্তম সংস্করণ; কলকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪),পৃঃ ৪৪৯।

১১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৪।

১২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২৩৫।

১৩. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

১৪. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'কল্লোলের কাল', *দেশ*, প্রাগুক্ত।

১৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ পাঁক

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ পাঁক

হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামের এক সুশিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের সন্তান প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৩-৮৮)। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, জননী সুহাসিনী দেবী। কাশীর হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে ৫/১২ আউধ ঘরবি মহল্লায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম। তাঁর জন্মসাল নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার অবকাশ রয়েছে। তবে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি মিলিয়ে বিচার করে তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালের আগস্ট মাস বলে ধরা যায়।[১] প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্মের পর পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানেই দ্বিতীয় বিয়ে করলে মাতামহ রাধারমণ ঘোষ শিশু দৌহিত্রসহ কন্যাকে নিজের কাছে এনে রাখেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পিতা রেলকোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আর মাতামহ ছিলেন রেলকোম্পানির চিকিৎসক।[২] মাতামহ বসন্তরোগে অকালে লোকান্তরিত হলে দিদিমা কুসুমকুমারী দেবীর অভিভাবকত্বে তিনি লালিত হতে থাকেন। জননীর পত্রপত্রিকা পাঠের আগ্রহ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। সুশিক্ষিতা জননীর কাছে শোনা দেশোদ্ধারকল্পে আত্মবলিদানকারী বিপ্লবীদের কথা তাঁর মনে স্বদেশ চেতনার বীজ বপন করেছিল সেই শৈশবেই।

দিদিমা কুসুমকুমারী দেবী কলকাতায় বাড়ি ক্রয় করলে পরিবারের সঙ্গে জননীসহ কলকাতায় আসেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ভবানীপুরের ৫৭ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট হয় তাঁদের নতুন ঠিকানা। ১৯১৪ সাল তখন, তাঁর বয়স মাত্র এগারো, সাউথ সুবার্বন স্কুলে সপ্তমশ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি, এ সময়ে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন জননী সুহাসিনী দেবী। মায়ের মৃত্যু তাঁর কিশোর হৃদয়কে গভীরভাবে শোকাহত করেছিল---এ শোকের স্বরূপ জানা যায় তাঁর স্মৃতিকথায়।[৩] পড়াশোনায় তিনি বরাবর ভালো ছিলেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি। স্কুলের গ্রন্থাগারের ইংরেজি ও বাংলাভাষার সমস্ত বই পড়ে শেষ করেন অল্পদিনের মধ্যে। দিদিমার আনুকূল্যে ফুটপাথ থেকেও বই কিনে পড়তেন। তাঁর সাহিত্যমানস গড়ে তোলার পেছনে প্রধান শিক্ষকসহ স্কুলের বিভিন্ন শিক্ষকের এবং কোনো কোনো সহপাঠীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি এ সময়েই। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে খেলাধুলা এবং গড়ের মাঠের তাঁবুতে ম্যাডান কোম্পানি প্রদর্শিত বায়োস্কোপ দেখা চলতো।[৪] স্কুলে পড়ার সময়ে, বয়স যখন মাত্র চোদ্দ, উপন্যাস রচনায় হাত দেন তিনি। কলকাতার এক দরিদ্র বস্তি ও তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, স্কুলে যাওয়া আসার সময়ে যেটুকু নজরে আসতো, সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করে তিনি লিখতে শুরু করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস *পাঁক*।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন ও ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনায় জানাযায় শুরু থেকেই এক অস্থির বাঁধনহারা স্বভাবলক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিল তাঁর মধ্যে। কলেজে, কোনো বিশেষ বিষয়ে পড়াশোনা, কি কাজকর্ম কোনোটাতেই তিনি একটানা লেগে থাকতে পারেননি, বারবারই তা পরিবর্তিত হয়েছে। স্কটিশ চার্চ কলেজে কলাবিভাগে ভর্তি হলেন, কিন্তু তা ছেড়ে দিয়ে আবার ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন কলেজে বিজ্ঞানশাখায়। কিছুদিন পর তা ছেড়েদিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কৃষিবিদ্যা ও হস্তশিল্প শেখাবার প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনে। অল্পসময়ের মধ্যে সেখান থেকে আবার ফিরে আসেন সাউথ সুবার্বন কলেজে। মেডিক্যাল স্কুলে পড়বার জন্যে তিনি ঢাকায় গেলেন, শেষে ভর্তি হলেন জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। এভাবে এক বিভাগ ছেড়ে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যবিভাগে অধ্যয়ন শুধু নয়, এককাজ ছেড়ে অন্যকাজ গ্রহণের মধ্যেও মূলত বোহেমীয় জীবনে আকর্ষণ কাজ করেছে তাঁর। কোনোকিছুতে স্থির হয়ে লেগে থাকার পরিবর্তে এক অস্থির জীবনপরিক্রমার লক্ষণ তাঁর স্বভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল।[৫] এরই কারণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতা তাঁর লক্ষ্য হলেও জীবন ও সংসারে পদেপদে তিনি বাস্তবজ্ঞান-বর্জিত বলে পরিচিত হয়েছেন। 'আসলে প্রেমেন্দ্রের জীবনদর্শন ছিল বেপরোয়া, বিচিত্র। ভাঙন কারিগরের নিজের জীবনেও ভাঙচুর প্রচুর। সৃষ্টিধর্মী বিচ্ছিন্নতায় স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন সারাজীবন। নিজের লেখালেখি ব্যাহত হয়েছে, অজস্র পেশাপথে পা বাড়াতে হয়েছে অর্থ চাহিদায়, তবু নিজেকে অন্তত কখনও ঠকাননি। আপোষ করেননি আত্মদর্শনের বিরুদ্ধে গিয়ে'।[৬]

অবশ্য, অস্থিরতা সত্ত্বেও আমৃত্যু সাহিত্যচর্চা করে গেছেন নিরলস প্রয়াসে। ঢাকায় থাকতেই নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত স্প্যানিশ লেখক জাসিন্তো বেনাভেন্তের উপর একটা প্রবন্ধ লিখে *প্রবাসী*তে পাঠান এবং তা ছাপা হয় (চৈত্র ১৩৩০- বৈশাখ ১৩৩১)। ছাপার অক্ষরে এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। নতুন কালের বার্তা নিয়ে তখন *কল্লোল* আত্মপ্রকাশ করেছে। *প্রবাসী*তে প্রকাশিত হওয়া 'শুধু কেরানী' গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হলো *কল্লোলে*র বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায়। *ভারতী*র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যায় 'শিকলির দাম' গল্প প্রকাশিত হলে তারও প্রশংসা করা হলো এর শ্রাবণ ১৩৩১-এ। এভাবেই *কল্লোলে*র প্রতি আকর্ষণ জন্মায় তাঁর। অচিন্ত্যকুমারের সাহচর্যে এসে যুক্ত হয়ে পড়েন এর সঙ্গে। *কল্লোলে*র জন্মের বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল শ্রমজীবীদের মুখপত্র *সংহতি*, জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসুর যুগ্ম সম্পাদনায়। এই *সংহতি* পত্রিকায়ই ১৯২৪ এর জুলাই কিংবা আগস্ট থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর *পাঁক* উপন্যাসটি। সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে *সংহতি* বন্ধ হয়ে গেলে বাকি অংশ প্রকাশিত হয় *বিজলী* (১৩৩৩) পত্রিকায়। *পাঁকে*র দ্বিতীয় পর্ব রচনা করে তা প্রকাশ করেন তিনি। *কালিকলমে*র বৈশাখ ১৩৩৩ থেকে মাঘ পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে মোট সাত সংখ্যায় এটি সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এ।[৭] *সংহতি* পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে সাম্যবাদী ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এর প্রতিফলন ঘটেছে *পাঁকে*র দ্বিতীয় পর্বে। যা কিনা প্রথম পর্বের কাহিনীর সঙ্গে তেমন সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

১৯২৫ সালে কলকাতায় এসে তিনি চক্রবেড়িয়া মাইনর স্কুলে উনিশ টাকা বেতনে সহকারী প্রধান-শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ করেন। করেন ১৯৩০-এ *বঙ্গবাণী*র সম্পাদকের কাজ, *কালিকলমে*র সম্পাদনার কাজ। ১৯২৭ সালে পঁচাত্তর টাকা বেতনে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর কাজে নিয়োজিত হন তিনি। কিন্তু অস্থির স্বভাব তাঁকে একাজে টিকে থাকতে দেয়নি। দিদিমা কুসুমকুমারী দেবীর চাপে ১৯২৮-এ যশোর জেলার ঝিনাইদহ গ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষের চোদ্দবছর বয়সী কন্যা বিভাদেবীর সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কন্যা মাধবী, দুইপুত্র মৃন্ময় ও হিরন্ময়কে জন্ম দিয়ে মাত্র উনিশবছর বয়সে ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে বিভাদেবী লোকান্তরিত হলে সন্তানদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন প্রেমেন্দ্র মিত্র। শেষে বন্ধুদের সহায়তায় ১৯৩৪-এ শিরিভির রাজ এস্টেটের দেওয়ান তিনকড়ি বসুর পৌত্রী আশুতোষ বসুর কন্যা বীণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন তিনি। বীণাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্তানের মমতা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর সপত্নী-পুত্রকন্যাদেরকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৩১-এ পান বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞাপন বিভাগে প্রচার-সচিবের কাজ। *বঙ্গশ্রী* (১৯৩২) পত্রিকায় কাজ করেন, করেন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে *কবিতা* পত্রিকার সম্পাদনার কাজ। *কবিতা*র সঙ্গে যুক্ত থাকতেই ১৯৩৬ সাল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সম্পাদনার কাজ শুরু করেছিলেন *নবশক্তি* পত্রিকায়। এই বছরেই একটি বিশিষ্ট কিশোর পত্রিকা *রংমশালের* সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন তিনি, দু'বছরের কিছু বেশী সময় যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। তিনি ছোটদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানোর উপযোগী রচনা লিখতেন তাতে। এ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন বিজ্ঞাননির্ভর কাহিনী 'পৃথিবী ছাড়িয়ে'।

পত্র পত্রিকার সম্পাদনাকাজে কোনো পারিশ্রমিক মিলতোনা তাঁর প্রায়ই, নিছক প্রাণের টানেই এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হতেন তিনি। কিন্তু সাংসারিক বা বৈষয়িক দিকে মনোযোগী না হলেও অর্থের প্রয়োজন তাঁর ছিল তীব্র, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই ১৯৩৭ সালের দিকে তিনি চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা চোদ্দ। এগুলোর কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন তিনিই। এই একটিমাত্র পেশাগত কাজেই একটানা দীর্ঘসময় লেগে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়েই তিনি কবি ও গল্পকাররূপে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ষোলোটি। এ সালেই আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান প্রযোজকের পদে যোগ দেন, এতে যুক্ত থাকেন ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৪২-'৪৩ সাল থেকেই বেতারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন তিনি। এরপর ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আকাশবাণীর পূর্বাঞ্চলীয় উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত থাকেন।

অস্থিরস্বভাবের কারণে কোনো পেশাগত কাজে দীর্ঘসময় স্থির হতে না পারলেও সাহিত্যচর্চায় তাঁর নিবিড় নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে। তাঁর নিজের কথায়ও রয়েছে এর সমর্থন।[৮] এই একনিষ্ঠ সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিও মিলেছে তাঁর জীবনে বড়ো কম নয়।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে লাভ করেছেন 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার'। ১৯৫৭ সালে বেলজিয়ামের বিশ্বকবিতা উৎসবে ভারতীয় কবিপ্রতিনিধিদের দলনেতা হয়ে প্রথম বিদেশে যাবার সুযোগ লাভ করেন তিনি। ইতালি ও ইংল্যান্ড ঘুরে আসারও সুযোগ হয় তাঁর এই সঙ্গেই। 'ঘনাদা সিরিজ' গল্পমালার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন তিনি ১৯৫৮ সালে। ভারত সরকারের কাছ থেকে 'পদ্মশ্রী' সম্মান লাভ করেন ১৯৬০ সালে। আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন তিনি ১৯৬২ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া 'লিডারস্ গ্রান্ট' লাভ করে। ১৯৬৩ সালে শিশুসাহিত্যের জন্যে পান 'মৌচাক' পুরস্কার। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইটার্স্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের ডিরেক্টর ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, জরাসন্ধ, মহাশ্বেতা দেবী, প্রতাপচন্দ্র চন্দ, রঞ্জিৎকুমার সেন, প্রমুখ, ১৯৬৮ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৯৭১ সালে ভুবনেশ্বরী পদক লাভ করেছিলেন তিনি 'শিশুসাহিত্য পরিষদ' থেকে। আনন্দবাজার প্রকাশনা সংস্থার 'আনন্দ-পুরস্কার' পান ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৬ সালে 'নেহরু-পুরস্কার' লাভ করে রাশিয়া ঘুরে আসার সুযোগ হয় তাঁর। ওই বছরেই সর্বভারতীয় অথরস্ গিল্ডের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'হরলাল ঘোষ-পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। শরৎসমিতি কর্তৃক 'শরৎ-পুরস্কারে' ভূষিত হন তিনি ১৯৮১ সালে। ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন 'জগত্তারিণী পদক'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক তাকে 'বিদ্যাসাগর-পুরস্কার' প্রদান করা হয় ১৯৮৪ সালে। বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে ১৯৮৮ সালে। এই উপাধি লাভের পর, জীবনের সর্বশেষ সংবর্ধনা লাভ করেন তিনি এ বছরের ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি *শিল্প ও সাহিত্য* পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতাপচন্দ্রের বাড়িতে। এ বছরের ৪মার্চ তারিখে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে নীত হন, সেখানে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে ৩ মে তারিখে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পরে, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে সম্মান জানিয়েছে *আনন্দবাজার পত্রিকা* (১৮ মে ১৯৮৮)। একই সংখ্যায় সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে ('সাহিত্যের মতোই নিত্য বহমান যাঁর সাহিত্যিক সত্তা') উল্লেখ করেন স্কুলজীবনে লেখা তাঁর রচনাটির (*পাঁক*) কথা, যা কিনা আধুনিক উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে অনুক্ত রাখা চলেনা কোনোভাবেই। তাঁর সম্পর্কে *যুগান্তর* পত্রিকায় প্রণবেশ চক্রবর্তীর মন্তব্য (১৫ মে ১৯৮৮) ঃ

> রবীন্দ্র-প্রভাবের পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও... যুগযন্ত্রণা ও রোম্যান্টিকতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট।... 'কল্লোল যুগে'র তিনি হলেন অন্যতম প্রধান স্থপতি। একই সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনা, চিত্রনাট্য রচনা, চলচ্চিত্র পরিচালনা, গল্প ও উপন্যাস লেখা, কবিতা রচনা ইত্যাদি বহুমুখে বিস্তৃত তার প্রতিভা সর্বাংশেই সার্থকতা লাভ করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধও রয়েছে। তবে প্রধানত তিনি ছোটগল্পকার, কবি এবং ঔপন্যাসিক। কী বিষয়ে, কী প্রকরণে, কী রসমাধুর্যে তাঁর ছোটগল্পের সাফল্যের কথা সবাই স্বীকার করেন। প্রেমচেতনায় রোমান্টিকতায়, চিত্রকল্প নির্মাণে, ছন্দ ও অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে, উপমা-প্রয়োগে, কখনো আবার নির্জ্ঞানমনের উদ্‌ঘাটনে— সবমিলিয়ে তাঁর কবিতা যেমন নতুন যুগের লক্ষণবাহক, গল্প উপন্যাসও তেমনি। কবি-আত্মার সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করেছে তাঁর ঔপন্যাসিক বোধ ও বিশেষত্ব। তাঁর রচনা কাব্যময়তার আতিশয্যহীন, অথচ পুরোপুরি বুদ্ধিপ্রধান জীবনসমালোচনাও তা নয়। বরং কবিতামূলক ব্যঞ্জনাধর্ম প্রাণলাভ করেছে সাংকেতিকতাকে আশ্রয় করে। চিরাচরিত জীবনবৃত্ত পরিক্রমা নয়, আধুনিক যন্ত্রজটিল জীবনযাত্রার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত শহরতলির মানুষ তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসের চরিত্র; যুগ ও জীবনযন্ত্রণাজনিত পাঁক ও ক্লেদ তার বিষয়। তবে লক্ষণীয় এই যে, তাঁর সৃষ্টিতে বাস্তবতা এসেছে নানা ভাবে, কিন্তু তা কখনোই যৌনতার সঙ্গী হয়ে নয়। তাঁর *পাঁক, মিছিল, উপনায়ন*— এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে জটিল নগরচেতনার পরিচয় বিধৃত। যুদ্ধোত্তর কালের বিপর্যস্ত নাগরিক জীবনসংকট প্রবল হয়ে ধরা পড়েছিল মানুষের জীবনযাত্রায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাকেই চিত্রিত করেছেন তাঁর এইসব উপন্যাসের পরিসরে।

মুচিপাড়া ও মেথরবস্তির প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত হয়েছে *পাঁক* উপন্যাসের কাহিনী। পঙ্কসঙ্কুল এক বস্তিজীবনের চিত্র এটি। লেখকের নিজের ভূমিকা সংবলিত সাতাত্তর পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি রচনার প্রায় বারো বছর পরে প্রকাশিত হয়। বস্তিপাড়ার জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ যে কলহ, তাই দিয়ে *পাঁকের* কাহিনী শুরু। দুঃসহ ক্ষুধা ও দুর্বহ দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত এই মানুষগুলো ক্লান্ত ও অস্থির। পারস্পরিক কলহকোন্দলের মধ্যে রয়েছে তাদের এই অস্থিরতার পরিচয়। মুচিপাড়া ও মেথরবস্তির মাঝখানে পথ নামের অপরিসর কর্দমভূমি। মানুষ হয়েও পশুর তুল্য এ জীবনযাপন তাদের নিয়তি। এ থেকে অব্যাহতি নেই, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। এ উপন্যাসে রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও শোষণবঞ্চনার সঙ্গী অন্ত্যজসমাজস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী দু'ভাইবোনের একটি পরিবারের কথা। সংকীর্ণ খুপরীঘরে, বসবাসের নামে নির্যাতনের একশেষ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কালাচাঁদ ও তার বোন পাঁচির দিন অতিবাহিত করার এক অসুস্থ চিত্র। চারপাশে রয়েছে এদেরই মতো আরো পরিবার, তাদের সন্তানরা ভোর হতেই ভিক্ষায় বের হয়। এভাবে ভিক্ষা করতে গিয়ে একদিন বৃষ্টিবাদলের মধ্যে দুর্ঘটনায় পড়ে তিনকড়ি মুচির মেয়ে আহ্লাদী। তার কোলের দু'বছর বয়সী ভাইটি মারা যায়, আর সে নিজে অচেতন অবস্থায় মেডিকেল কলেজে নীত হয়। খ্রীষ্টান পাদ্রী স্ট্যানলির আনুকূল্যে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এসেও আবার তাঁর অনাথ আশ্রমে চলে যায় সে। কালাচাঁদকে এক মজুরমেয়ে ভালোবাসে। কিন্তু পাঁচির সম্মতি না থাকায় তাদের বিয়ে হতে পারেনা। বর্ষার মরসুমে, দুই বস্তির জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে ওঠে, রোগাক্রান্ত হতে থাকে এখানকার মানুষগুলো। পাদ্রী স্ট্যানলি তাদের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অশান্ত কর্মকার নামে এক সমাজসেবী শিক্ষিত যুবকের সন্ধান মেলে উপন্যাসের শেষেরদিকে। বস্তির মানুষের সেবাকাজের পাশাপাশি তাদের এই নষ্ট জীবনযাত্রার উৎসসন্ধানে সে আগ্রহী হয়েছে। তাদেরকে জাগিয়ে তুলে সে এই ক্লেদময় পরিবেশ থেকে উদ্ধারের বাসনা পোষণ করেছে।

কুঁড়ে ও স্ফূর্তিবাজ স্বভাবের অধিকারী বিশবছর বয়সের কালাচাঁদ। তার ছেলেবেলা কেটেছে বাপের আদরে, 'ফচ্‌কে দোস্তদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় বিড়ি বার্ডসাই খেয়ে, খাইয়ে, চার-আনা, বারো-আনা চুল ছেঁটে, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, গলায় রুমাল বেঁধে ইয়ার্কি দিয়ে'। কিন্তু নিতান্ত অসময়ে পিতার মৃত্যু হলে তার এই বয়েচলা জীবনের ধারাবাহিকতা থমকে পড়ে। একমাত্র ছোটবোন বিধবা হয়ে ফিরে আসে তার কাছে। সংসার চালাতে গিয়ে সে অনুভব করে জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব এবং অতিরিক্ত বন্ধুবাৎসল্যের কারণে বাপের রেখে যাওয়া পুঁজিপাটা খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে সে। জীবিকা নির্বাহের পথে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও তার মর্মগভীরে রয়েছে বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের অহংকার। রাজমিস্ত্রীর অধীনে যোগাড়ে হয়ে কাজ করতে তার অস্বস্তি জাগে, ভেতর থেকে ক্ষোভ ফুঁসে ওঠে মালিক কিংবা অন্য লোকের কাছে অপমানিত হলে। তারুণ্যের স্বভাবজাতধর্মে একদিকে সে খ্যাপাটে, অন্যদিকে বোনটির জন্যে তার হৃদয় উজাড়করা মমতা, যদিও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তার প্রতি বিপরীত আচরণই সে করে ফেলে মাঝে মাঝে। মজুর মেয়ের প্রণয় লাভ করে তারুণ্যের রোমান্টিক ভাবাবেশে তার 'নিষ্ফল জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা' ধুয়ে মুছে যায়।

কালাচাঁদের বিধবা বোন পাঁচি। হালকা পাতলা লম্বাটে গড়নের ষোলো বছর বয়সের মেয়ে। স্বল্পবাক ও ধৈর্যশীলা এ মেয়েটি ভাঁড়ার শূন্য থাকলে অসুখের কথা বলে শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে ভাইয়ের অভিযোগ এবং গালাগাল শোনে, আর মর্মগভীরে পীড়া অনুভব করে অভুক্ত ভাইয়ের জন্যে।দাদার কাজকর্ম ঠিকঠাক মতো চললে প্রতিবেশীর অভাব-অনটনে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেয় সে। তাদের শিশুদের 'পার্বনী' দেয়, আহ্লাদীর মায়ের রূঢ় ব্যবহার ও কটুকাটব্য সত্ত্বেও তার নিত্যঅভাবে সাহায্য করে তাকে। বন্ধক দেওয়া মায়ের হারছড়াটা খালাস করার কথা ভাবে, দাদার জন্যে 'পিরতিমের' মতো বউ আনার স্বপ্ন দেখে। স্বভাবে চাপা এ মেয়েটি মুচিপাড়ার অন্য মেয়েদের চেয়ে নানাভাবেই ব্যতিক্রম। মর্মগভীরে নিহিত তার বংশমর্যাদার অহংকার। 'ছিদাম মুচির মেয়ে হয়ে' অন্যের কাছে হাত পাততে তার বাধে, বরং তার কাছেই সাহায্য চাইতে আসে প্রতিবেশী নারীরা। বংশমর্যাদাবোধের জন্যে সে নেত্য ও কালাচাঁদের বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম থেকেই। তবু জীবনবিমুখ নয় পাঁচি। গভীররাতে দুর্ঘটনার সময়ে প্রতিবেশী তিনকড়ি মুচিকে আগুনের ভেতর থেকে টেনে বের করেছে সে। ওইসময়ে সে জেগে না থাকলে তিনকড়ির

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতি কি হতো—চিন্তা করতে গিয়ে শিউরে শিউরে উঠেছে পরদিন। সংস্কারাশ্রিত এক সুদৃঢ় সংযমধর্ম তার স্বভাবের বিশেষত্ব হলেও তার অবদমিত মনোবাসনায় অস্ফুট ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে—

> পাঁচির কালকের ধোঁয়া-আগুনের আঁচ লেগে বুঝি চোখটা এখন করকর করছিল, একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।১/৭৭

যৌবনের সূচনায়ই স্বামীকে হারিয়ে তার জীবনের সব রঙ মুছে গেছে। জীবনের কাছথেকে তার পাবার আর কিছু নেই। মরণের সম্ভাবনা তার মনকে কখনো কখনো বিচলিত করলেও, সে অনুভব করে—'চিরবঞ্চিত আশাহীন জীবনে মৃত্যুর কাছ থেকে ভয় করবার' ও যে তার কিছু নেই।

পাঁক উপন্যাসের কিছু কিছু চরিত্রকে প্রেমেন্দ্র মিত্র করে তুলেছেন অনবদ্য, জীবনরসে ভরপুর। বাইশ বছরের যুবতী বাল বিধবা নেত্য এমনি এক চরিত্র। কালাচাঁদের মতো সেও রাজমিস্ত্রীর অধীনে যোগাড়ের কাজ করে। যে কালাচাঁদ বাহ্যিকভাবে অপরিণামদর্শী হলেও, তারুণ্যধর্মের প্রেরণায় প্রতিবাদী ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, তার জন্যে হৃদয়ের গভীরে সে মমতা অনুভব করেছে। লোকের কাছে অপদস্ত হলে মনে মনে তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং কালাচাঁদ সম্পর্কে অভিযোগ করতে আসা সহকর্মীদের উদ্দেশে সে বিরূপ উক্তি করেছে। বর্ষণমুখর রাতে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে তার মনের মধ্যে ভিড় করেছে স্বপ্ন, অনেক গানের সুর। ভোর হতেই দরজায় কালাচাঁদকে দেখে তার বুক কেঁপেছে, কেঁপেছে আনন্দে কিংবা বিস্ময়ে। তার যৌবনতপ্ত, বাসনাউদ্বেল হৃদয়ের পরিচয় স্পষ্টতা পায়— এই হঠাৎ চলেআসা কালাচাঁদের সামনে নিজেকে সুবিন্যস্ত, সুন্দর করে উপস্থিত করতে না পারার অস্বস্তির মধ্যে। কাম ও প্রেমের নিভৃত ফল্গুধারা তাকে উদ্দীপিত করে, কালাচাঁদকে ঘিরে জাগে তার সংসার-রচনার বাসনা। যদিও সাহিত্যের কোনো খবর রাখেনা নেত্য, তবু যৌবনানুভূতির চিরন্তন দীপ্ত আবেগ তাকে অস্থির করে। অবিরল ধারাপতনের শব্দে একাকীত্বের অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে তার, রোমান্টিক বেদনায় আপ্লুত হয় হৃদয়। অকারণে কান্না পায়, কার উপর যেন অভিমান জাগে, আয়নায় নিজের চেহারা কদর্য হয়ে ধরা পড়ে। পাশের ঘরের ঘুমন্ত মোটা গয়লানীর নাকডাকার শব্দে বিরক্ত হয়, ইচ্ছে করে—'থাবড়া দিয়ে জাগিয়ে আসে'। প্রেমাবেগের অস্থির তাড়নায় কালাচাঁদের কাছে সমর্পণের বাসনা জেগেছে তার বারবার। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার প্রশ্নে সব বাধা তার কাছে তুচ্ছ। প্রেমের এক বলিষ্ঠ অথচ নিগূঢ় স্রোতধারা নেত্যর শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আবার বন্তিনারীর তীক্ষ্ণধার স্বভাবটুকুও তারমধ্যে অনুপস্থিত নেই। বাড়িওয়ালী গয়লানীর সন্দেহমিশ্রিত কৌতূহলের জবাবে তীব্র সুর ঝংকৃত হয়েছে তার কণ্ঠেঃ

> অত আদিখ্যেতা আবার কবে থেকে হল গো তোমার? আমার খাবার জন্য ভেবে মরছ। হাঁ করে দেখছ কি? রাস্তা থেকে লোক ধরে এনেছি। ১/১৩২

এ উপন্যাসের দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রেভারেন্ড স্ট্যানলি ও অশান্ত কর্মকার। দুজনেই অক্সফোর্ড থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন দুঃস্থ মানুষের সেবায়। বাইশ বছরের যুবক, লর্ড ফ্যামিলির সন্তান, অক্সফোর্ড ইলেভেন-এর ক্যাপ্টেন, চির স্ফূর্তিবাজ, সকল কাজে ওস্তাদ স্ট্যানলি

Dhaka University Institutional Repository

সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে কেন এবং কিভাবে মাত্র বাইশ বছর বয়সে পাদ্রী হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন, তার সরাসরি ব্যাখ্যা না দিয়ে লেখক জানানঃ

> অতল সমুদ্রের চেয়ে যে মানুষ রহস্যময় তার অন্তরের খবর কে জানে?১/১০২

প্রাচীন কীর্তিময় ধ্বংসাবশেষের দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন যন্ত্রসভ্যতাময় ইউরোপ থেকে ভিন্ন 'স্বপ্নময় চির-গোধূলি বেলার', মহিমা। কালিদাসের শকুন্তলা এবং রবিঠাকুরের কবিতার অনুবাদ তাঁর মধ্যে জাগিয়েছে এক 'অর্ধচেতনাময় মধুর নেশা'। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার এই ভারতপ্রেমিকের ধ্যানভঙ্গ করতে পারেনি। ভারতে আসার অনুমতি যোগাড় করে এখানকার দরিদ্র দুঃস্থ মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। শিশুদের জন্যে স্কুল ও অনাথআশ্রম খুললেন। যদিও সাধারণ মানুষ বিদেশীর এই সেবাকর্ম-প্রয়াসকে সহজ চোখে দেখেনি।

অশান্ত কর্মকার, সতেরো বছর বয়সের সময়ে কলেজে ভর্তি হতে পারেনি পিতৃপরিচয়ের অভাবে। কিন্তু এ সত্যকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে সে দ্বিধাও করেনি। নিজের চেষ্টায় দেশের বাইরে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে প্রথম হয়ে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করে। সেখানে লেকচারার পদে যোগদানের আমন্ত্রণ এবং নিজের দেশে যে-কলেজে একদিন ভর্তি হতে পারেনি,সে-কলেজ থেকেও অধ্যাপনার আমন্ত্রণ— উভয়টিই সে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও য়ুরোপের প্রখ্যাত রাজনীতিক মনীষীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে তার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় ছিল আভাসিত। কালাপাহাড়সদৃশ এই যুবকটি বস্তির অসুস্থ,অর্থসঙ্কটাক্রান্ত মানুষের কাছে, 'দেবতা' রূপে পরিগণিত। অন্ত্যজ জীবনের মর্মে পৌঁছতে না পারলে, সমাজের উপরতলে বসে তাদের অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় বলে নোংরা বস্তির মধ্যেই সে বসবাস করতে থাকে। সে অনুভব করেছে— সমাজের অন্ত্যজস্তরের মানুষের অবস্থার পরিবর্তন না করে দেশ স্বাধীন করার উদ্যোগ অর্থহীন।

উপন্যাসের মধ্যে স্বল্প পরিসরে রয়েছে সামন্ত সর্দারের মতো চরিত্র। তার 'সামান্য মিস্ত্রী থেকে সর্বেসর্বা' হয়ে ওঠার কথা জানা যায়। নিজের ডান হাত হারিয়েও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও কৌশলের গুণে সে এখন কন্ট্রাক্টরের ডানহাত। মুচিপাড়ার সবচেয়ে গম্ভীর, স্বল্পবাক ও স্বতন্ত্র স্বভাবের মানুষ তিনকড়ি। দরিদ্র বস্তিবাসী হয়েও তার চরিত্রের গভীরে আত্মসম্মানবোধের প্রচ্ছন্ন লক্ষণ বর্তমান। স্ত্রীকে বলে—

> কালাচাঁদের বোনের কাছে কিছু নিও না আর। নিজের যা আছে তাতে চালাতে পার ভালো, নইলে উপোস করে থেকো। ১/৭৪

অভাবের সঙ্গে মোকাবেলায় তার পরিশ্রমের অন্ত নেই। দু'বেলা ঘরে খেতে এবং গভীর রাতে শুতে আসা ছাড়া সমস্ত দিন বাইরের ঘরে সে সুটকেস তৈরি করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ষাট বছর বয়সী বস্তিনারী কনে বৌ-র উক্তিতেও এর সমর্থন মেলে।তারই কিশোরী কন্যা দশবছর বয়সের আহ্লাদী। পাদ্রী স্টানলির অনাথআশ্রম ও স্কুলের উন্নত জীবনযাত্রার আস্বাদ লাভ করে তার মানসিকতা ও আচরণে আসে পরিবর্তন। অন্যদের থেকে সে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখতে চায় শুধু তা-ই নয়, নীরব শ্রোতা পেলেই সেখানকার মানুষের চালচলন, শিক্ষাব্যবস্থা, খেলা, আমোদও তার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দিতে থাকে অনলস-প্রয়াসে। বস্তির পাঁক,ক্লেদময় পরিবেশ থেকে উন্নয়ন-অভিলাষী মানসিকতা তার মধ্যে বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

আবার তারই ছোট ভাই নয় বছরের শশী নষ্টতাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। এ বয়সেই সব ধরনের গালাগালে সে দুরন্ত। সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসী হলেও কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায় আত্মমর্যাদার লক্ষণ। যেমন-হারুমুচি। আপনা থেকে অবশ হয়ে পড়ার পূর্বে কারো কাছে হাত পাতেনি সে। দুর্বল হাতে হাফসোল লাগিয়েছে জুতোর। কোনো চরিত্র আবার মানবিক হৃদয়ানুভূতিতে পূর্ণ। যেমন-মাজাভাঙা বৃদ্ধা বাঁকাবুড়ি। হারুর নিঃসঙ্গ অন্তিমশয্যায় তার হাতের কাছে একঘটি জল, 'দুটো ভাতের দানা' রেখে, তার নোংরা কাপড় চোপড়গুলো বদলে দিয়ে যেতো, যদিও তার নিজের জীবন অভাবমুক্ত নয়। শৈশব থেকে তার জীবনের সবটুকুই কেটেছে অভাব ও হতাশার মধ্যে, জীবনও শেষ হয়েছে নোংরাবস্তির কর্দমাক্ত পথের উপর। কাদা ও রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকা দেহটির মধ্যে ছিল মানুষ ও দেবতার সম্মিলিত নির্যাতনের সাক্ষ্য।

বস্তির আরেক জীবনচিত্রের সন্ধান মেলে ভোরের কলকাতায়। কানিপরা অসংখ্য ক্ষুদে শিশুর দল জঞ্জালের স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে সন্ধান করে সিগারেটের ছবি, নীলকাচ, একটুখানি পেন্সিল, রঙিন কাপড়ের টুকরো ইত্যাকার আবর্জনার সম্পদের। তারা আধপোড়া কয়লা কুড়োয়, বিচিত্র কৌশলে বুলি আউড়ে আউড়ে ভিক্ষে করে। কোন মেয়ের ছোট ভাই কি বোন কোলে থাকলে এ পথে সবার চেয়ে সে-ই ভাগ্যবতী বলে বিবেচিত হয়। শূন্য হাতে ঘরে ফেরার সাহস তাদের নেই। সারাদিনে কোনো পয়সা মেলেনি, একথা বিশ্বাস করবেনা অভিভাবক। পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই ভিক্ষাবৃত্তির বাধ্যবাধকতা এবং এ পথের রূঢ়-বাস্তবতায় তাদের শিশুসুলভ সারল্য ঘুচে যায়। শৈশব পেরিয়েই সমস্ত গালাগালে দুরন্ত হয়ে ওঠে তারা। জীবন ও জীবিকার পথে তারা পরস্পরের ভাই, বোন কিংবা বন্ধু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীমাত্র। কোনো অনুকম্পা সহানুভূতির স্থান নেই এখানে। অজান্তে বেড়ে ওঠে তারা, জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপে এদের কেউ হয় চোর, কেউ গাঁটকাটা, পতিতা কিংবা কুলি। ক্বচিৎ কখনো খাটতে শিখে কেউ কেউ আবার উত্তরে যায়। ঘরসংসারও পাতে কেউ কেউ। ক্লেদ, পাঁক ও পুঁতিময় পরিবেশে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠার ফলে তাদের চিন্তা ও রুচিবোধ গড়ে ওঠে এরই সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে ঃ

> ভাতারের জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি? আসবেনা। ১/৯৭

কেউ ফিজিতে চালান হয়ে যায়, কেউ আফ্রিকায়, কেউ চা-বাগানে। আবার নতুন দল এসে তাদের জায়গা দখল করে। রাস্তার বে-ওয়ারিশ কুকুরগুলোও জানে যে, এরা 'মানব সমাজের বে-ওয়ারিশ মাল।' এদের ভাষা মিশ্র হিন্দি-বাংলা। এদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ আছে, কায়োর আছে আবার মৌরশী রাস্তা। জীবিকার সুবিধের জন্যে এদের রয়েছে অদৃশ্য সংঘ, শাসন, আইন-কানুনের অলিখিত ব্যবস্থা। রাস্তার চৌমাথাগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করা। কে কোন্ রাস্তায় ভিক্ষে, চুরি-চামারি করবে, তা সেই নির্দিষ্ট আইনের আওতাভুক্ত, 'একজনের মোড় আরেকজনরা নিতে পারেনা।' জীবিকার এ পথে তাদের রয়েছে নানাবিধ সংস্কার ও বিধিঃ

> ময়লার গাদায় হাত দেবার আগে যদি কাকের ডাক শোনাযায়, তাহলে কিছু মিলবেনা। যে রাস্তার ধুলোয় পাখির পায়ের দাগ সে রাস্তা অপয়া। বাদলার দিন বাবুরা বেশি পয়সা দেয়। ১/৯৬

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে মেলে মানুষের অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য এবং বস্তির পরিবেশের চিত্ররূপ। বাপের ভাড়াঘর ছেড়ে কালাচাঁদকে বোনসহ এসে উঠতে হয়েছে মুচিপাড়ার শ্যাওলা-পচা পুকুরের পাশে কম ভাড়ায় একটি ঘরে। বর্ষায় পুকুরের জল এসে চড়াও হয় বাড়ির ভেতরে। ঘিনঘিনে, পচা গাছগাছালির দুর্গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে বাতাস। এ পরিবেশ থেকে অব্যাহতি নেই মুচিপাড়ার কারোরই, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। সে মৃত্যুও আবার সহায় সম্বলহীন অবস্থায়, 'ময়লা কাঁথায় মলমূত্রে একাকার পশুরও অধম হয়ে।'

> ক. হাসপাতালে মরতে হলেও ভাগ্য থাকা চাই, অন্তত সুপারিশ চাই বড় একটা বিদঘুটে রোগের। যে শুধু বার্ধক্যে অনাহারে অতিশ্রমে জীর্ণ হয়ে মরতে বসেছে তার জায়গা এখানে নেই। ১/১০৫

> খ. রক্ত ও কর্দমে মাখামাখি হয়ে যে মৃতদেহটি পড়েছিল, তারদিকে চাইলে প্রথমেই এই কথাটি মনে হয় যে, দেবতা ও মানুষ মিলে আজীবন তাকে কোন লাঞ্ছনা, অপমান ও আঘাত থেকেই অব্যাহতি দেয়নি। যার বেদনাময় বার্ধক্য এমন অগৌরবে সমাপ্ত হল নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে, তার যৌবন ও শৈশব গেছে কি নিদারুণ নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা ও হতাশা নিয়ে....। ১/১১৬

পেটের ক্ষুধা তাদেরকে যে কি রকম হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে তোলে, তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় কালাচাঁদের আচরণে, বিনা দোষে পাঁচিকে গালাগাল করার মধ্যে। এ মুচিপাড়ায় সবারই আকাশচুম্বী অভাব, ধার মেলা ভার। অতএব ঘরের মধ্যেই পাঁচি সন্ধান করে দেখে— যদি বিক্রয়যোগ্য কিছু মিলে যায়!

> তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে—খোঁজবার মধ্যেও তো ঐ ভাঙা কাঠের বাক্সটি— কিছু পাওয়া গেলনা।১/৭০

পাঁচির একমাত্র কাপড়টি আব্রুরক্ষায় অনুপযোগী হয়ে পড়লে ভাইয়ের সামনে মর্মান্তিকভাবে লজ্জায় পড়ে সে। চরণের বৌয়ের কাছ থেকে সূঁচ-সূতো চেয়ে এনে সেটি সেলাই করতে বসে। কিন্তু পচাকাপড়, সেলাই কি হয়? সেলাইয়ের টানেই সূতো ছিঁড়ে যায়। অভাবের কণ্ঠনিষ্পেষণে তারা দুটি ভাইবোন রুদ্ধশ্বাসপ্রায়, কিন্তু অব্যাহতির পথ নেই। অসহায় অক্ষমতা নিয়ে—

> সমস্তরাত দুখী ভাই-বোন দুটিতে ভিজে মেঝেতে ভিজে কাপড়ে জলের ঝাপটায় অর্ধেক নেয়ে জেগে কাটালে ভোরের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা? ভোর হলে তাদের কি লাভ? পরবার কাপড় নেই। মজুরী পাবার আশা নেই। হাতে কাজও নেই। ...বর্ষাকাল এসে পড়ল, চালে পাতা নেই, পুরোনো দেয়ালের মাটি ধুয়ে যাবে—ভাড়া দেবার সংস্থান নেই, মেরামত করারও ক্ষমতা নেই।১/৮৯

রেভারেন্ড স্ট্যানলি নিজের বংশমর্যাদা ও জাত্যাভিমান তুচ্ছকরে এসেছিলেন তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষে। কিন্তু এই বস্তির দরিদ্র মানুষদের সেবা করতে এসে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যায়। তিনি দেখলেন— গরীব এখানে নিত্য উপবাসী, 'স্বার্থ নিয়ে মানুষে মানুষে কামড়া কামড়ি', দারিদ্র্য এখানে যেমন বীভৎস, তেমনি নিষ্ঠুর,

Dhaka University Institutional Repository

সীমাহীন। মজুররা এখানে শীর্ণ বুভুক্ষু, শিক্ষাহীন, কদর্য। লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা গুণে দারিদ্র্য-জর্জরিত মুচিপাড়ার পঙ্কসঙ্কুল পরিবেশের চিত্র বাস্তব হয়ে ফুটেছে উপন্যাসের স্থানে স্থানেঃ

> ক. বর্ষায় সমস্ত মুচিপাড়াটার জলে কাদায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে এক পা-ও কাদায় না-পড়ে যাবার উপায় ছিলনা। অধিকাংশ ঘরের ভেতরকার অবস্থা বাইরের চেয়ে বিশেষ ভাল ছিল না। সমস্ত মাটির মেঝে ফুঁড়ে জল ওঠার দরুন ঘরের মধ্যে শোয়া বসা অসম্ভব হলেও উপায় তা ছাড়া নেই। পুকুরের পাশেই যাদের ঘর, বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে উঠে তাদের বাড়ির ভেতর পর্যন্ত চড়াও হয়েছে। চারদিকের পচা গাছপালার একটা দুর্গন্ধ, বাতাস ভারী করে তুলেছিল। ১/১১১
>
> খ. এবার বর্ষায় মুচিপাড়া ও তার পাশের মেথর-বস্তির অশোভন ও বোধহয় অনাবশ্যক জনসংখ্যা-সমস্যার মীমাংসা করার ভার নিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা ও তারই নিকট ও দূরসম্পর্কীয় কয়েকজন জ্ঞাতি-গোত্র। সে ভার-নির্বাহে তাদের আলস্য ছিলনা।
>
> ...মুচিপাড়া ও মেথর-বস্তির মাঝের কর্দমাক্ত একটা গলি...নামে পথ হলেও সেটা দুই সার বস্তির মধ্যে খানিকটা অপরিসর কর্দম-ভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকারে সামনে একরকম হাতড়েই চলতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাদা থেকে পা টেনে তুলতে রীতিমত লড়াই করতে হয়। ১/১১৫

অর্ধাহারে, অনাহারে, রোগে-শোকে ভুগে বস্তির পাঁক ক্লেদময় পরিবেশে পশু-মানুষের জীবনযাপন করা এই মানুষগুলোর রয়েছে নিজস্ব সমাজ-নিয়ম, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। চড়কসংক্রান্তির পরের দিনটিতে ঝগড়া বাধানো সঙ্গত হয়নি বলে মত প্রকাশ করেছে বয়সী বস্তিনারীরা। ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে তারা—'রাস্তায় রাস্তায় চির-ভিখারী ইতর ছোটজাতের দল বচ্ছরকার পরবে মদ খেয়ে, সং সেজে, ঢোল বাজিয়ে বিদঘুটে চীৎকার করতে করতে গাজন-সন্ন্যাসী সেজে'... (১/৬৭)। ধর্মীয় সংস্কারের কারণে পাঁচি যেমন মাদুলি বন্ধক দিতে দ্বিধা করে—

> ঠাকুর-দেবতার জিনিস—আবার কি সর্বনাশ হবে কে জানে—না, না! না খেয়ে শুকিয়ে—১/৭১

তেমনি বন্ধক রাখতেও আপত্তি করে লোকে—

> বাছা, ঠাকুর-দেবতার জিনিস নিয়ে কি ছেলেখেলা চলে? ১/৭২

রবিবার দিন কাজ করতে নেই এবং এদিন সকালবেলা প্রেয়ার না করলে—

> ... ঈশ্বর রাগ করেন। খেঁদি একদিন শশীর মত হেসেছিল, তাকে মিস্ রিং কি রকম বকলেন, বললেন— হাসলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেনা।...১/১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

একবার বিয়ে হয়েছে বলে আবার বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়মসঙ্গত নয়, তাই অনুষ্ঠান ছাড়াই কালাচাঁদকে নিয়ে সংসার করতে চায় নেত্য। কিন্তু 'বিয়ের অনুষ্ঠান বিনা' তাকে নিয়ে সংসার রচনা করতে সংস্কারে বাধে কালাচাঁদের। আবার, পাঁচির বক্তব্যে নেত্যর সম্পর্কে রয়েছে জাতিগত ভিন্নতার সংস্কার—

> ও কি জাত তার ঠিক নেই, ...আমাদের বংশে কখনো অমন অনাচার হয়েছে? ১/১১৪

কালাচাঁদের প্রেমাবেগতপ্ত-হৃদয় নেত্যর কাছাকাছি থাকতে চায়, কিন্তু মনে জাগে লোকনিন্দার শঙ্কা—

> না না, অনেকরাত হয়েছে—দেখছিস না—...এত রাতে লোকে কি ভাববে বল তো? ১/১৩১

আহ্লাদীর কাছে তার অনাথ আশ্রমের বর্ণনা শুনতে শুনতে তার মায়ের প্রশ্ন—

> —মিস্ রিং ফাদারের কে হয় তাহলে?
>
> —কে আবার হয়? কেউ না।
>
> —...ওমা! ওই অতবড় আইবুড়ো মাগী পরপুরুষের সঙ্গে অমন করে থাকে?
>
> —সঙ্গে থাকবে কেন? মিস্ রিং-এর ঘর আলাদা, ফাদারের আলাদা। ওরা তো আর বর-কনে নয়।
>
> —হোক ঘর আলাদা, এক জায়গায় থাকে তো? মাগো কি ঘেন্না! ১/১৩৪

এভাবে, অন্ত্যজতরবাসী হয়েও তারা যেমন ধর্ম, বিবাহ, জাতগোত্র, বয়স ও বৈধব্যের সংস্কারকে লালন করে, তেমনি নিতান্ত উপায়হীন হয়ে পড়লে সংস্কারকে ডিঙিয়েও যায় কখনো কখনো। উনুনে হাঁড়িচড়া বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হলে পাঁচিকে 'ঠাকুর দেবতার জিনিস'— মাদুলি বন্ধক দিতে হয়। কারণ— ক্ষুধার দাবি যে সংস্কারের চেয়েও শক্তিশালী।

ভালোবাসা ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে ভেতরে ভেতরে পীড়িত হয়েছে কালাচাঁদ। প্রেমাবেগের প্রাবল্যে নেত্যর জাত ও বয়সের সংস্কারকে গৌণ বিবেচনা করলেও পাঁচির অমতে এবং বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়া তাকে ঘরে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, আবার 'নেত্যকে ছেড়ে দিলে যে কিছুই থাকেনা জীবনের'। পাঁচির অমত এবং সামাজিক সংস্কারকে অতিক্রম করা যেমন অসম্ভব, তেমনি সম্ভব নয় এসব কথা জানানোর নামে নেত্যকে আঘাত দেওয়া। একদিকে ভালোবাসার হৃদয় তাড়না, অন্যদিকে বাহ্যিক বাধা। নেত্যর মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তার মনে হয়—'এই তো উচ্ছৃঙ্খল নির্ভয় বেপরোয়া যৌবনের বাণী', একই সময়ে মনের মধ্যে কাতর কণ্ঠে জল চেয়ে ফেরে অসুস্থ তৃষ্ণার্ত ছোট বোনটি— সবমিলিয়ে এক দ্বন্দ্ব-জনিত মানস-পীড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কালাচাঁদ।

প্রেমের সূত্র ধরে আসে এর অনুষঙ্গ—ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। কালাচাঁদের বিরুদ্ধে নুলো সামাদ সর্দারের ভূমিকার মধ্যে এ ঈর্ষার আভাস মেলে। কাছাকাছি নম্বর হবার কারণে নেত্য এবং কালাচাঁদ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হবার সযোগ পায়। এতেকরে সামাদের স্বার্থ নষ্ট না হলেও নেত্যকে এখান থেকে সরিয়ে সুরকীকলে যোগাড় দেবার জন্যে পাঠিয়ে দেয় সে। জলখাবারের বিরতির সময়ে তারা একত্র হবার চেষ্টাকালেও গোপন

Dhaka University Institutional Repository

ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে তাদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছে সে। বিশেষ করে কালাচাঁদের উপর তার খবরদারি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তাকে অপদস্থ করা এবং তাকে দিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করানোর প্রয়াসের মধ্যে এ ঈর্ষার পরিচয় মেলে—

> এটা কার গাঁথুনি? কালাচাঁদের বুঝি? কিছু হয়নি—ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথ—
> কি এমন লাটসাহেব মিস্ত্রী, তাগাড়টা নিজে আনতে পারনা, না পার তো কাল থেকে কাজে এসো না। ১/১২১

এ ঈর্ষার ধরন আবার সর্বত্র একরকম নয়। সামাদ সর্দারের সুনজরের কারণে নেত্য একটাকা করে রোজ পাবে বলে ঈর্ষান্বিত হয়েছে অন্য মজুরণীরা। তার প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করে প্রাণের জ্বালা মেটাতে চেয়েছে তারা—

> —তোর এত কি কাজ লা? জলখাবারের ছুটির পর তো দেড়ঘন্টা দেরী করে কাজে এলি, ছিলি কোথা?
>
> ...না হয় আমাদের রোজ একটাকা না-ই হল, না হয় আমাদের ছেনালি নেই বলে কেউ খাতির করেনা, না হয় আমাদের জলখাবারের দু' ঘন্টা ছুটি মেলেনা। ১/১২৫

উপন্যাসে রয়েছে অন্ত্যজস্তরের নারীদের বিশেষত্ব-আশ্রয়ী কথাবার্তা ও আচরণ। পরস্পরের সঙ্গে তারা যতো সহজে 'গলাগলি'তে পৌঁছে যায়, ঠিক ততো সহজেই আবার ঝগড়া বাধিয়ে গালাগালির চূড়ান্ত করে ছাড়ে। এমন কি কয়েক ঘন্টা পূর্বের চেয়ে নেওয়া সাহায্যের কথাও অবলীলায় ভুলে যায়। ধারের নামে সাহায্যের খোঁটা দেয় কেউ। অপরজন সেই খোঁটার আঘাতের প্রতিশোধ নেয় তাকে 'ভায়ের ঘরের ঢেঁকি' বলে উল্লেখ করে। অকালে স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়ে যাওয়ার স্পর্শকাতর স্থানটিতেও আঘাত করতে ছাড়েনা। কারোবা রয়েছে 'ভাই ভাজ'- এর সংসার থেকে বিতাড়িত হওয়া এবং 'জোয়ান বেটা' তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার মতো দুর্বল দিক। বলাবাহুল্য এসবের কোনোটিই প্রতিপক্ষের অজানা থাকেনা। 'পুরুষালি ঢঙের' সৌষ্ঠবহীন চেহারার প্রতি বিদ্রূপ করে— 'হাঁলো মদ্দানি' বলে সম্বোধন করতে ছাড়ছেনা হয়তো কেউ একজন।

মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনার নিরিখে কিছু কিছু চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মানস-প্রবণতাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। বৃষ্টিমুখর নিঃসঙ্গরাতে তারুণ্যের রোমান্টিক অস্থিরতাতাড়িত নেত্যর মানসক্রিয়া ও তার বাহ্যিক প্রকাশে রয়েছে এর পরিচয়।

> উল্কিকাটা বাইশ বছরের মেয়েটা ঘুমোতে পারছিলনা। টিনের চালে বৃষ্টির মাতামাতি... বাইশ বছরের মেয়ের মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক গানের ভিড়,—বিশেষত বর্ষারাতে। কিন্তু সেতো বিদ্যাপতি পড়েনি, 'গীতাঞ্জলী'র নামও শোনেনি।...এমন কেন হচ্ছে সে বুঝেও বুঝতে পারছিলনা— কেন মনটা করকর করছে— ... কেন কে জানে তার কান্না পাচ্ছিল, কার উপর যেন অভিমান হচ্ছিল। টিনের চাল কাঁপিয়ে ওপরে বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ হাঁকছে আর চিকুর খেলছে থেকে থেকে। ১/৯০

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মানসস্বভাব গড়ে তোলায় তার পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিবেশের পরিবর্তন করে তার স্বভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভবপর। উপন্যাসের পরিসরে মনোবিজ্ঞানের এ তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন লেখক। নোংরা বস্তির কিশোরী আহ্লাদী স্ট্যানলির অনাথ আশ্রম থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে পনেরো দিন পর। কিন্তু এতোদিনে তার যে রুচি ও স্বভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা ধরা পড়ে তার আচরণে—

> আহ্লাদী বাড়িতে ঢুকেই বাপ-মাকে দেখে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিলে।...আহ্লাদী কাঁদলে, কিন্তু মাটিতে আছড়ে পড়লনা। জন্মদুঃখী মেয়েটার যে ভাইয়ের শোকেও এত ভাল কাপড় জামা ময়লা করবার ক্ষমতা নেই। ১/১০২

শুধু তাই নয়, অনাথ আশ্রমে বসবাসের সুবাদে সে যে এখানকার অন্য শিশুদের চেয়ে স্বতন্ত্র এটা প্রমাণ করতে চায়। সেজন্যে যখন তখন বইখাতা শ্লেট নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ার ভান করে। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের কারণগুলো জানাতে না পারলে পূর্ণতা আসেনা। তাই—

> আহ্লাদীকে আকাশ থেকে ধুলোয় নেমে তখন ডাকতেই হয়, 'শোন না শশী, সে রকম ইস্কুল তুই কখনো দেখিসনি।' ১/১৩৪

আবার, মা সব কথা বোঝেনা বলে মায়ের চেয়ে বাপের কাছে সেখানকার বিষয়গুলো বর্ণনা করে স্বস্তি পায় আহ্লাদী। তাছাড়া বাবা শ্রোতা হিসেবে ধৈর্যশীল, বিনাবাধায় বহুক্ষণ ধরে তার কাছে বর্ণনা করা যায়। মায়ের বিচার বুদ্ধিহীন শাসনে আহ্লাদীর শিশুমন বিরূপ হয়েছে। তার মার এবং তাড়না খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সে চলে গেছে পাঁচির ঘরে। মায়ের সঙ্গে পাঁচির সম্পর্ক ভালো নয়, তাই তার ঘরে যাওয়া মানে পরোক্ষভাবে মাকেই অগ্রাহ্য করা। এ ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক আরেকটি দিকের সন্ধান মেলে কালাচাঁদের আচরণের মধ্যে। শক্তিমানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সমর্থ না হয়ে মর্মনিহিত অবরুদ্ধ এ বাসনাটিকে প্রয়োগ করেছে সে ঘরে এসে, বাঁকাবুড়ি ও নিজের নির্দোষ বোনের উপর।

রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও এর ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করা যায় প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণআশ্রয়ী বক্তব্যের ইঙ্গিত। ইংলন্ডের অধিবাসী স্ট্যানলি বাঁকাবুড়ির মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে যেতে চাইলে অশান্ত কর্মকারের উক্তি—

> ভারতবাসীর মৃতদেহে তুমি বোধহয় তোমাদের জাতের মধ্যে প্রথম কাঁধ দিলে...। ১/১১৭

রাজনৈতিক সভা ও স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক বক্তৃতার অন্তঃসার-শূন্যতা লক্ষ করে এগুলো অশান্তর কাছে থিয়েটার-যাত্রাগানের সমতুল্য আনন্দদানের উপকরণ মনে হয়েছে। বক্তারা দেশের কথা বলেন, কিন্তু এর জন্যে কোনো মমতা অনুভব করেননা। তার মতে—

> তারা মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেছেন— দেশ উদ্ধার কর, দেশের উন্নতি কর, স্বরাজ দাবী কর, ...দেশের সত্যিকার উন্নতি করতে গেলে আগে দরকার পরসাহায্যপুষ্ট অকর্মণ্য

Dhaka University Institutional Repository

> পরগাছাদের সমূলে উচ্ছেদ। কিন্তু সেকথা বলার সাহস তো দূরের কথা ভাবার ক্ষমতাও তাদের নেই। ১/১০৯

তাই তার কাছে দেশের নামে একটি ভূখণ্ডের মুক্তির জন্যে চীৎকার চেঁচামেচি অবান্তর, 'স্বদেশীর হুজুক বুজরুকি...'। বক্তাদের বক্তব্যের বিপরীতে উচ্চারিত হয়েছে তার তীক্ষ্ণধার সমালোচনা। দেশের কথা, দেশের স্বাধীনতার কথা বলে বলে চীৎকার করলেই শুধু দেশের উন্নতি হয়না, দেশও স্বাধীন হয়না। আর দেশ যদি স্বাধীন হয়েই যায় গরীব মজুরের সুবিধে কতটুকু বাড়বে তাতে? তার মুখের ভাতের সঙ্গে পুষ্টিকর উপকরণ যোগ হবে কতটুকু? ঝুলির কদর্য নোংরা বস্তির শ্রী ফিরবে না তাতে। বরং তাদের 'জীর্ণ কুঁড়েকে ব্যঙ্গ করে' ধনীর প্রাসাদ জাগবে। 'তেমনি চলবে দেশজুড়ে অত্যাচারিতের মুমূর্ষু-বুকের উপর প্রবলের বিলাসনৃত্য'। তাহলে এই স্বাধীনতার মূল্য কি? রাজনৈতিক বক্তব্যসূত্রে তার সমাজতান্ত্রিক দর্শন-আশ্রয়ী মতামত ব্যক্ত হয়েছে স্ট্যান্লির সঙ্গে কথোপকথনে:

> —এতো হিন্দু?
>
> লোকটি এতক্ষণ মৃতদেহের কাদা ও রক্ত কাপড় দিয়ে মুছছিল। দাঁড়িয়ে উঠে স্ট্যান্লির দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, 'গরীব'।
>
> —হিন্দু তো?
>
> —গরীবের নিজস্ব কোন ধর্ম আছে সাহেব, কোন জাতি পরিচয়? তাকে কেউ হিন্দু বলে অভ্যাসে, কেউ তাকে খৃষ্টান করে খেয়ালে, সে-ও নিজেকে তাই বলে জানে।...
>
> এখানে হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্টধর্ম মানে ছেঁড়া ধুতি আর ছেঁড়া প্যান্টালুন, শ্মশান আর কবর, এর বেশি কিছু নয়। ১/১১৭-১৮

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের যে দুইটি ধারা — গান্ধীবাদী ও সাম্যবাদী আন্দোলন—*পাঁক* উপন্যাসে তার শেষোক্তটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সমাজ সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গান্ধীবাদী ধারাটি এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রেণীসচেতনতা ও শ্রেণীদ্বন্দ্বকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়েছিল সাম্যবাদী ধারাটি। বস্তিবাসীদের জীবনবাস্তবতার চিত্রাঙ্কনসূত্রে *পাঁক* উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় শ্রেণীসচেতনতার আভাস। অশান্ত কর্মকারের ভাব্যে ফুটে উঠেছে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত সম্পর্কে স্বয়ং লেখকেরই অভিজ্ঞতাপ্রসূত উচ্চারণ। কখনো অশান্ত কর্মকারের বক্তব্যের বেনামে, কখনো লেখকের সরাসরি উক্তিতে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব ও নিজের সাম্য ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে দেশ নয়, জাতি নয়—দুটো দল দেখেছে অশান্ত। অবিচার আর অন্যায়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের পুষ্ট করে চলেছে গরীব মানুষের কলজের রক্ত দিয়ে। এদের শ্রম, ঘাম ও রক্ত অপচয়িত হচ্ছে, অনাহারে অপুষ্টিতে প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, অথচ এই শ্রমিকশ্রেণী থাকছে শ্রমের মূল্যবঞ্চিত। উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন শ্রমজীবীর প্রতি মালিকশ্রেণীর সহানুভূতিহীন আচরণ ও বঞ্চনার স্বরূপ—

> বাড়ির কর্তার দৃঢ় বিশ্বাস ছোটলোক সব বেটা জোচ্চোর, একটু নজর না দিলেই ফাঁকি দেবে, বেটাদের ধর্মজ্ঞান মোটেই নেই। ...

Dhaka University Institutional Repository

> সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, ...তিনি যুক্তি দিলেন, দশআনার জায়গায় সাড়ে ন-আনা হলে যখন সে সন্তুষ্ট হয়না তখন তিনি কোন্ হিসাবে সময় নষ্ট করতে দেবেন তাকে? ১/৮১-৮২

কালাচাঁদের প্রতি নুলো-দামাদের আচরণের মধ্যে রয়েছে অকারণে, নিছক মজা পাবার জন্যে, শ্রমিক-নির্যাতনের সাক্ষ্য। দরিদ্র শ্রমিক এসব মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং এসবে তারা এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কথা ভাবতে পারেনা। নিজেদের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ প্রতিবাদী হলে তাকে তারা নিবৃত্ত করে নানাভাবে। মজুরীবঞ্চিত কালাচাঁদের প্রতি তার সহকর্মীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি থেকে মালিকশ্রেণীর ক্ষমতার ব্যাপকতার আভাস মেলেঃ

> ওরকম তেজ নিয়ে পয়সা উপায় করা চলেনা কালাচাঁদ, আমাদেরও যখন রক্ত গরম ছিল তখন আমাদেরও অমন তেজ ঢের ছিল, কিন্তু অনেক ঠেকে শিখেছি বাপধন, তেজ করলে তেজ নিয়েই থাকতে হয়, পেটে ভাত জোটে না। বাবুদের মর্জি বুঝে যদি না চলতে শেখ তাহলে কোনকালে কিচ্ছু হবে না। ...
>
> শিবু বললে, কাঁসারি-পাড়ার বাবুর কথা মনে আছে ষষ্ঠী? কি মার খেলে সত্য। তারপর নালিশ করে আদালতে কি নাকালটা হল! আবার তো সেই বাবুর হাতে পায়ে ধরে তবে রেহাই পায়। ১/৮৪

শুধু তাই নয়, উপন্যাসে দেখা যায়, মজুরীবঞ্চিত এই শ্রমিকদের ঘরে, তাদের নারীদের লজ্জা নিবারণের অতি সামান্য অথচ অতীব প্রয়োজনীয় কাপড়টুকু মেলেনা। অশান্ত কর্মকারের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে উচ্চারিত হয়েছে লেখকের শ্রেণীসচেতন মানসদর্শন। বস্তিবাসীর জীবনযাপনের নগ্ন বীভৎসতা, পঙ্গুতা, অন্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলে, তাদের মনে অসন্তোষ জাগাতে চেয়েছে সে। এ অসন্তোষই তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে আগ্রহের সৃষ্টি করবে। সে অনুভব করেছে— নিচের তলার এই মানুষদের অবস্থার পরিবর্তন না হলে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে— সব মিলিয়ে সামাজিক যে অসাম্য, তা দূর না হলে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন। আসলে রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা মানুষকে ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজের বিত্তহীন দুঃস্থ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন আসেনা, যদি তাদের কল্যাণ করার সত্যিকারের কোন তাগিদ না থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক। চলতি ভাষায় রচিত এই *পাঁক* উপন্যাসে তাঁর ভাষা, বাক্‌বিন্যাস, উপমা ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। তাঁর নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে কিছু কিছু বাক্যঃ

> সমস্ত রাত দুখী ভাইবোন দুটিতে ভিজে মেঝেতে ভিজে কাপড়ে জলের ঝাপটায় অর্ধেক নেয়ে জেগে কাটালে ভোরের প্রতীক্ষায়। ১/৮৯

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাকভঙ্গি কাব্যময় কিংবা অলঙ্কার বহুল নয়, তবু কোথাও কোথাও তাঁর ভাষা হয়েছে কারুকার্যময়। এ ক্ষেত্রে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস কিংবা সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে এর সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

উপমাঃ

ক. কথাগুলো কালাচাঁদের গায়ে আঙরার ছেঁকার মত ছ্যাঁক করে উঠল। ১/৬৮

খ. চাপাকান্না তার গলায় লোহার ডেলার মত ঠেলে উঠছিল। ১/৭৯

গ. ঘুম থেকে ওঠা ময়লা ময়লা চেহারার কল্পনা নেত্যর সর্বাঙ্গে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল। ১/৯১

ঘ. খবরের কাগজের জগৎ আর মুচি পাড়ার জগৎ বুধগ্রহ থেকে পৃথিবীর মতই পৃথক। ১/১০০

চ. বাড়িতে এখনো বালিকাম হয়নি, আগা পাস্তালা ভারা বাঁধা বিশাল নির্জন বাড়িটাকে যেন সদ্য হাসপাতাল- ফেরত পঙ্গুর মত অসহায় দেখাচ্ছিল। ১/১২৬

ছ. সজ্জিতা বারবিলাসিনীর মত যেন তার সমস্ত নকল ঔজ্জ্বল্যটুকু এই বাদলায় ধুয়ে গিয়ে কদর্যতা কুশ্রীতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ১/১৩৮

লক্ষণীয় যে, তাঁর ব্যবহৃত উপমা অতিচেনা বিষয় ও পরিবেশ থেকে নেওয়া।

উৎপ্রেক্ষাঃ

চোখদুটো অবাধ্য, ঘৃণায় তা থেকে আগুন ঠিকরে পড়ে। ১/১২১

অনুপ্রাসঃ

সন্ধানী সম্প্রদায়, ব্যর্থ প্রেমের ব্যথা, পৃথিবীর মতই পৃথক, কুৎসিত কৌতুকে, ভাতের ভিখিরি, সম্পদের সন্ধানে, বদ্ধবিলে, আঁস্তাকুড়-কুড়োনো, ভাত না পেয়ে ভেক, কদাকার কচ্ছপের মত।

সমাসোক্তিঃ

ক. সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশ জুড়ে যে সব কালো কালো মেঘের জটলা আরম্ভ হয়েছিল গভীর রাত্রে তারা বর্ষণ শুরু করে দিলে মুষলধারে। ১/৮৮

খ. এবার বর্ষায় মুচিপাড়া ও তার পাশের মেথর বস্তির অশোভন ও বোধহয় অনাবশ্যক জনসংখ্যা-সমস্যার মীমাংসা করার ভার নিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা ও তারই নিকট ও দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি-গোত্র। ১/১১৫

গ. একটা কেরোসিনের ডিবে বাতাসের অত্যাচারে নিবু নিবু হলেও কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিল। ১/১৩৩

কখনোবা চিত্রময় হয়ে ধরা দিয়েছে কোনো কোনো বর্ণনাঃ

ক.ভোরের কলকাতার একটা রূপ আছে, ঠিক রূপকথার পুরীর মত সুন্দর। তখনও রাস্তায় লোক চলাচল বেশি শুরু হয়নি, গাড়ি ঘোড়ার শব্দ নেই,—ঠিক এমনি সময়টা! ১/৯৫

Dhaka University Institutional Repository

খ. তারাহীন আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ১/১৩৩

কখনোবা লক্ষ করা যায় জটিল বাক্যের ব্যবহারঃ

ক. দরজাটা এত অপরিসর ও নীচু যে কোন সুস্থ সবল লোকের তার ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা নির্যাতন বিশেষ। সৌভাগ্যক্রমে যাদের এর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, তারা দু-এর কোনটাই নয়—অন্নাভাবে, অতিশ্রমে ও অত্যাচারে। ১/৭৬

খ. সে-ও উচ্চৈঃস্বরে তাদের পিতৃ-মাতৃকুলের উপাদেয় নানা ভোজের বন্দোবস্ত করতে করতে বাঁকা পা-দু' খানি থপ্‌থপ্ করে ফেলে কদাকার কচ্ছপের মত এগিয়ে আসছে। ১/৮০

ব্যবহার করেছেন অন্ত্যজস্তরের মানুষের আঞ্চলিকতাদুষ্ট ভাষা ও শব্দঃ

ক. তবে কেন দুজনে ফারাক থাক্ না। ১/৬৫

খ. ওই শতেক-খোয়ারীর সঙ্গে গলাগলি করতে যাব? ১/৬৫

গ. ভালোখাকীর খোঁটা শোন। ১/৬৬

ঘ. ভাত রাঁধতেই গতর নেই। ১/৬৯

ঙ. আহ্লাদীর মা একটা আখ্‌খুটে দজ্জাল মাগী। ১/৭৩

চ. সোয়ামিকে একটু ছেদ্দাযত্ন করেনা। খেটে খেটে হাড়-মাস ক্ষ্যায় করে ফেলেছে তা একটু দেখেনা। ১/৭৭

ছ. বামুন-কায়েতের মেয়ে শাপ-ভেরষ্টা হয়ে এসে জন্মেছে। ১/৭৭

জ. জোরে মাটিতে পা ঠুকে কালাচাঁদ বললে, 'আভি নিকালো'। ১/৮৬

ঝ. শশী এসে জিজ্ঞেস করলে: 'ঘরকে যাবিনি'? ১/৯৭

ঞ. এক মাসের মধ্যে পিরতিমের মত বৌ ঘরে আনছি। ১/১১৪

ট. গান থামিয়ে গম্ভীর সুরে আহ্লাদী বললে, 'বা! পেয়ার করছি তো'। ১/১৩৬

এছাড়াও কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনঃ

হাম-বড়ামি, চাল্লী বাড়ছে, অবকেশ, বেরব্‌কাট।

উপন্যাসের কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে লেখকের উপলব্ধিজাত বক্তব্যঃ

ক. নারী শুধু দু' দণ্ডের সৌখিন খেয়াল মেটাতে কোটি কোটি প্রাণীজীবনের অপূর্ণ প্রভাতে অন্ধকারে অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, স্তূপাকার বসন-ভূষণের আয়োজন—কোটি মানুষের রক্ত-জলকরা শ্রমের সাফল্য— মুহূর্তের আনন্দ দিয়ে অনাদৃত পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার সেই নারীরই মাত্র লজ্জা নিবারণের জন্যে একখানি পচা ময়লা পুরনো কাপড় বই জোটেনা। ১/৭৯

Dhaka University Institutional Repository

খ. যারা সারাদিন নিজের পেটের ধান্দায় ব্যস্ত থেকেও আরাম করে খাবার মত দু' মুঠো বেশি চালের যোগাড় করতে পারেনা, পরোপকার করবার প্রবৃত্তি তাদের বড় থাকে না; থাকলেও করবার ফুরসৎ তাদের নেই। ১/ ১০৫

গ. আমি বিশ্বাস করি, অনাবৃষ্টির দুর্দশা বন্যায় দূর হয়না— দেহের মত সমাজের বিস্ফোটক যখন প্রাণধারাকে দূষিত করে তোলে তখন তাকে সবলে চেপে বসিয়ে দিয়ে সমাজকে নিরাময় করা যায়না, আগে তার বিষকে দূর করতে হয়। ১/১৪২

অল্পবয়সের রচনা হিসেবে *পাঁক* উপন্যাসের দুর্বলতা ও ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন লেখক। মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই বুড়োর মতো গম্ভীর ও স্বল্পভাষী তিনকড়ি 'ঘানির গরুর অধম হয়ে' উদয়াস্ত, এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে এবং 'উপায় করে মন্দ নয়', অথচ মুচিপাড়ার মধ্যে 'সবচেয়ে ক্যাঙালীর হাল' তার, 'ন্যাংলা কুকুরের অধম' হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় তার সন্তানেরা, তার বৌয়ের হাতে দু' গাছা কেমিকেলের চুড়িও জোটেনা। কেনই বা তার ছেলেমেয়েদের ভিক্ষেয় বেরুতে হয় রোজ— এসবের উপন্যাসোচিত ব্যাখ্যা নেই। শুধু 'তিনকড়ির বৌটা নচ্ছার, একেবারে লক্ষ্মীছাড়া আখখুটে', 'আর তিনকড়ি একটা ধাঁধা', এ কৈফিয়ৎ ছাড়া। অশান্ত কর্মকার যেন লেখকের আদর্শের বাহক। সে তুখোড় মেধার অধিকারী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ লাভ করেছে, শুধু তাই নয়—আধুনিক য়ুরোপের প্রখ্যাত রাজনীতিক মনীষীদের সঙ্গে তর্কবিতর্কের মধ্যে তার যোগ্যতার সাক্ষ্যও বর্তমান— তাকে কেন দেশে ফিরে গাড়োয়ানি পেশা গ্রহণ করতে হয়— তা ঠিক স্পষ্ট নয়। এ চরিত্রটিকে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন লেখক। যদিও ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন যে, বস্তির মানুষের শরীর, মন ও পারিপার্শ্বিকতার কদর্যতা, গ্লানি, অপরিচ্ছন্নতা তাকে পীড়িত করে বলে তাদের জীবন ও অবস্থাকে সে বেছে নিয়েছে, তাদের অবস্থাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্যেই। তবু চরিত্রটির চিন্তা ও কার্যকলাপ— সবমিলিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হয়নি। তার চিন্তাধারা ও বক্তব্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রচারই প্রাধান্য লাভ করেছে। পাঁচি, কালাচাঁদ ও নেত্যকে নিয়ে কাহিনীর শুরু। বলা যায়— কাহিনীর মূল আকর্ষণ তারাই। তাদেরকে হঠাৎ গৌণ করে দিয়ে অশান্ত চরিত্রটিকে গুরুত্ব দান ক'রলেন লেখক, যার কোনো উপন্যাসোচিত বিকাশ নেই। কালাচাঁদ ও নেত্যর প্রেম কাহিনীর শুরু আছে, পরিণতি নেই। অথচ তাদেরকে নিয়ে কাহিনীর গল্পরস জমে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। উপন্যাসের গাঁথুনি দৃঢ়পিনদ্ধ নয়, বরং তা কিছুটা শিথিল এবং উপন্যাসোচিত পরিণামবিহীন। এর অপরিণত সমাপ্তি পাঠককে পীড়িত করে। চলতি-ভাষা-আশ্রয়ী এ উপন্যাসটির শুরুতে যেমন ঝরঝরে কৃত্রিমতাহীন ভাষা, শেষের দিকে আর তেমনটি থাকেনি। অশান্ত কর্মকারের শোষণমুক্ত নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নকল্পনার বর্ণনা রীতিমতো বক্তৃতাসুলভ রূপ লাভ করেছে। সংলাপ সর্বত্র স্বাভাবিক হয়নি। বস্তিবাসী অন্ত্যজস্তরের মানুষের মুখের ভাষায় স্বাভাবিকতা নেই, অনেকটাই যেন কৃত্রিম।

একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব, অন্যদিকে দুর্গতিজনিত ঘোর বাস্তবতার চাপ তরুণ লেখকদেরকে সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবন ও পরিবেশ চিত্রণে আগ্রহী করে তুলেছিল। সুকুমার সেন তাঁদের এই প্রবণতাকে 'বস্তিবিলাস' বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] তাঁদের সৃষ্ট উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে কলকাতার নগর ও বস্তিজীবন কেন্দ্রিক বিচিত্র রূপ ও জীবন বাস্তবতার চালচিত্র। গতানুগতিক সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

ধারায় পরিবেশ ও বিষয়ের দিকদিয়ে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন তাঁরা সবাই। বস্তির বেনামে সমাজের আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আনা চরিত্র ও পরিবেশ প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক* উপন্যাসের উপজীব্য। বাস্তবতার নামে বিকারগ্রস্ত জীবন ও পরিবেশ চিত্রণ তাঁর লক্ষ্য নয়। বস্তিজীবনকেন্দ্রিক এ রচনায় *কল্লোলের* প্রবণতা ধরা পড়েছে নিম্নতর জীবনচিত্র-অঙ্কনের মধ্যে। খুব কাছে থেকে দেখা বস্তিজীবন তাঁর বাস্তবতা-সৃজনের উৎস।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ভাবাদর্শ ও মার্ক্সীয় চিন্তা যুদ্ধোত্তর যুব মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। চারিদিকে হতাশা, ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির একটা বৃহৎ আশ্বাস বহন করে এনেছিল এই সমাজতন্ত্রের বাণী। *পাঁক* উপন্যাসের শেষ অংশে সেই আদর্শের বাণী ও গণআন্দোলনের সঙ্কেতধ্বনি উচ্চারণ করেছেন লেখক।[১০] এই সঙ্কেতধ্বনির ইঙ্গিত মেলে কালাচাঁদ সম্পর্কে সাইকেল আরোহীর উক্তির মধ্যেঃ

> ছোট লোকের আস্পর্ধা আজকাল ভয়ানক বেড়েছে। ১/৮৬

সমকালীন সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান অবলম্বন যৌনতার চেয়ে 'যন্ত্র সভ্যতার বিকলাঙ্গ রূপ' পরিবেশনের প্রয়াসই *পাঁক* উপন্যাসে লক্ষণীয়। মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক কালাচাঁদের প্রতিবাদে,অশান্ত কর্মকারের বক্তব্যে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত-প্রসঙ্গের ইঙ্গিত অথবা সরাসরি বক্তব্য এসেছে। বেকারত্বজনিত জীবন যন্ত্রণা, হতাশা— সব মিলিয়ে কালসচেতনতার ছায়াপাত এখানে লক্ষণীয়। *পাঁকের* প্রায় প্রতিটি চরিত্রই বিশ্বাসে, প্রেমে, উন্নত সুন্দর জীবনে—কোনো না কোনোভাবে পঙ্কিলতার বদ্ধপরিমন্ডল থেকে উত্তরণ-প্রত্যাশী। কলহ-বিভেদ সত্ত্বেও তাদেরকে স্নেহ, মমতা, প্রেম ইত্যাদি মানবিক গুণে রসে সমৃদ্ধ করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, এরাও মানুষ। উপন্যাসের বিষয়-পরিকল্পনার মূলে লেখকের নতুন এক জীবনবোধ জাগানোর লক্ষ্য ছিল কার্যকর। এর বাস্তবতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছে এর বিষয়-সংস্থাপন, চরিত্র সৃজন এবং ভাষাবিন্যাস। *পাঁকের* কাহিনী বিন্যাস ও বাস্তবতার রূপায়ণে তিনি আশ্চর্য রকমে উচ্ছ্বাসবর্জিত। এদিক দিয়ে তিনি সমকালীন অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র।

> অন্যান্য অধিকাংশ তরুণদের মত কখনোই অতিরিক্ত রোম্যান্টিক ন'ন। কবিতায়, গল্পে ও উপন্যাসে— সর্বত্রই জীবনকে মননের আলোকে স্পষ্ট করে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন যেন তিনি...জীবনের কদর্য ক্ষতের উপর রোম্যান্টিক প্রলেপ বুলিয়ে আত্মবঞ্চনা করতে চাননি।[১১]

তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়— আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনার মনোভাবের মধ্যে। রোমান্টিক-ভাবালুতার আশ্রয়ে জীবনের যন্ত্রণাকে গৌণ করে তোলেননি, তবে স্বপ্নকল্পনা-আশ্রিত এক ইতিবাচক আকাঙ্ক্ষা তাঁর রচনার পরিণতিতে লক্ষ করা যায়।[১২] কল্পনারঞ্জিত জগতের চিত্রায়ণের চেয়ে নির্ভেজাল বস্তুনিষ্ঠাই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব। 'উচ্ছ্বাসব্যাকুল ভাবাবেগের কালে' তাঁর আবির্ভাবকে 'ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন কোনো কোনো সমালোচক।[১৩] রুশবিপ্লবের মধ্যদিয়ে যে নবযুগের আহ্বানধ্বনি সূচিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে তার সুর শোনা গেছে *কল্লোল*গোষ্ঠীর রচনায়। এই গোষ্ঠীরই অন্যতম প্রতিনিধি প্রেমেন্দ্র মিত্র একে উচ্ছ্বাসবর্জিতভাবে তুলে ধরেছেন *পাঁক* উপন্যাসে। ভাবের দিক দিয়ে যুগাশ্রিত

Dhaka University Institutional Repository

রোমান্টিক ভাবালুতার প্রশ্রয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেলেও ভঙ্গির দিক দিয়ে এটি অভিনবত্বের দাবি রাখে। তাঁর বিশেষত্ব এখানেই, এখানেই তিনি কল্লোলীয়দের একজন হয়েও তাদের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য সামান্যই। কারণ তাদেরই মতো যুদ্ধোত্তর পরিবেশের বিপর্যস্ত মূল্যবোধজনিত হতাশাদীর্ণ মানস-লক্ষণকে ধারণ করেছিলেন তিনি। সংশয় ও হতাশাম্লান জীবনের যন্ত্রণা তাই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। কল্লোলীয়দের এক অংশের রচনার মধ্যে শহুরে কৃত্রিমতা ও বস্তির বাস্তবতার বিষয়টি ধরা পড়েছে বেশি করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র একেই আশ্রয় করেছেন তাঁর এ উপন্যাসে। এক সংযত-আবেগ তাঁর বিশেষত্ব হলেও বঞ্চিতপীড়িত অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর মমতা ও অন্তর্গূঢ় সমবেদনার সাক্ষ্য এই উপন্যাস। কল্লোলীয়দের মতো তিনিও নবযুগ সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং সে কারণেই দারিদ্র্য ও ক্ষুধা প্রপীড়িত বস্তি-মানুষকে আশ্রয় করেছেন তাঁর এ উপন্যাসে। তাঁদেরই মতো তিনি যে সামাজিক সংস্কারকে অতিক্রম করায় আগ্রহী হয়েছিলেন, তার প্রমাণ মেলে কালাচাঁদ এবং নেত্যর চিন্তা ও আচরণে। বয়সে বড়ো এবং বিধবা নারীকে জাতপাতের তোয়াক্কা না করে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়েছে কালাচাঁদ, আনুষ্ঠানিক বিয়ে শোভন নয় বলে পরোক্ষভাবে বিবাহহীন একত্র বসবাস করতে চেয়েছে নেত্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টির একদিকে যুগধর্মাশ্রিত হতাশা, বিষণ্ণতা; অন্যদিকে সচ্ছল সুন্দর স্বপ্ন-কল্পনারঞ্জিত ভবিষ্যতে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা— কল্লোলীয়দের সঙ্গে এ অভিন্নতার স্বরূপকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

পাঁক উপন্যাসের দুটি অংশ। প্রথম অংশে কালাচাঁদ, নেত্য ও পাঁচির কাহিনী, অন্যটিতে স্ট্যান্লির সেবা, ধর্মপ্রচার ও অশান্ত কর্মকারের নতুন পৃথিবী গড়ার আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। আপাতদৃষ্টে দুইটি পৃথক বিন্যস্ত কাহিনী মনে হলেও পাঁচি, কালাচাঁদ, নেত্য, স্ট্যান্লির ধর্মপ্রচার ও আহ্লাদীর নতুন জীবনে উত্তরণআকাঙ্ক্ষা এবং অশান্ত কর্মকারের সুষমবণ্টনময় নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নরঞ্জিত মানসভাবনা— সবকিছুরই মর্মনিহিত যোগসূত্র রয়েছে। লেখকের নাগরিক চেতনা ও নগরজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এ রচনায় স্পষ্ট। সাহিত্যরাজ্যে নতুন পথ খোঁজার নামে অভিনবত্ব আনয়নের চেষ্টা থেকেই এ উপন্যাস রচনার সূত্রপাত বলে উল্লেখ করেছেন লেখক।[১৪] এখানে তিনি বেছে নিয়েছেন যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার গা ঘেঁষে অবস্থিত দারিদ্র্যপীড়িত হতশ্রী এক বস্তিজীবনকে। জীবনাচরণের নামে মানুষের দারিদ্র্য-কুৎসিত বীভৎস যে জীবনরূপ, তা এখানে বিন্যস্ত। উপন্যাসে প্রতিনিধিত্বকারী কিছু কিছু চরিত্র রয়েছে, রয়েছে তাদের মধ্যেকার মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, গুণাগুণ এবং কষ্টলাঞ্ছিত এই জীবনকে ঘিরে দানা বেঁধে ওঠা নানান সংস্কার, দ্বন্দ্ব ও জীবনানুভূতির বিচিত্র দিক। অন্ত্যজস্তরবাসী হলেও এদের কারো কারো মধ্যে প্রতিফলিত হয় মর্যাদাবোধের লক্ষণ। দুঃখ এবং নৈরাশ্যের শিল্পরূপ পরিবেশন করলেও আশাবাদে উত্তরণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রায় সব গল্প-উপন্যাসের পরিণতির বিশেষত্ব। আবার বস্তি-বাস্তবতাসূত্রে বীভৎস চিত্রায়ণ সত্ত্বেও উপন্যাসের চরিত্রদের নিভৃত মানবিক দিকগুলোকে তিনি উপেক্ষা করেননি। কদর্য ও নৈরাশ্যস্পর্শী এ কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে তিনি ফুটিয়েছেন প্রেম ও প্রত্যাশার শতদল। দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণ সত্ত্বেও কালাচাঁদের তারুণ্যসুলভ স্বপ্নরঞ্জিত রোমান্টিক মনটুকু নষ্ট হয়নি। নেত্য এসে তার মনে সেই স্থান অধিকার করেছে পূর্ণ গৌরবে। নেত্য-কালাচাঁদের প্রেমঅধ্যায় সরলবিন্যস্ত নয়। সামাদ সর্দারের মতো খলনায়ক রয়েছে তাদের নিভৃত একাত্মতার পথ জুড়ে। বড়োকথা— নেত্যর বৈধব্য, জাতপাত, বয়স ইত্যাদি নিয়ে রয়েছে পাঁচির অসন্তোষ-আশ্রয়ী বাধা। তবু, মনের আশাকে বিসর্জন দেয়নি তারা। বরং চিন্তা ও আচরণে

Dhaka University Institutional Repository

লালন করেছে মিলন-পরিণতির স্বপ্ন। কদর্য জীবনের ছবি *পাঁক*, কিন্তু কদর্য চিত্রায়ণ, কিংবা যৌন পঙ্কিলতার কোনো সংকেত পর্যন্ত নেই এর কোথাও। দ্বিধাবিভক্ত এ কাহিনীর উভয় অংশের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেছে বস্তির মানুষের দুর্দশাময় জীবনবাস্তবতার চালচিত্র। ভাগ্য ও ভগবানের কাছে প্রবঞ্চিত এবং বিত্তশালীদের দ্বারা নিগৃহীত হলেও তারা এ সমাজেরই সদস্য। দরিদ্র এ মানুষদের মর্মস্থিত প্রেরণা, বিবেচনাশক্তি ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে তাদের দ্বারাই তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব— লেখকের এ আশাবাদই ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসের শেষে। উপন্যাসে রয়েছে দুঃস্থ মানুষদের জন্যে খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাহায্য সহযোগিতাদান এবং তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভ্রান্তধারণাপ্রসূত বিরূপ ব্যাখ্যাদানের আভাস। আছে শ্রমিকশোষণ ও নির্যাতনের খণ্ডচিত্র, শ্রমিকের অন্তঃপুরিকার বস্ত্রসংকটের লজ্জাময় অনুভূতির কথা। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের মনোভাব। খ্রিষ্টান মিশনারী কর্তৃক দরিদ্র মানুষকে ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে ক্ষীণ ও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। রয়েছে বিধবা এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে নির্যাতিতা হয়ে ফিরে আসা যুবতী নারীর নিভৃত হাহাকারের ইঙ্গিত। এ ছাড়াও উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্বসম্মত বিন্যাসের পাশাপাশি রয়েছে *কল্লোল*-প্রবণতার বিভিন্ন লক্ষণ।

*কল্লোল*কালের ভাষাহারা অমূর্তযন্ত্রণা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসলোককে অস্থির করেছিল, অচিন্ত্যকুমারকে লেখা তাঁর চিঠির ভাষ্যে এর পরিচয় মেলে।[১৫] যুদ্ধোত্তর-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রবণতাও যুক্ত হয়েছিল। তাঁর রচনার মধ্যে লক্ষ করা যায় আনন্দসাধনার বিপরীত কাললগ্ন এক ব্যথিত পীড়িত আত্মার আক্ষেপ। গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবননির্ভর কিছু কিছু রচনা থাকলেও শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনই তাঁর প্রধান আশ্রয়। নিরুপায় দারিদ্র্যের মধ্যে, বিশেষকরে বস্তির জীবনসংকটের মধ্যে বসবাসকারী মানুষেরাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থিত ও প্রকাশিত উপন্যাস *পাঁক* এবং এর পরে প্রকাশিত আরো দুটি উপন্যাস *মিছিল* (১৯৩৩) ও *উপনায়নে* (১৯৩৪) রয়েছে এর সাক্ষ্য। *কল্লোল*-লক্ষণের সুচারু বিকাশ ঘটেছে তাঁর এ তিনটি উপন্যাসেই। এর সহায়ক হয়েছে জীবন সম্পর্কে তাঁর সহৃদয় অভিজ্ঞতা। নানামুখী সংকটাশ্রয়ী দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী আত্মা বারবার কেমন করে লুটিয়ে পড়ে বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে, খ্রিষ্টান মিশনারীদের সহায়তায় সুস্থ সুন্দর জীবনের সন্ধান পাওয়া বস্তি শিশু আহ্লাদীর আশা ও ব্যর্থতার টানাপোড়েনের মধ্যদিয়ে তা দেখিয়েছেন লেখক। তবে, পঙ্কিলতার মধ্যে অবস্থান করলেও উপন্যাসের চরিত্ররা এরইমধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রেম, সংস্কার, উন্নতজীবনে উত্তরণ-অভিলাষ, বিবেকের তাড়না—সবমিলিয়ে তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় একধরনের মধ্যবিত্তসুলভ আবেগপ্রবণতা। নিঃসঙ্গ যৌবনের পীড়নে ঘুমহীন রাত অতিবাহিত করে, ভোর হতেই দ্বারদেশে কালাচাঁদকে দেখে নেত্যর অনুভূতি-প্রকাশের ধরনের মধ্যে তার পরিচয় মেলে। অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের মাত্রা বেশি বলেই তাদের যন্ত্রণা এতো অধিক। প্রেমের মাধুর্যে, উন্নত জীবন-পরিবেশে, পারিপার্শ্বিক পঙ্কিলতার বাইরে মুক্তির জন্যে আকুলতাও তাই তাদের এতো বেশি। কালাচাঁদের অস্থির অনুভূতির মধ্যে রয়েছে এরই পরিচয়। বস্তির জীবনবাস্তবতা সত্ত্বেও এখানকার মানুষগুলোর আবেগ, অনুভূতি, উপলব্ধির ধরন অন্ত্যজস্তরসুলভ আদিম নয়, বরং অনেকখানিই মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসিকতা-সুলভ।

যন্ত্রজটিল নগরজীবনের বিচিত্র মানুষের বাহ্যিক এবং মর্মস্থিত উভয়তলের সন্ধান করতে গিয়ে একদিকে তাদের পরিবেশ ও আচরণ, অন্যদিকে অন্তর্গভীরতলের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানে রত হয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

লেখক। বাস্তবতাআশ্রয়ী চিন্তাচেতনা, বক্তব্য এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর স্থির সংহত দৃষ্টি এ উপন্যাসে সরাসরি ধরা পড়েছে। উচ্ছ্বাসমুখর বাকভঙ্গির দ্বারা বক্তব্যকে তিনি আচ্ছন্ন করে তোলেননি কোথাও। তবে, তাঁর রচনায় এক ধরনের সাংকেতিক চেতনার রহস্যাভাস লক্ষ করা যায়। বাস্তবতাকে ঠিক রেখে তার উপর এই সাঙ্কেতিক রহস্যের ছায়া সঞ্চার করে দেন তিনি। ফলে, তা হয়ে ওঠে অপরূপ অর্থব্যঞ্জনাময়। সাহিত্যজীবনের প্রথম বিশ বছর প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কাল বলে মনে হয়। চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বেই কিছুটা ভাঁটার টান লাগে তাঁর সৃষ্টিতে। আর্থিক অনটনই এর প্রধান কারণ। তবু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ উন্মোচন হয়েছিল। তাঁর রচনায় বিদেশী প্রাকৃতবাদ, অর্থাৎ মানুষের চরিত্র তার সহজাত প্রবণতা এবং পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত— এই লক্ষণ বর্তমান। কিন্তু প্রাকৃতবাদী লেখকের নির্লিপ্তির পরিচয় তাঁর মধ্যে মেলেনা। তাঁর কথাসাহিত্য আপাতশুষ্ক, ভাবলেশহীন মনে হলেও গভীর অনুভূতিশীল এক কবিপ্রাণকে সেখান থেকে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। এ কবিপ্রাণতার প্রতিফলন অবশ্যই ভাষার আড়ম্বরে নয়, বরং সুকঠিন সংযমের মধ্যে, অল্পকথায় অথবা না- বলার ব্যঞ্জনাসৃষ্টির মধ্যে। সংযত বাকভঙ্গি, যুক্তিবাদিতা, সূক্ষ্মবিশ্লেষণ, আবেগবর্জিত ভাষা ও পরিমিত কথন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশেষত্ব। *পাঁক* উপন্যাসে তেমন করে লক্ষ করা না গেলেও অন্যান্য রচনার মধ্যে তিনি এক কুটিল নিয়তির প্রভাবকে তুলে ধরেছেন, যে কিনা নিপুণ পরিহাস-রসিকের মতো মানুষকে কিছু দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সুন্দর জীবনের এভাবেই নষ্টপরিণতি সূচিত হয়েছে তাঁর সেইসব রচনায়।পৃথিবীর মধ্যে সত্যসুন্দর কল্যাণময় স্বর্গরাজ্যের রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার মোহভঙ্গজনিত ওল্টানোরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে উপন্যাসে। সভ্য আবরণের তলায়ই নিহিত রয়েছে মানুষের কুৎসিত আদিম প্রবণতাগুলো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, গল্পে কি উপন্যাসে মানুষের জীবনের নঞর্থক অবস্থার উন্মোচন করেও পরিণতিতে ব্যক্ত করেছেন স্বপ্নকল্পনারঞ্জিত আশাবাদ।

অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের বৃত্তে অবস্থান করেও এক স্বাতন্ত্র্যধর্মী রচনাবিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্পনা ও কাব্যধর্মিতাকে অতিক্রম করে মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধিপ্রধান জীবনসমালোচনা ও নিয়ন্ত্রিত-আবেগের লক্ষণ তাঁর রচনার সর্বত্র বর্তমান।

সমকালের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন রয়েছে *পাঁক* ও *মিছিল* উপন্যাসে। *পাঁকে*, কাহিনীর মর্মগত ভাব ও চরিত্রের বক্তব্যে ফুটেছে লেখকের সাম্যবাদী চিন্তার রূপায়ণ। *মিছিলে* রয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের সাক্ষ্য।

সরাসরি কিংবা অর্ধস্ফুট ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে লেখকের উপলব্ধিজাত রাজনৈতিক বক্তব্য। স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের বক্তৃতা ও ক্রিয়াকর্মের অন্তঃসার শূন্যতার কথা উচ্চারিত হয়েছে *পাঁক* উপন্যাসে। *মিছিলে* রয়েছে, রাজনৈতিক পাকচক্রে পতিত স্বদেশী আন্দোলনের যুবক কর্মীদের জেলে যাওয়া, জেলজীবন শেষে অনিশ্চিত জীবন ও জীবিকার শিকার হওয়ার কথা।

পাঁকে বস্তির অন্নহীন, নৈতিকতাহীন, পঙ্কিল পরিবেশে জন্মে এবং বড়ো হতে হতেও আহ্লাদীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল উন্নতজীবনে উত্তরণের অভিলাষ। *উপন্যায়নের* বিনুও সংসারের বৈরী বাস্তবতায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, জীবনের নৈতিক-বিপর্যয় শেষে অমৃতানন্দে রূপান্তরিত হয়েছে মর্মনিহিত শুদ্ধজীবন

Dhaka University Institutional Repository

পিপাসারই কারণে। *কুয়াশায়*ও শুদ্ধ, সুন্দর, স্বস্তিময় ভবিষ্যৎ-জীবনের প্রত্যাশা ফুটেছে প্রদ্যোতের মানসভাবনায়।

দুঃসহ দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়ায় পঙ্কিল, কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেও *পাঁক* উপন্যাসের কিছু কিছু চরিত্রের আচরণে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন মানবিকগুণ। সংসারের অন্তহীন অভাবের মধ্যেও পাঁচি তার দুঃস্থ প্রতিবেশীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হারুমুচির জন্যে কষ্ট-সংগৃহীত 'দু'টি ভাতের দানা', একঘটি জল রেখে, তার নোংরা কাপড় চোপড় বদলে দিয়ে যেতো বাঁকাবুড়ি। *উপনায়নের* দরিদ্র নকুড় দাস চুরি জোচ্চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হলেও গৃহহীন বিনুকে আশ্রয় দিয়েছে অপরিসীম মমতায়। উভয় উপন্যাসেই লক্ষ করা যায়– দারিদ্র্যলাঞ্ছিত এই মানুষগুলোর নিভৃতদেশে বয়ে চলেছে মানবতার ফল্গুধারা।

এক একটা বিশেষ কালের অবয়বকে ধরে রাখার প্রয়াস লক্ষ করা যায় *পাঁক*, *মিছিল* ও *আগামীকাল* উপন্যাসে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক গণমানসে শ্রমজীবী-চেতনা জাগ্রত হওয়ার সময়ের সাক্ষ্য রয়েছে *পাঁক* উপন্যাসে। অসহযোগ আন্দোলনপর্বে তরুণ কর্মীদের বাস্তব জীবন-পরিস্থিতির চিত্র ফুটেছে *মিছিলে*। *আগামীকালে* রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার এক বিশেষ সময়ের রূপায়ণ– নগরসম্প্রসারণ-সূত্রে শহরতলির মানুষের জীবন-জীবিকার পটপরিবর্তন, উত্থানপতনের কথা। নগরায়নজনিত অসুস্থতাই এর প্রধান বিষয়।

সাংসারিক অনটনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে *পাঁক* এবং *উপনায়নে*–

> আর বাঁধা দেবার মতও কিছু নেই। ... দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচি খুঁজতে গেল।
>
> কি থাকবে আর ? তন্নতন্ন করে সব খুঁজে– খোঁজবার মধ্যেও তো ঐ ভাঙা কাঠের বাক্সটি– কিছু পাওয়া গেল না। না, উপায়, নেই, উপোস করে থাকতেই হবে। *পাঁক* ঃ ১/৭০
>
> "এক পয়সার লঙ্কা এনে দিতে পারিস বিনু ? ..." মা বিনুর সহিত কথা বলিতে বলিতে বাক্স খুলিয়া পয়সা বাহির করিতেছিলেন। পয়সা রাখিবার কৌটাটা কিন্তু উপুড় করিয়া ফেলিয়াও গোটাকতক কড়ি, কয়টা বোতাম, দুটি মাথার কাঁটা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না!
>
> বাক্সের তলাটা বৃথা হাতড়াইয়া দেখিয়া মা বলেন, "থাকগে আর লঙ্কা আনতে হবে নারে"। *উপনায়ন* ঃ ২/৬৫

বর্ষার মেরামতবিহীন বাসগৃহের বর্ণনায় সাযুজ্য লক্ষ করা যায় *পাঁক*, *উপনায়ন* এবং *কুয়াশা* উপন্যাসে–

> কালাচাঁদ ভিজে বিছানায়, গায়ে চালের ফুটো থেকে পড়া জলের ঝাপটা লেগে জেগে উঠল।
>
> ... অপ্রচুর-ছাউনি ফুঁড়ে প্রবল ঝাপটায় মেঝে বিছানা সব ভিজে গেছে– তবু এই ঘরটাই দুটোর মধ্যে ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

গেছিল। মায়ের প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যেই' আহ্লাদী সেখানে গিয়ে ডাকলে— 'মাসীমা গো'! আর *উপনায়নে*—

> যে কালীকে তাহার ভাল লাগে না, যাহার সঙ্গ হইতে নিস্কৃতি পাইলে সে এক রকম বাঁচিয়া যায়, মায়ের অন্যায় শাসনে হঠাৎ তাহারই স্বপক্ষে দাঁড়াইবার জন্য তাহার জেদ হয়। ... মার অন্যায় নিষেধের জন্যই কালীর সহিত মিশিবার একটা জেদ তাহার মনে রহিয়া গেল। ২/১০৪

নতুন জীবন-সংশ্লিষ্ট হয়ে আহ্লাদী উৎফুল্ল—

> খানিক সময় গেলে আহ্লাদী বলতে আরম্ভ করে, সেখানে বাবা, খুব ভাল, সকাল বেলা ঘন্টা বাজল, অমনি উঠলুম— মুখটুখ ধুলুম, তার পরেই খাবার— ... তারপর কাঠের ডেস্কে বসে—১/১৩৫

আর নতুন জীবন লাভের সম্ভাবনায়, যেখানে 'খেলার মাঠ, স্কুল, মন্দির আরো কত কি' রয়েছে, তার জন্যে উৎসাহিত বিনু। এ ছাড়াও কোথাও কোথাও রয়েছে বাকবিন্যাসগত সাযুজ্য—

> সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশ জুড়ে যে সব কালো কালো মেঘের জটলা আরম্ভ হয়েছিল গভীর রাত্রে তারা বর্ষণ শুরু করে দিলে মুষলধারে। *পাঁক* ঃ ১/৮৮
>
> বাহিরে অনেকক্ষণ হইতেই টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, হঠাৎ আকাশ যেন আর জলভার ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। *কুয়াশাঃ* ২/২১০

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. সুমিতা চক্রবর্তী, *প্রেমেন্দ্র মিত্র* (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী, ১৯৯৮) পৃঃ ৮।

২. রামরঞ্জন রায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক*, (কলকাতাঃ কুশপাতা, ১৯৮৬,) পৃঃ ১।

৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'ছেলেবেলা' *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৪ আগস্ট, ১৯৮৫, সুমিতা চক্রবর্তী, *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬ থেকে গৃহীত।

৪. ১৯২৭/২৮ সাল থেকে যখন কলকাতায় বসবাস করছেন পুরোপুরিভাবে, বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখতেন নিয়মিত। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আগ্রহের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল তাঁর এ সময়েই।

৫. রামরঞ্জন রায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫-৬।

৬. অবন বসু, 'তিন ঈশ্বরের কালিকলম' *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৪৮।

৭. ১৯২৩ সালে *সংহতি* পত্রিকায় শুরু হয়ে *বিজলী* পত্রিকায় ১৯২৪-এ এর প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বটি প্রকাশিত হয় *কালিকলমে* ১৯২৬ সালে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সম্পর্কিত তথ্য নেলোনি, দ্বিতীয় সংস্করণ— রিভার্স কর্ণার, ১৯৫৩। তৃতীয় সংস্করণ— চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী, ১৯৬৭। চতুর্থ সংস্করণ— নবপত্র প্রকাশক—১৯৭৯।

৮. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'সাহিত্যের নিয়তি' *আনন্দবাজার পত্রিকা*, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৭১। সুমিতা চক্রবর্তী, *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০ থেকে গৃহীত।

৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩।

১০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৩।

১১. ঐ।

১২. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, *বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

১৩. সমরেশ মজুমদার, *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।

১৪. 'লেখকের নিবেদন' *প্রেমেন্দ্র রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০) পৃঃ ৬০।

১৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোলযুগ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ বেদে

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ বেদে

*কল্লোল*যুগে যে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যস্রষ্টা *কল্লোল*প্রবণতাকে ধারণ ও তা প্রকাশের মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন তুলেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) তাঁদের অন্যতম। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার পালং থানার অন্তর্গত দাসর্তা গ্রামে ছিল তাঁদের আদি নিবাস। পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত ও জননী হেমলতা দেবী। এঁদের চারপুত্র ও তিনকন্যা— সবমিলে সাত সন্তানের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার পঞ্চম। পিতা নোয়াখালি জেলার সদরে আইনব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের জন্ম সেখানেই। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যপাঠ ও সৃষ্টির আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছিল। এ সব দিকে পিতার সাহচর্য ও সহযোগিতা তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, কৈশোরেই তিনি পিতাকে হারান। পিতৃবিয়োগের দু'বছর পর পরিবারের সবার সঙ্গে কলকাতায় তাঁর বড়ো ভাই জিতেন্দ্রকুমারের কাছে চলে যান। সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি হয়ে পরিচিত হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। তাঁদের দু'জনেরই সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয় এসময়ে। সাউথ সুবার্বন কলেজে আই.এ. ক্লাসে পড়ার সময়টিকে তাঁর সাহিত্য জীবনের 'উষালগ্ন'রূপে উল্লেখ করা যায়।[১] আই.এ. পাশ করে এ কলেজ থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯২২)। পিতার অবর্তমানে পাঠ্যাবস্থায় এবং নবীন উকিল বড়োভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকার এসময়টিতে সঙ্গত কারণেই তাঁদের সংসার চলতো আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে। ফলে অচিন্ত্যকুমারকে টিউশনি করে পড়াশোনার ব্যয়, হাত খরচ এবং লেখার উপকরণাদি সংগ্রহ করতে হতো। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন, পাশাপাশি আইন কলেজেও পড়তে থাকেন। মেধাবী ছাত্র অচিন্ত্যকুমার বরাবরের মতো সবকটি পরীক্ষায়ই কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। পড়াশোনা শেষ করে দু'তিন মাস আইন ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু ভালো না লাগায় তা ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্যে *বিচিত্রা* (১৩৩৪) পত্রিকার সম্পাদকের কাজ নেন। এরপর মুন্সেফের চাকরিতে যোগ (১৯৩১) দেন।

তারুণ্যের জোয়ারে অচিন্ত্যকুমার আই.এ. ক্লাশে পড়ার সময়েই লিখে যাচ্ছিলেন প্রচুর, কিন্তু সে লেখা কোথাও ছাপা হচ্ছিল না। শেষে জনৈক সহপাঠীর পরামর্শে নীহারিকা দেবী— এই ছদ্মনামে *প্রবাসী* (১৩০৮)তে কবিতা পাঠাতেই তা মনোনীত ও মুদ্রিত হয়।[২] পরে শ্রী অভিনব গুপ্ত— এই ছদ্মনামেও লিখেছেন *প্রগতি* (১৩৩৪) পত্রিকায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে *বাঁকালেখা* নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন তিনি। এটি প্রথমে হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৩২-১৯৩৫)-সম্পাদিত *মহিলা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরবর্তীকালে বরদা এজেন্সী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৯২২) হয়। এ সময় থেকেই *প্রবাসী*তে তিনি স্বনামে লেখা শুরু করেন, অন্যপত্রিকায়ও তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। *প্রবাসী*তে প্রকাশিত (১৩২৮-২৯) কয়েকটি কবিতা দিয়ে এভাবে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর বিচরণ শুরু হয়। এছাড়াও তিনি লিখেছেন *উত্তরা* (১৩৩২), *বিজলী* (১৩২৭), *ধূপছায়া* (১৩৩৪), *বিচিত্রা* ইত্যাদি অনেকগুলো পত্রিকায়। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র *কল্লোলে* আসেন একই সঙ্গে, একই সংখ্যায় (২য়

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যাঃ শ্রাবণঃ ১৩৩১) তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন দু'টি গল্পের মাধ্যমে। এ পত্রিকায় অচিন্ত্যকুমারের প্রথম প্রকাশিত লেখা 'গুমোট' গল্প। এরপর থেকে কয়েকটি সংখ্যা বাদে এতে তিনি নিয়মিতভাবে লিখে গেছেন। কখনো একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক রচনা। *কল্লোলের* সাহচর্যে এসে তাঁর লেখার উৎসাহ প্রাণলাভ করে। "কল্লোল' তাঁকে দিয়েছে সাহিত্যিকের মান, তিনি 'কল্লোল'কে দিয়েছেন ঘনিষ্ঠ প্রাণ'।[৩] *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাতটি গল্প, একত্রিশটি কবিতা, একটি মৌলিক ও একটি অনুবাদ উপন্যাস এবং প্রবন্ধ, জীবনী, নাটিকা, সমালোচনা, আলোচনা— সবমিলে আরো পাঁচটি রচনা। নিন্দা-প্রশংসার ঝড়ঝাপটা সহ্য করে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে গেছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও জীবনী। *কল্লোলের* সহসম্পাদক গোকুল নাগের মৃত্যুর পর ১৩৩২ সাল থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত *কল্লোলের* সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকেন এবং এর উন্নতির জন্যে নেপথ্যে থেকে অনলস শ্রম দিয়ে যান। এ পত্রিকার সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের সম্পর্কের সমাপ্তি হয় এর শেষ সংখ্যায় (পৌষঃ ১৩৩৬), 'সংকেতময়ী' কবিতা দিয়ে।

অচিন্ত্যকুমারকে নিয়ে নিন্দা-প্রশংসার ঝড় উঠেছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস *বেদে* (১৩৩৫) কে[৪] কেন্দ্র করে। বাইশ বছর বয়সে এটি রচনা করেন তিনি। *কল্লোল* পত্রিকায় (আশ্বিনঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৩ থেকে ভাদ্রঃ ৫ম সংখ্যাঃ ১৩৩৪-র মধ্যে) মোট ছয়টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে পরিচ্ছেদ— প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের নামকরণ হয় এর এক-একটি নারী চরিত্রের নামে। তাঁর এ উপন্যাসটি *কল্লোলের* বন্ধুদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। একে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নরওয়েজীয় সাহিত্যিক ন্যুট হামসুনের (১৮৫৯-১৯৫২) *প্যান* (১৮৯৪) উপন্যাসের প্রভাব-চিহ্নিত বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। ধারাবাহিকভাবে *কল্লোলে* প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের উপন্যাসের মধ্যে *পথিকের* পরে *বেদেকেই কল্লোল*-ভাবধারাপুষ্ট, যুগান্তকারী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাসরূপে অভিহিত করা হয়েছে[৫]। এ উপন্যাসকে 'যুগনির্দেশক' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যে যে, এর আঙ্গিক, বাচনভঙ্গী সবই নতুন। সংক্ষিপ্ত রূপকবাক্য, বর্তমান কাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ, সংস্কৃত তৎসম বানান ঠিক রেখে তদ্ভব ও বাংলা শব্দের বানানের সংস্কার ও সরলীকরণ— সবমিলিয়ে কাহিনীর মধ্যে রসাবেশ সৃষ্টির প্রয়াস— এসব লক্ষণে *বেদে* উপন্যাস সুচিহ্নিত। অচিন্ত্যকুমারকে 'নতুন পথের প্রণেতা' এবং *বেদেকে* 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকচিহ্ন' বলে উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের প্রকাশক। বিষয়বিন্যাস, রচনার বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে এটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।[৬] *বেদে* সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার নিজে বলেছেনঃ

> (নায়কের) সমস্ত প্রাপ্তিই তৃপ্তিহীন, সমস্ত তৃপ্তিই প্রাপ্তিহীন। যেন আরো কোনো রস আছে আরো কোনো অন্বেষণ। "বেদে"তে সেই পরম অন্বেষণের প্রথম সূচনা।[৭]

বক্তব্যবিষয়ে এবং প্রকরণে গতানুগতিক পদ্ধতির ব্যতিক্রম বলে এর ভাগ্যে জুটেছে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই। এ উপন্যাসে লেখকের সুপ্ত সম্ভাবনার লক্ষণ আবিষ্কার করে তাঁকে পত্রের মাধ্যমে অভিনন্দিত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।[৮] অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস মনোভাবের কথা জানা যায়— তাঁকে লেখা কবির ব্যক্তিগত সচিব অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-৮৬) চিঠিতেও।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

বেদে উপন্যাস উত্তমপুরুষে কথিত। কথকের গোটা চারেক নাম, কাঞ্চন তার একটি । মামা মামীর দ্বারা নিগৃহীত ও বিতাড়িত নয় বছরের মাতাপিতৃহীন কিশোর আশ্রয় লাভ করে এক অনাথ আশ্রমে। আশ্রমের একমাত্র মেয়ে সদস্য এগারো বছরের কিশোরী আহ্লাদি ও একদল কিশোরের সঙ্গে শুরু হয় তার আশ্রম জীবন। দিনে দিনে, তার উৎসুক কিশোর মনে প্রতিফলিত হয় আশ্রমের বিচিত্র জীবন ও তার অন্তর্গূঢ় ঘটনাবলী। সে অনুভব করে— গেরুয়া আলখাল্লাপরা এই কিশোরদের মাঝখানে আহ্লাদি যেন 'গেরুয়া মাটির দেশে' এক 'রজতলেখা নদী'। এদের নিয়ে স্কুল বসে, কাঞ্চনের ভাষ্যে— 'আত্তাবল', যেখানে পড়ার চেয়ে মার খাওয়াই প্রধান। তারপর মাটি কোপানো, চারা লাগানো, মিছিল করে ভিক্ষায় বের হওয়া— এর সবই করতে হয় আশ্রমে। এতোকিছুর পরও প্রাণচাঞ্চল্যে বাধা পড়েনা তাদের। আহ্লাদিকে ঘিরে কাঞ্চন ও নটরু উদ্দীপিত হয় অনাস্বাদিত এক অস্ফুট অনুভূতিতে। ওর জন্যে কষ্টার্জিত পয়সায় তারা কেনে পুঁতির মালা, কিংবা পুতুল। এ অনুভূতির সূত্রে নিজেদের মধ্যে জাগে ঈর্ষা, সংঘটিত হয় মারামারি। তবু অলক্ষ্যে অজান্তে, একান্ত নিভৃতে এদের সবার মধ্যে জন্ম নেয় একাত্মতা। যার মূল নিহিত মাস্টারের প্রতি বিতৃষ্ণার মধ্যে। মাস্টারের নিষ্ঠুরতা, তার গোপন যৌনাচার, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও মৃত সন্তান প্রসব করে আহ্লাদির মৃত্যু, আশ্রম ছেড়ে কাঞ্চনের বেড়িয়ে পড়া— এভাবে শেষ হয় তার জীবনের প্রথম অধ্যায়। এরপর মকবুল নাম গ্রহণ করে মুন্সীর সেলুনে কাজ নেয় সে। মুন্সী তাকে নানাভাবে প্রলোভিত করে, ধর্মান্তরিত হয়ে তার 'ভাজি'র সঙ্গে 'সাদি' হলে কাঞ্চনের ভাগ্য ফিরে যাবে। তাকে 'ডিপুটি' বানাবে মুন্সী। এখানে কাজ করতে করতে এক বাবুর সুনজরে পড়ে সে, তিনি এলেই বকশিশ মেলে তার। মুন্সীর প্রতারণায় জমানো টাকা খুইয়ে পথে পথে ঘুরে অবশেষে এক রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ নেয় সে। এখানে, কর্তার শ্যালক এবং দোকানের ক্যাশিয়ার— বিশে— তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করে, কষ্ট দেয়, বকশিশের পয়সা কেড়ে নেয়, মারধোর করে। শেষে সেলুনে পরিচিত হওয়া সেই বাবু তাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। 'বাবু' হয়ে যান দাদাবাবু। দাদাবাবুর বোহেমীয় স্বভাব কাঞ্চনকে আকর্ষণ করে। তাঁর সহায়তায় সে স্কুলে ভর্তি হয়। এভাবে তার পাঁচটি বছর কেটে যায়, বি.এ. পাশ করে সে। কাজের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে গাঁয়ে এসে কাজ নেয় এক মোড়লের জমিতে। অস্থির স্বভাবের কারণে এ কাজ ছেড়ে আসে আবার শহরে। নেয় মোটর ড্রাইভারের কাজ, অরুণ ও মুক্তার গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কাজ। তারপর মেসের বাসিন্দা হয়ে দেখে— বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত পাঠানোসহ শিক্ষিত বেকার যুবকদের জীবিকার নামে জীবন ধারণের বিচিত্র প্রয়াস। বস্তির নারী, বিধবা পুতলির পানদোকানের আয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলে কাঞ্চনের। সহপাঠিনী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, মৈত্রেয়ী ঘর বাঁধতে চায় তাকে নিয়ে। কিন্তু বোহেমীয় কাঞ্চন তাতে বাঁধা পড়ে না। এভাবেই ঘটে তার ভেসে চলা আর ডাঙায় ঠেকা, ফের ভেসে চলা।

বেদে উপন্যাসের ছয়টি অংশ। বিভিন্ন সময়ে নায়কের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত ছয়জন নারীর নামে অংশগুলো বিন্যস্ত। ছয়টি অংশের মধ্যে 'বাতাসি'র কাহিনীটি শুধু গ্রামকেন্দ্রিক। অন্যগুলোর আশ্রয় নগর কিংবা নগরসংশ্লিষ্ট এলাকা। 'আহ্লাদি'তে অনাথ আশ্রম। একে ঘিরে নানা চিত্র, চরিত্র ও লেখকের বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে। 'আসমানি' অংশে রয়েছে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কাঞ্চনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা,

Dhaka University Institutional Repository

তার উপর দাদাবাবুর বোহেমিয়ান চরিত্র-প্রভাবের সংকেত। 'মুক্তা' অংশে নগর, নাগরিক ব্যস্ততা ও বস্তির নিদারুণ জীবনবাস্তবতার পরিচয়। 'বনজ্যোৎস্না'য় মেসের বাসিন্দা— কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবকের হতাশাদীর্ণ অবস্থার চিত্র। 'মৈত্রেয়ী'তে আছে সম্ভাবনাময় যুবকের ব্যর্থতা, তার ঝরে যাওয়ার কথা, আবার রয়েছে অন্য কোনো এক যুবকের জেগে ওঠার স্বপ্নকল্পনা, আশাময়তার উদ্ভাস। এর ছয়টি অংশের প্রতিটি যেন এক একটি ছোটগল্প। সবগুলোর মধ্যে যোগসূত্র নায়ক নিজে। কদাচিৎ দু'একটি চরিত্রকে অন্য অংশে দেখা যায়। প্রতিটি পর্যায়ে নায়কের চরিত্রের বিশেষত্ব ও ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হয়েছে।

কাঞ্চনের পিতামাতা, জন্ম-পরিবেশ কিছু জানা যায় না। সে স্রোতে ভেসে আসা এক শ্যাওলা-সদৃশ মানুষ। ফলে কোথাও সে স্থির হয়নি। অবস্থার চাপে নয় থেকে একুশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনের বিচিত্র পর্যায়ে বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছে কাঞ্চন। নিজে অন্তর্মুখী স্বভাবের হলেও বিচিত্র পরিবেশের মানুষ ও তাদের মানসিকতা তার অভিজ্ঞতার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্ষণিকের জন্যে সে থেমে পড়েছে, আবার ভবঘুরে স্বভাবের টানে ভেসে পড়েছে অনির্দেশের স্রোতে। অনাথ আশ্রমের সদস্যরূপে শৈশব কৈশোরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বিড়িতে টান দিয়ে ধূমপানের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে সে নটরুর কাছে, 'পাঁজরা দু'খানা খসে পড়তে' চাইলেও দমিত হয় না, বরং সঙ্গীদের কাছে বাহাদুরি লাভের কৈশোরক উৎসাহে এ প্রয়াস অব্যাহত রাখে। অনাথ আশ্রম থেকে বেরিয়েও , জীবনের নানান চালচিত্র দেখতে দেখতে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করে চলে সে। বিভিন্ন স্তরের মানুষ— বিশেষত, নারী হয়েছে তার রোমান্টিক মানসের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৈশোর থেকে পর্যায়ে পর্যায়ে অহ্লাদি, আসমানি, বাতাসি, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না, মৈত্রেয়ী—বিচিত্র পরিবেশ ও স্বভাবের নারীরা এসেছে তার জীবনে। এদেরকে আশ্রয় করেই আকর্ষণ, আকর্ষণজাত ঈর্ষা এবং ঈর্ষাজনিত প্রতিহিংসা- বৃত্তি— নানামাত্রিক অনুভূতিতে আলোড়িত হয়েছে তার অন্তর। কারো সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও সে নিজে নিজে রোমান্টিক ভাবাবেগে স্বপ্নচারী হয়েছে বনজ্যোৎস্না ছাড়া তাদের সবাইকে ঘিরে। এদের শরীর কিংবা মনের এতোটুকু স্পর্শলাভের জন্যে তার অন্তহীন প্রয়াস। ঈর্ষায়-বিদ্বেষে সে জ্বলেছে, ক্ষিপ্ত হয়েছে যথাক্রমে নটরু, টিনুদা, নুলো, অরুণ ও গোবিন্দের প্রতি। নারীদের কাউকে কাউকে কামনা করেছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা কেউ সংসার রচনার বাসনা ব্যক্ত করলে তা প্রত্যাখ্যান করেছে সে নিজে। উল্লিখিত ছয়জন নারী ছাড়াও তার আরো কয়েকজন নারীর সান্নিধ্য লাভের কথা জানা যায়। মরানদীর পাড়ে পাহাড়ী ভুটিয়া মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে ঘুমোবার কথা উল্লেখ করেছে সে। মুন্সীর 'ভাজি'— পরনে কলমিফুলি শাড়ি, দু'হাতের তালু জুড়ে মেহেদির রঙ মাখানো আমিনা নামের এগারো বছর বয়সের এক কিশোরীকে কল্পনা করে সে পুলকিত হয়েছে। তাকে নিয়ে সংসার রচনার স্বপ্ন দেখে দেখে পয়সা জমিয়েছে। মুসলমান হবার জন্যে কাঞ্চনকে তাগিদ দিতে মোল্লা লোক পাঠিয়েছিল শুনে যদিও তার 'গা-টা ছমছমায়', তবু অনুপস্থিত আমিনার সলজ্জ আকর্ষণ তাকে রোমাঞ্চিত করেছে। মুন্সীর হাতে জমানো টাকাগুলো তুলে দিয়ে সে কল্পনা করেছে—

আমিনা জেনে নিশ্চয়ই গর্ববোধ করবে যে তার দুলহা ফকির নয়। ১/১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ছপ্পুর সাতনম্বর বউকে রাতে পাহারা দিতে গিয়ে তাকে নিজের পাশে শুতে আহ্বান করেছে—

মাটিতে শুলে ব্যাররাম হবে বিবি, খাটে উঠে আয়। ১/১৫৩

পুতলির ঘরে শুয়ে ঘুমন্ত পুতলির মধ্যে 'বিদেশিনী বিদেহিনী প্রিয়াকে আবিষ্কার' করেছে সে। কিন্তু তার হৃদয়ানুভূতির শেকড় নিহিত রয়েছে কৈশোরের অস্ফুট প্রেমের মাটিতে। জীবন ও জীবিকার পথপর্যটনের ফাঁকে ফাঁকে হতাশা-যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলেই একাধিকবার তার মানসপ্রত্যাবর্তন হয়েছে সে-ই অতীত নারীর কাছে— যেখানে, আন্তরনিভৃতে তার কাম ও প্রেমের স্ফুরণ— 'চাইছি আহ্লাদির সেই বালিশটা....', অথবা 'আমার পাশে পাহাড়ী মেয়ে নয়— আহ্লাদি'। অস্থির এক ভবঘুরে স্বভাবের টানে ভেসে চলাই যেন তার নিয়তি—কখনো অনাথ আশ্রমের সদস্য, কখনো রেস্তোরাঁর বয়, সেলুনের কর্মচারী, গৃহভৃত্য, শ্রমিক, বস্তিবাসী, রাজমিস্ত্রী, ট্রামকন্ডাক্টর, ট্যাক্সীড্রাইভার, কখনোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইত্যাদি আরও নানানরূপে। ক্ষুদ্রজীবনে সে অনুভব করেছে বৃহত্তর জগতের বিচিত্র আস্বাদ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও মানসপর্যটনের ভিতর দিয়ে তার মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের স্তরগুলো দেখানো হয়েছে উপন্যাসে। স্কুলে, সহপাঠী বিকাশের সাহচর্যে এসে তার কাছে উন্মোচিত হয়েছে নির্দয় জীবনবাস্তবতার বিভিন্ন দিক। বি.এ. পাশ করার পর বেকারত্ব, মোড়লের জমিতে কর্মলাভ— ইত্যাকার বিচিত্র পর্যায় ও পরিবেশের প্রভাবে তার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও আচরণ ক্রমেই পরিবর্তিত হয়েছে। ছন্নছাড়া স্বভাব তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে আবার শহরে, শহরের বস্তিতে। কখনো মেসে। পরিচিত হয়েছে সে মেসের সদস্য— শিক্ষিত বেকার যুবকদের অভাবলাঞ্ছিত জীবনের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠিনী মৈত্রেয়ী তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন রচনা করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। কাঞ্চনের অনিকেত ভেসেচলা জীবন এবং ক্ষণিকের জন্যে জড়িয়ে পড়া নারীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। এভাবে সঞ্চিত হয়েছে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অবশ্য, এ অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজস্তরের মর্মমূল সন্ধানে সচেষ্ট হয়নি সে, তার পরিবর্তে ভাসমান নির্লিপ্ত অবলোকন-লক্ষণই তার মধ্যে বিদ্যমান থেকেছে বরাবর।

শৈশবে, বয়স যখন মাত্র সাত, মায়ের কাছে থাকতেই আহ্লাদি পরিচিত হয়েছে জীবনের এক অন্ধকার দিকের সঙ্গে। জীবিকার অনিবার্য অনুষঙ্গরূপে মাস্টারের আনুকূল্যে চড়কতলায় খোলার ঘর ভাড়া করে বসবাস করতে দেখেছে জননীকে। তার মৃত্যুর পর অপূর্ণ কৈশোরেই সে নিজেও পরিণত হয়েছে মাস্টারের যৌন- উপাদানে। ফলে, শৈশবাবধি যৌনতাই তার জীবনের অন্যতম প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী কিশোর নটরু এবং কাঞ্চনকে একই সঙ্গে সে প্রেমে আকর্ষণ করেছে, চুম্বন করেছে। এদের কারো কাছ থেকে কোনো উপহার পেলে খাবার পরিবেশন করার সময়ে পক্ষপাতিত্ব করেছে তার প্রতি। অবশেষে মাস্টারের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতে করতে তার পরিণতি নির্ধারিত হয়েছে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও মৃত্যুতে। কিন্তু আহ্লাদি চরিত্রের এ-ই একমাত্র ধর্ম নয়। স্নেহ-মমতার এক সহজ সুলভতা তার স্বভাবের বিশেষত্ব। অপূর্ব এক দরদী হৃদয় নিয়ে আশ্রমে নবাগত কাঞ্চনকে সে সহায়তা করেছে। নিজের বালিশ তাকে দিয়েছে ঘুমোবার জন্যে। তার 'পচা' নামকে সে উচ্চারণ করেছে 'কাঁচা' বলে। কাঞ্চনের সঙ্গে নটরুর মারামারির এক পর্যায়ে চড় খেয়ে তার চোখে জল এসেছে, তবু গাঁদার পাতা থেঁতলে চেপে ধরেছে প্রহারে আক্রান্ত কাঞ্চনের ঘায়ের মুখে।

Dhaka University Institutional Repository

অনাথআশ্রম সংশ্লিষ্ট স্কুলের একমাত্র শিক্ষক, উপন্যাসে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে 'মাস্টার' বলে। তত্ত্বাবধানের নামে কারণে-অকারণে ছেলেদের প্রহার করা যেন তার দায়িত্বেরই অঙ্গীভূত বিষয়। তার নিষ্ঠুরতার সাক্ষী মেলে— 'নটরুর নাক কেটে গেছে তবু মাস্টার ক্ষান্ত হয় না'— কাঞ্চনের এই স্বগত উক্তিতে। দুটি উদাস চোখের করুণা বর্ষণ করে এই মানুষটি একদিন গঙ্গার ধারে কাঞ্চনের হাত ধরেছিল। তার নিষ্ঠুর ও নির্যাতক স্বভাবের পরিচয় পাবার পর কাঞ্চনের কাছে তার ভাবমূর্তি বদলে যায়। 'আহ্লাদি' অংশের চার জায়গায় অনাথ আশ্রমের এই ছেলেদের প্রতি তার নির্দয় আচরণের উল্লেখ রয়েছে। তার যৌন মানসতার পরিচয় সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসের স্থানে স্থানে। স্বল্পভাষী কেষ্টর ভাষ্যে জানা যায়ঃ

> মাস্টারের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। [আহ্লাদির] জ্বর আসতে না আসতেই ডাক্তার। আর নন্তু পুরো একটা বছর কাশছে। ১/১৩৮

গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত এক নারীর সঙ্গে লালসা চরিতার্থতা শেষে তার কিশোরী কন্যার সঙ্গেও একই আচরণ করতে এবং পরবর্তীকালে অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসবোন্মুখ অবস্থায় আশ্রমের ভোবার ধারে ছোট্ট এক নিঃসঙ্গ ঘরে তাকে ফেলে পালিয়ে যেতে এই মাস্টারের বাধেনি।

উপন্যাসে রয়েছে জেদি ও দুরন্ত কিশোর নটরু। আশ্রমের বিরূপ পরিবেশের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় তার মনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। মাস্টারের অনুপস্থিতিতে তার হুঁকোয় টান মারা, সামান্যতে রেগে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করা, মাস্টারের প্রহারের জবাবে লুকিয়ে তাকে মুখ ভ্যাঙচানো কিংবা তার সামনেই 'প্রকৃতির আহ্বানে' সাড়া দেওয়া, অন্ধভিখিরির সারাদিনের রোজগার আত্মসাৎ করে ফেলা— এইসব কিছুর মধ্যে রয়েছে তার বিকাশবিহীন অবরুদ্ধ কৈশোরক স্বভাবের প্রতিক্রিয়ার পরিচয়। আহ্লাদিকে ঘিরে জাগে তার অপরিপক্ব বয়সের অস্ফুট বাসনা। কাঞ্চনের প্রতি করে চলে ঈর্ষা-বিষ-জর্জর আচরণ এবং এরই সূত্রে এক পর্যায়ে বিতাড়িত হয় সে আশ্রম থেকে। আছে নন্তু, কেষ্ট, বসন্ত, হারান— যারা ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে মাস্টারের নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে।

স্নেহ-মমতার নিভৃত প্রস্রবণ ছাড়াও যার স্বভাবগভীরে রয়েছে এক অপরূপ যাযাবরবৃত্তি— সেই মানুষটি কাঞ্চনের দাদাবাবু। তিনি সেলুনে চুল ছাঁটতে কিংবা রেস্তোরাঁয় চা খেতে এলে, তাঁর গৃহভৃত্য নিযুক্ত হয়ে কিংবা কখনো ভবঘুরে জীবনের সঙ্গী হয়ে তাঁর নিভৃতচারী সত্তাটিকে খুঁজে পায় কাঞ্চন। বোহেমিয়ান স্বভাবের টানে মাঝে মাঝেই কলকাতা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু অস্থির স্বভাব তাকে কোথাও স্থিরতা দেয়না। কাঞ্চনের ভাষ্যে জানা যায়—

> কোনো জায়গায়ই দাদাবাবু দু-তিনদিনের বেশি জিরোতে পারে না। তিন দিনের দিনই বলে– তল্পিতল্পা গুটো, মকবুল। এ-জায়গাটায় ভারি ধুলো।
>
> অন্য জায়গা আবার বেশি বিজ্ঞি, কোথাও বা লোক বেশি নেই বলে ভালো লাগেনা– বড্ড বেশি ফাঁকা। ১/১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ি অঞ্চলে বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করা, এই পাখি, পয়সা আর লালপানির বিনিময়ে পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গলাভ করা— এইভাবে দিন কাটে দাদাবাবুর। বোহেমীয় মানুষের কাছে সমাজপ্রচলিত যৌননীতির কোনো মূল্য নেই, তাই দাদাবাবু এই রকম পরনারী-সংসর্গে মানসিক বিরোধ অনুভব করেন না। তাঁর এই মানসতার প্রভাব পড়ে কাঞ্চনের মনের উপর। তার জীবনের উপরেও প্রভাব ফেলে দাদাবাবু ও তার নিভৃত আত্মার সঙ্গিনী মাধুর আচরণ। হাতের উপর হাত রেখে বুকের মধ্যে 'কথা কইতে না পারার অকথিত কান্না' পুষেও দুজনের বাহ্যিক স্থান পৃথকত্বে, দূরত্বে। পরবর্তীকালে তিনি আত্মীয় পরিজন ও দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাঞ্চনকে বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ার টাকা পাঠানো ছাড়া আর কোনো বন্ধনের তোয়াক্কা করেননি। দাদাবাবুর বোহেমিয়ান স্বভাবের এইসব অনুষঙ্গ কাঞ্চনকে চালিত করেছে অধিকতর ছন্নছাড়া, ভেসে-চলা জীবনের দিকে।

বিকাশ ও সৌম্যের চরিত্রে বিন্যস্ত হয়েছে লেখকের স্বকালবিদ্ধ তারুণ্যের স্বপ্নভঙ্গ ও হৃতবিশ্বাসপ্রসূত নেতিবাদী মনোভাব। মাতৃহীন শৈশবে বিকাশ দেখেছে— ক্ষুধার তাড়না সইতে না পেরে ভিখিরি বাপ তার ছোট বোনকে বিক্রি করে দিয়েছেন, পয়সার জন্যে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে গিয়ে অবশেষে ঠাঁই পেয়েছেন মর্গে। অসংখ্য মৃতের সারির মধ্যে বাপকে খুঁজে বের করতে পারেনি সে। যৌবনে প্রেম এসেছিল, কিন্তু জীবিকা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে সে প্রেমের আয়ু কতোক্ষণ! প্রেমের সাতটি বছর অতিক্রম করেও প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলে তার মানসিক পরিণতি রূপ নেয় নেতিবাদে। লেখকের মর্মশায়ী *কল্লোল*প্রবণতার লক্ষণ ধরা পড়েছে বিকাশের উক্তিতেঃ

> পৃথিবীতে তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা আছে, ভাই— জন্ম, প্রেম আর ভগবান। আর সবচেয়ে ঘৃণা করি— বিবাহ আর মৃত্যু। এমন কুৎসিত জিনিস দুনিয়াতে বুঝি নেই। ১/২২৪

নিজের সম্পর্কে উক্তিতেও ধরা পড়েছে নেতিবাদস্পৃষ্ট তার মানসপ্রতিবিম্বঃ

> বিকাশ বোস, একটা মাগী-প্যাটার্নের চেহারা, হেলে-পড়া হাসনুহানার শাখাটি, বুকের ভিতর ধোঁয়া না-সেঁধোয় সেই ভয়ে ধীরে-ধীরে চুরুট ফোঁকেন, ডান দিকে সিঁথি কাটেন, গাল পর্যন্ত আমেরিকান জুলপি রাখেন— দেখতে পারি না। ঘেন্না লাগে। মেয়ে মানুষের চুলের গন্ধ শুঁকে বমি আসার মতো। ছো! ১/২২৪

বি. এ পাশ করার পর কর্ম নেই, মোট বইবার মতো শক্তিও নেই শরীরে, মনের মধ্যে 'ঘুণ'।

কাঞ্চনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী সৌম্য। লোকান্তরিত পিতার রেখে যাওয়া রিক্ততা, আর নিরবিচ্ছিন্ন অভাবের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে তাদের চলে অনটনময় দিনাতিপাত। রাস্তার গ্যাসের আলোয় গ্রন্থের মধ্যে চোখ রেখে সৌম্য দেখে দূর নরওয়ের সুনীল ফেনিল জল-তরঙ্গের স্বপ্ন, দেখে আফ্রিকার সেই গৈরিক তাপসী বন্ধ্যা মাটির স্বপ্ন, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত নির্যাতিত বন্দী বীরের সে সন্ধান করে ফেরে— তার দিদির পাঠানো ত্রিশ টাকার থেকে উনত্রিশ টাকায়ই কেনা বইয়ের মধ্যে, এই বই বিক্রি করে, কখনো ধার করে, সে কেনে ফের নতুন বই— 'এ বই ওর বই নয়; যেন বউ! সোনা বউ'! অভাব আর অনিয়মজনিত অসুস্থতায় বিপর্যস্ত সৌম্যকে কাঞ্চনের কাছে মনে হয়েছে 'ও যেন ভাগ্যের হাতের বাজে রসিকতা, ও যেন অকারণ'। নোনাধরা দেয়ালের হতচ্ছাড়া এক ঘরে— সারি সারি, রাশি রাশি

Dhaka University Institutional Repository

সাজানো বই, শুধু বই। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি,— যেন রুশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের, ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালির, ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের, নরওয়ের সঙ্গে স্পেনের অপার বন্ধুত্ব এখানে— এই গাদাগাদি করে রাখা বইয়ের মধ্যে। বাড়লার কোণে বসে সে স্পর্শ পায় টলষ্টয়ের, ডষ্টয়ভস্কির, গোর্কির, হামসুনের। তার রুগ্ন জ্বরতপ্ত কপালের উপরে যেন কোমল হাতের স্পর্শ বুলিয়ে যায় বোয়ার। ক্রাঁস, ব্রাউনিং, ব্যারেট আরও কতজন এসে তার সঙ্গে মাখামাখি করে যায়। দেশের বাড়িতে দুঃসহ দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে মা ও ছোট বোনের অসহায় দিনাতিপাত। অসুস্থ অসমর্থ সৌম্য তাই স্বস্তি খোঁজে স্বপ্নচারিতায়। রাতের নৈঃশব্দকে ভর করে জানালা দিয়ে কোনো একটি মেঠো মেয়ে 'মিঠে দুই চোখে' তার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রবঞ্চনা, অভাব, অসুস্থতা আর অশান্তির রূঢ় বাস্তবতাকে সঙ্গী করেও অমৃতের অন্বেষণে চলেছে তার আত্মপরিক্রমা। বাহ্যিকভাবে সে জীবনবিমুখ, মৃত্যুবিকারেও মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত জীবনের দুঃস্বপ্নকেই সে দেখেছে। বহুযুগের কবি ও লেখকদের পাশাপাশি উপোসী মানুষেরা মিছিল করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছে, দেখেছে ছোট বোনকে জলে পড়ে যেতে, নিষ্পাপ বিবাহিত বোনের পিঠে দেখেছে চাবুক পড়তে। সম্ভব-অসম্ভব অলীকদর্শন (Hallucination) হয়েছে তার। আর সেইসব কথা উচ্চারণ করেছে সে মৃত্যুপূর্ব-প্রলাপের মধ্যদিয়ে। তবু জীবনকে ছেড়ে যাবার সময়ে, দূরে, একটিমাত্র তারার কণিকার আলোক ইঙ্গিতও যেখানে নেই, সেখানে যেতে চায়নি। কাঞ্চনকে অনুরোধ করেছে তাকে ধরে রাখতে। জীবন-বিমুখতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এক জীবনাসক্তিই আসলে তার মর্মমূলে নিহিত।

মাসদুয়েক কষ্ট করে গজিয়ে তোলা চুল ও দাড়ির মূলধন নিয়ে সন্ন্যাসী কিংবা ভিক্ষা ব্যবসায়ে নেমেছে বিনোদ। নাকের উপর তার ত্রিশূলের মতো কাটার দাগ, এর দু'পাশে দুই চোখে আর্দ্র অবসন্ন-বিষণ্ণতা। তার—

> বুকের দিকটা একেবারে চাপা, বসা, যেন একটা ফুসফুস কে চুষে নিয়েছে। নাকটা থেঁতলানো, কানের আধখানা খোয়া গেছে, গলাটা হারগিলের মতো, মাথায় বাবুইপাখি বাসা বেঁধেছে বুঝি। ১/২২০

জীবন ও জীবিকার পথে বিচরণ করতে গিয়ে চলে তার অন্তহীন সংগ্রাম। জীবিকার অন্যতম কৌশলরূপে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করে। কখনো তার দিয়ে টিয়া, আরশোলা, মোষ, পাখির খাঁচা, দালান, ইজিচেয়ার এইসব বানিয়ে বিক্রি করে। গায়ে 'রঙ্-চটা আলখাল্লাটা, মাথায় জটা বাঁধা, দাড়িগুলোতে উকুন'...। রাতে মেসে ফেরে ট্যাঁকে নামমাত্র পয়সা আর গাঁজা নিয়ে। কখনোবা হাতে জাপানী বাক্স— চারদিক তার আটকানো পেরেক দিয়ে, মাঝখানে পয়সা ফেলবার ফুটো। একখানা কাগজ লাগানো, ওতে ইংরেজিতে লেখাঃ 'গরীব ছাত্রদের ফন্ড'। জীবিকারই প্রয়োজনে কখনোবা মাথার চুল কেটে, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, খালি পায়ে, পরনে ও গায়ে ছেঁড়া কাপড় জামা জড়িয়ে পথে এসে দাঁড়ায়। বাহ্যিকতার আড়ালে ভাগ্যের হাতে মারখাওয়া, পোড়খাওয়া এই তরুণটির হৃদয়ের নিভৃতে রয়েছে এক রোমান্টিক মন। মেসের বন্ধুদের মাঝখানে বসে সে মগ্ন হয় স্বপ্নচারিতায়। কল্পনাবিলাস তাকে যেন রক্ষা করে কুৎসিত-বাস্তব এই জীবন জটিলতা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তির বাসিন্দা, রাস্তায় জল ছিটানোর কাজে নিয়োজিত দীনবন্ধুর বিধবা স্ত্রী পুতলি। মোটরের তলায় চাপা পড়ে একমাত্র সন্তান এবং আত্মহত্যা করে স্বামী চলে গেলে একাকী সংসার জীবনের পথে বিচরণ করেছে সে। বসন্তরোগে মুখের শ্রী এবং একটা চোখ হারিয়েছে, কাদির 'ফালতু বেটপকা' ছেলের দায়িত্ব নিয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে সে বাজারে মাছ বেচে, চালের আড়তে ধান ঝাড়ে। পরে, পানের দোকানে কাজ করে কাঞ্চনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেছে। অন্ত্যজস্তরের বাসিন্দা হয়েও মনের নিভৃত কোণে রোমান্টিক অনুভূতি-আশ্রয়ী এক নারী এই পুতলি। কাঞ্চন যদি তার বসন্ত-কলঙ্কিত মুখকে কল্পনা করেছে নক্ষত্রখচিত আকাশের মহিমায়, সেও কাঞ্চনের কাছ থেকে পাওয়া স্মৃতি স্বপ্নরঞ্জিত গোলাপি জামাটি না ধুয়ে বাক্সে সংরক্ষণ করেছে রোমান্টিক আন্তর- অনুভূতির প্রেরণায়।

উপন্যাসে আরো রয়েছে— প্রতারক চরিত্র মুন্সী। কাঞ্চনকে মকবুলে পরিবর্তিত করে তার সেলুনের কর্মচারী নিযুক্ত করে সে। 'ভার্জি'র সঙ্গে 'সার্দি'র প্রলোভন দিয়ে কাঞ্চনের কাছ থেকে কাজ আদায় করে এবং পরে তার জমানো পয়সা গ্রাস করে। রয়েছে কর্মচারী নির্যাতনকারী চরিত্র 'মহেশ্বরী ইটিং হাউসে'র 'কর্তার শালা' বিশে। কাঞ্চনকে দিয়ে সে পা টেপায়, ঘাড় মালিশ করায়, শুধু তাই নয় 'ওর দোর্দণ্ড প্রতাপ, যখন খুশি থাবড়ায়, যখন খুশি উপোস করিয়ে রাখে'।

কল্লোলের ভাবনাচিন্তায় গতানুগতিক সাহিত্যধারা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল। মুক্ত জীবনপ্রবাহে ভেসে চলতে চাওয়া তরুণ পথিকদের আকর্ষণ করেছিল— একদিকে ফরাসী সাহিত্যের বস্তুবাদ, অন্যদিকে স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যের বোহেমিয়ানিজম, যাযাবরত্ব। যুগসম্পৃক্ত হতাশা, অবিশ্বাস-আশ্রিত স্বভাবধর্ম তাঁদেরকে কখনো রুশ, ফরাসী ও স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যের এইসব বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত করেছিল। অচিন্ত্যকুমার *ন্যুট হামসুনের প্যান* উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ করেন, শুধু তাই নয়— তাঁর *বেদে* উপন্যাসের অনেক স্থানে এর ছায়াও প্রতিফলিত হয়েছে[১০]। দুটি উপন্যাসের মধ্যে নানাভাবে মিল পরিলক্ষিত হওয়ায় *বেদেকে প্যানের* প্রভাবচিহ্নিত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন, গ্লাহ্ন ও কাঞ্চন উভয়েই আত্মীয় পরিজনবর্জিত, পিছুটানহীন। অন্য একজনকে সঙ্গ দেবার কারণে এভভার্ডার প্রতি গ্লাহ্নের মনে জেগেছে ঈর্ষা-প্রসূত বিরূপতাঃ

> ওর মুখ যেন আর তত সুন্দর নয়, যেন নেহাৎ বাজে হয়ে গেছে। ১/৪৪৪

বেদেতে মাস্টারের নিষ্ঠুর, নির্যাতক স্বভাবের পরিচয় পেয়ে যাবার পর কাঞ্চনের চোখে তার চেহারা প্রতিভাত হয়েছে এইভাবেঃ

> এখন দেখি লোকটির সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকের নিচে প্রকাণ্ড একটা ঘা হয়ে শুকিয়ে কদর্য একটা দাগ হয়ে আছে! ১/১২৬

গ্লাহ্নের মানস-স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে তারই বক্তব্যেঃ

> তিনটে জিনিস আমি খুব ভালবাসি।... যে প্রেম হারিয়েছি, সে প্রেমের স্বপ্ন ভালবাসি, ভালবাসি তোমাকে, আর এই জায়গাটুকুকে। ১/৪৯৯

বেদের বিকাশ জন্ম, প্রেম আর ভগবান এই 'তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা'র কথা উচ্চারণ করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে গ্লাহ্ন বিরূপ আচরণ করেছে একাধিকবার। কাঞ্চনও তাই। *বেদেতে* রোমান্টিকতা-

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয়ী অনুভূতি উৎসারিত হয়েছে কাঞ্চন, সৌম্য ও বিনোদের উক্তি এবং আচরণের মধ্যে। *প্যান* উপন্যাসের নায়কের রোমান্টিক অনুভূতি কাঞ্চনের চেয়েও তীব্র। সে ছাড়া অন্তত আর একটি চরিত্রের সন্ধান মেলে, যার মধ্যে এ লক্ষণটি বর্তমান। একটি মেয়ে, গ্লাহ্নের স্পর্শলাগা রুমাল না ধুয়ে তা সংরক্ষণ করেছে কাগজের ভাঁজের মধ্যে, তিনবছর পর একইভাবে গ্লাহ্ন তা দেখতে পেয়েছে মেয়েটির কাছে। বেদের পুতলি কাঞ্চনের দেওয়া জামা না ধুয়ে সংরক্ষণ করেছে তার বাক্সে। ভাষাবিন্যাসের ক্ষেত্রে দুটি উপন্যাসেই লক্ষ করা যায় শিল্পময় কারুকার্য। উভয় উপন্যাসেই ছোট ছোট বাক্যের আশ্রয়, স্কেচধর্মী বিন্যাস, কোনো বিষয়কে সরাসরি বলার চেয়ে, না বলার ব্যঞ্জনা নির্মাণের চেষ্টাই অধিক। একই ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কোনো কোনো স্থানে। অরণ্যের নিবিড়তার মধ্যে যেন মায়ের স্পর্শ লাভ করেছে গ্লাহ্ন। কাঞ্চন 'মায়ের চুমু'র স্পর্শ অনুভব করেছে তার আকাঙ্ক্ষিত টাকাটি হাতে পেয়ে।

এভাবে দুটি উপন্যাসের মধ্যে মিল লক্ষ করা গেলেও পার্থক্যও দুর্লক্ষ্য নয়। ঘটনাপরম্পরায় গ্লাহ্নের উপলব্ধি ও সূক্ষ্মবোধ, মনস্তাত্ত্বিক উত্থানপতনের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসের পরিসরে। একাধিকবার বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতি তার মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে, ঈর্ষাবিষে-প্রতিহিংসায় জর্জরিত করেছে তার হৃদয়কে। প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়েছে সে নিজের উপর, কখনো প্রেমিকার উপর। এরই একপর্যায়ে প্রিয় কুকুর ঈশপকে হত্যা করে তার মৃতদেহ উপহার পাঠিয়েছে প্রেমিকাকে। কাঞ্চনের ঈর্ষার বহ্নিপ্রকাশ এতোটা তীব্র নয়। জীবনে একাধিক নারীর উপস্থিতি সত্ত্বেও গ্লাহ্ন বহুকামী নয়, বরং একই নারীর প্রতি তার সম্পর্কের কেন্দ্রমুখিতা উপন্যাসের শেষ অবধি বিদ্যমান থেকেছে। প্রেম তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে তার নিষ্ঠার পরিচয়ও রয়েছে। *বেদের* মতো *প্যানের* নারীরা কেউই নায়কের প্রতি নিস্পৃহ নয়। বরং প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। কাঞ্চনের সংস্পর্শে আসা নারীরা তাকে উদ্দীপ্ত করেছে ক্ষণিকের জন্যে। তারা সরে যাবার পর তাদের স্মৃতিচারণ করেনি কাঞ্চন। কিন্তু গ্লাহ্ন, মর্মগভীরে প্রেম ও প্রেমিকার উপেক্ষার যন্ত্রণা নিয়ে দূরে চলে গেছে, অথচ মন জুড়ে থেকেছে এই প্রেমিকাই। *বেদের* 'বাতাসি' অংশে প্রকৃতি ও নদীবর্ণনা প্রধান হয়ে ধরা দিয়েছে। *প্যান* উপন্যাসে প্রথমে প্রকৃতি ছিল প্রধান, পরে ধীরে ধীরে আসে লোকালয়, চরিত্র। কিন্তু প্রকৃতি সরে যায়নি শেষ পর্যন্ত। *বেদেতে* নায়ক ছাড়া ('আহ্লাদি' অংশে নটরু) আর কোনো চরিত্র ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হয়নি। *প্যানে* ঈর্ষান্বিত হয়েছে ম্যাক। ইভা এবং তার স্বামীকে দিয়ে অতিরিক্ত শ্রমসাপেক্ষ নিম্নমানের কাজ করিয়েছে, গ্লাহ্নের কুঁড়েতে আগুন লাগিয়ে তা পুড়িয়ে দিয়েছে। এডভার্ডা ইভাসহ অন্তত আরো দুটি নারী সম্পর্কে ঈর্ষাপ্রসূত উক্তি করেছে। *বেদেতে* আস্তিক্য-সংস্কারের বিরুদ্ধ-উচ্চারণ সাধারণত লক্ষ করা যায় না। কিন্তু *প্যানে* তা রয়েছে। *বেদে* উপন্যাসে যৌনতার কোনো বর্ণনা নেই, যা আছে তা ইঙ্গিত মাত্র। *প্যানে* এ বিষয়ে কোনো ধরনের ইঙ্গিতও অনুপস্থিত।

প্যান উপন্যাসের সঙ্গে *বেদের* সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনাসূত্রে এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, অচিন্ত্যকুমারের *বেদে* একান্তই মৌলিক রচনা। *প্যানের* প্রভাব কাটিয়ে এ উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি স্বতঃই প্রকাশিত। নানান বিচারে হামসুনের সৃষ্টির চেয়ে *বেদেকে* বড়ো বলেছেন কালিদাস রায়।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

বিচিত্র চরিত্র-নির্মাণ এবং ঘটনাবাহুল্য অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের বিশেষত্ব। বেদে উপন্যাসে নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পাশাপাশি যৌনমনস্তত্ত্বের রূপায়ণও করেছেন তিনি। তরুণ আধুনিকদের যেসব রচনার বিরুদ্ধে বহুকামিতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, বেদে তার অন্যতম। এর মিথুনাসক্তি এবং অবাস্তব উপস্থাপনের কথা নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথও, অচিন্ত্যকুমারকে লেখা তাঁর পত্রে (৩১ আশ্বিন, ১৩৩৫)।[১২] কিন্তু ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের মর্মনিভৃতে বিরাজমান বহুকামিতা একান্ত বাস্তব বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই বাস্তব তত্ত্বটি সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন ন্যুট হামসুন প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখক। বেদে উপন্যাসে অচিন্ত্যকুমার এই স্বীকৃত এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত তত্ত্বটিকেই গ্রহণ করেছেন। এর অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে বহুকামিতার লক্ষণ বর্তমান। এ বহুকামিতা কোথাও প্রত্যক্ষ এবং কোথাও প্রচ্ছন্ন। প্রধানত ছয়জন নারীকে ঘিরে কাঞ্চন আলোড়িত হয়েছে, অবশ্য এ আলোড়নের ধরন সর্বত্র এক নয়। কাঞ্চনের দাদাবাবু একজনকে ভালোবাসলেও পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গে তার মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। বিভিন্ন নারীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যদিয়ে কাঞ্চনের মুক্তপ্রেমের লক্ষণ ধরা পড়েছে। অস্ফুট কৈশোরেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল প্রেম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুভূতি। কিন্তু কোথাও সে তৃপ্ত নয়। নায়িকাদের ক্ষেত্রেও এই মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণ প্রমাণে আগ্রহী হয়েছেন লেখক। আহ্লাদি একইসঙ্গে নটরু এবং কাঞ্চনকে ভালোবাসে, তাদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করে। অথচ তার যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মাস্টারের সঙ্গে। দাম্পত্য মিলনে ক্লান্ত অরুণ সংসারবিমুখ হয়ে পড়লে কোনো এক মন্টুদার স্মৃতিচারণে মগ্ন হয় মুক্তা। বনজ্যোৎস্নার জীবনে স্বামী ছাড়াও আর একজন পুরুষের সন্ধান মেলে, সে তার দেবর। দেবরের সঙ্গে দেহহীন মিলনের জন্যে নৌকায় করে ভেসে পড়েছে সে। কাঞ্চনকে ভালোবেসেও মৈত্রেয়ী বিয়ে করেছে সফল যুবক গোবিন্দকে। এরা সবাই ইচ্ছে করে কিংবা বাধ্য হয়ে একনিষ্ঠতাকে বিসর্জন দিয়েছে। আবার প্রচ্ছন্ন বহুকামিতার পরিচয়ও রয়েছে। প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পরদিন কাঞ্চনের সঙ্গে আসমানির কথাবার্তার ধরনে প্রভুভৃত্য সম্পর্কের অতিরিক্ত অন্যকিছু আবিষ্কার করা যায়। এ অপরিতৃপ্ত প্রেম ও যৌনতৃষ্ণা কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার ব্যাপার নয়, বরং দেশকাল-ভেদে এ এক সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক সত্য। অচিন্ত্যকুমার এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন বেদে উপন্যাসে।

বেদের চরিত্রদের মধ্যে কেউ কেউ নানামাত্রিক ঈর্ষাবিষে আক্রান্ত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমদিকে দেখাযায়— খাবার পরিবেশন করার সময়ে নবাগত কাঞ্চনের পাতে 'ডিম-ওলা ট্যাংরা মাছটা' তুলে দিলে নটরু খাওয়া ফেলে উঠে যায়। পরে, গাছে উঠে আহ্লাদির কোঁচড়ে পেয়ারা ফেলবার সময়ে কাঞ্চনের উপর শোধ নেয়, তার কপালে ও মাথায় পেয়ারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আবার পুঁতিরমালা উপহার পেয়ে আহ্লাদি খাবার পরিবেশনে নটরুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় আক্রান্ত হয় কাঞ্চন। শুতে গিয়ে, মনে মনে 'আমার খালি চাটাই-ই ভালো' বলে আহ্লাদির দেওয়া বালিশ নটরুর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং রাতের বেলায় লুকিয়ে ঘুমন্ত আহ্লাদির গলা থেকে মালাটি ছিঁড়ে নেয় সে। তার জ্বর হলে তাকে পালা করে সেবা করার দায়িত্ব পড়ে আশ্রমের ছেলেদের উপর। রাতের নির্জনতার সুযোগে আহ্লাদি

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চনকে 'গুনে-গুনে' এগারোটা চুমু দিলে নটরু খাপ্পা হয় এবং নন্তুর মাঝরাতের ভিউটি কেড়ে নিয়ে সে নিজে আসে। ঈর্ষায় জ্বলে উঠে কাঞ্চন বাইরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আর—

> তেমনিই আহ্লাদি ওকে বুকের মধ্যে মুখ রেখে শুতে বলে। তেমনি একের পর এক ঘনঘন শব্দ হয়।
>
> মাস্টার তখন ছিলিমে বসে ঝিমুচ্ছিল। ছুটে গিয়ে বলি— শিগগির আসুন, ...
>
> মাস্টারের সঙ্গে আমিও মুখ বাড়াই। নটরুর মুখটা তখনো আহ্লাদির মুখের উপর। ওর খালি এগারো নয়, ওর বুঝি একশো এগারো।
>
> যা ভেবেছিলাম, তা কিছুই হয়না কিন্তু। মাস্টার শুধু নটরুর কান ধরে আলগোছে তুলে নিয়ে আসে। মাস্টারের পায়ে কি আজ খড়ম নেই! ১/১৪০

রেস্তোরাঁর বয়ের কাজ করার সময়ে কোনো এক বাবুর কাছ থেকে বকশিশ পেলে ক্যাশিয়ার বিশে ঈর্ষান্বিত হয় কাঞ্চনের প্রতি। তাকে মারধোর করে সেই পয়সা কেড়ে নেয় সে। ঈর্ষাজর্জর হয়ে আসমানির প্রাইভেট টিউটর টিমুকে সাইকেলের ধাক্কা দিয়ে বাসের চাকার তলায় ফেলে দেবার উপক্রম করে কাঞ্চন। টিমুর দেওয়া আসমানির জুতো লুকিয়ে রাখে সে। আসমানির সঙ্গে বিয়েতে বরবেশে টিমুকে দেখে তার মনে হয়—

> এত চাকর থাকতে অতিথি-চাকরকে হয়তো আজ দরকার হবেনা। ছাই কলকাতা! আমার সেই পাহাড়তলির শুকনো মাঠ ঢের ভালো—... আর সেই পাহাড়ি মেয়েটাও। ১/১৬৯

বাতাসি নুলোর খোঁড়া পায়ে ওষুধ মালিশ করলে, ভাত মেখে খাইয়ে দিলে ঈর্ষা ভারনত কাঞ্চনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়। বেনু তার অসুস্থ স্বামীর সেবার জন্যে প্রাক্তন প্রেমিক বিকাশকে নিতে এলে ঈর্ষাবিক্ষত বিকাশের প্রশ্নঃ

> কার? তোমার স্বামীর? কেন, ছশো টাকা যার মাইনে— মোটরকার, তেতলা বাড়ি— তার কি আর ডাক্তারের অভাব হয়? ... আমি ভাড়াটে নার্স নাকি যে যার-তার অসুখ হলেই ছুটে যেতে হবে—। ১/২৩২-২৩৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রফেসর মৈত্রেয়ীকে একটু বেশি বেশি সহযোগিতা করতে চাইলে কাঞ্চন পরে মৈত্রেয়ীকে প্রশ্ন করে—

> টিউটোরিয়্যাল-এ আপনি একাই পড়বেন বুঝি ওঁর কাছে। একা হলে খুব যত্ন নিয়েই পড়াবেন নিশ্চয়। ১/২৪৪

মৈত্রেয়ীর মনোযোগ কাড়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে গোবিন্দের উপর মনেমনে বিরক্ত হয় কাঞ্চনঃ

> ছুটি হয়ে গেল, গোবিন্দ এখনও বাড়ি যাচ্ছে না কি রকম! ওর কি পড়ার আর জায়গা নেই যে একেবারে করিডোরের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নিজেকে জাহির করতে হবে? ১/২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মৈত্রেয়ীর বাসায় এসে ওর মুখে গোবিন্দের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনে এবং ওর কাছ থেকে নোট সংগ্রহের কথা জেনে ভেতরে ভেতরে ঈর্ষান্বিত হয় কাঞ্চন। গোবিন্দকে ওর কনভোকেশনের ফটো দিয়ে দিয়েছে একথা বলার পর কাঞ্চন বলেঃ

> আমি এবার যাই, তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো পা দুলিয়ে- দুলিয়ে আরও খানিকক্ষণ পড়। ... গোবিন্দ তোমার জন্যে যা স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করছে, তার জন্যে ওর কাছে তোমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উচিত ঐ নোটগুলো পুজো করা। ১/২৫৭

একদিকে হতাশা অন্যদিকে মুক্তির পিপাসা কল্লোলযুগের তরুণমানসকে করে তুলেছিল বিদ্রোহী। প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শচিন্তা সম্পর্কে সংশয়ী হয়েছিলেন তাঁরা। সমাজ ও পরিবারের গতানুগতিক বন্ধনকে অস্বীকার এবং এক যাযাবর স্বভাবের প্রশ্রয় ঘটেছিল তাঁদের বিবেচনার মধ্যে। ফলে সমশ্রেণী ও সমমানসাশ্রিত কথাকারদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বিদ্রোহী ও বোহেমীয় চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা। তাঁদের রচনার বিষয় ও চরিত্র পরিকল্পনায় এ লক্ষণগুলো ধরা পড়ে। 'আহ্লাদি' এ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখান থেকেই কাঞ্চনের বোহেমিয়ান জীবনের সূত্রপাত।

> পথে বেরিয়ে আসি— অনাথ। হঠাৎ সমস্ত শাসন যেন শিথিল হয়ে গেছে। নৌকার যেন আর নোঙর নেই— ভেসেছে এবার। ১/১৪৪

বি.এ. পাশ করার পর কাঞ্চন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে চলে এসেছে গাঁয়ে। চষা মাটির গন্ধ তাকে টানে, যদিও 'চাষবাসই করব এমন ইচ্ছাই পরম নয়'। নানানভাবে জীবনটাকে বাজিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য। 'একটা একটা করে তার ছিঁড়ুক'— এটাই বাসনা। ট্যাক্সী-ড্রাইভারের কাজ নিয়ে গাড়িটাকে তার কাছে মনে হয়েছে যেন বাদ্যযন্ত্র, যে কিনা শুধু নিজে বাজেনা, তাকেও বাজায়। জীবন ও জীবিকার 'অবগুণ্ঠন শুধু উন্মোচন নয়, ছিন্ন' করারও নেশা উদ্দাম হয়েছে তার মধ্যে। চাকরি পেয়েও তা ধরে রাখার ধৈর্য নেই, তা 'আস্তে চলে বলে, থেমে থেমে'। দাদাবাবুর চরিত্রের মধ্যেই এ লক্ষণটি বেশি পরিস্ফুট। তারপর বিকাশ এবং সৌম্যের মধ্যে। এছাড়াও এ মানসিকতাকে যথাসম্ভব লালন করেছে মুক্তা, মৈত্রেয়ী— যদিও ধরন ভিন্ন। সন্তানের জননী হয়ে 'ভালোবাসার ভার' থেকে মুক্তি লাভ করেছে মুক্তা, তার সন্তানের নাম তাই মুক্তি। মৈত্রেয়ীর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই রোমান্টিক ভেসে চলার লক্ষণঃ

> তুমি যদি বেদে হও আমি বেদেনী, তুমি যদি দাঁড় টানো আমি হাল ধরে থাকব, তুমি লাঙল চালাও আমি মাটি নিড়োব, তুমি যদি কামার হয়ে লোহা পেট, আমি আঁচল ভিজিয়ে তোমার পিঠের ঘাম মুছে দেব—১/২৫৯

অচিন্ত্যকুমারের মানসস্বরূপ সন্ধানে রোমান্টিকতার পরিচয় মেলে সহজেই, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বাস্তবধর্মিতাকেও অস্বীকার করা যায়না। বেদের নারীরা কেউ কেউ বোহেমিয়ান অনুভূতিকে লালন করেছে, যদিও চিন্তা ও জীবনাচরণে প্রায়ই নির্দিষ্ট সীমার নিগড়বন্দীই থেকেছে তারা। বাস্তবতার খাতিরেই সমাজবন্ধন, গৃহের আবেষ্টনী তাদের প্রয়োজন। বোহেমিয়ান পুরুষের মতো অধরা কিছুর জন্যে 'পরম অন্বেষণে' নিয়োজিত না হয়ে তাই নিজেদের প্রবণতাকে তারা তৃপ্ত করতে চেয়েছে কোনো বিশেষ মানুষকে আশ্রয় করেই। মুক্তা মন্টুদাকে খুঁজেছে, বৃষ্টিমুখর রাতে কাঞ্চনকে নিয়ে লক্ষ্যহীন পথে যাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

করেও সন্তানের কথা মনে করে সে ফিরেও এসেছে। অবশ্য, এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি কাহিনীর বক্তা। আভাতমসার একটা অস্পষ্ট আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র। 'বেদে' আর 'বেদেনী' হবার স্বপ্নকল্পনার কথা উচ্চারণ করলেও পরে কাঞ্চনের কাছে প্রেম, সন্তান, সংসারজীবন কামনার ব্যর্থতায় বিছানায় লুটিয়ে কেঁদেছে মৈত্রেয়ী।

তরুণ কথাকারেরা বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব বিদ্রোহী ও ব্যতিক্রমী ভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন— যৌনতার বিষয়টি তার অন্যতম। এতে খোরাক যুগিয়েছিল ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর প্রচারিত তত্ত্ব। *বেদে* উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে *কল্লোল*প্রবণতার এই লক্ষণও ধরা পড়েছে। উপন্যাসের প্রথমে এসেছে কিশোর-কিশোরীদের কাম ও প্রেমের প্রসঙ্গ, এসেছে যৌন বিকারের কথা— মাস্টার কর্তৃক জননী ও তার কিশোরী কন্যার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে লালসা চরিতার্থতার ইঙ্গিত।

এছাড়াও অচিন্ত্যকুমার *কল্লোল*কথাকারদের মানস-প্রবণতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছেন— নেতিবাদে, কাব্যময় ভাববিন্যাসে, রোমান্টিক বেদনাবোধ পরিস্ফুটনে এবং বাস্তবতা নিরূপণে। তাঁর তীক্ষ্ণ-সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার বিচিত্রমাত্রিক উপাদান। পুলিশী অনাচারের ইঙ্গিত মেলে—পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া কাঞ্চনের টাকাটি পুলিশ কর্তৃক আত্মসাৎ এবং জনৈক যুবক কর্তৃক তার প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায়। মালিকপ্রভু সম্প্রদায় কর্তৃক দোকানের কর্মচারী ও গৃহভৃত্য নির্যাতন— রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করার সময়ে কাঞ্চনকে কারণে-অকারণে প্রহারে জর্জরিত হতে হয়েছে। গৃহভৃত্য থাকার সময়ে তাকে আসমানি ও তার প্রেমিকের নিষ্ঠুর কৌতুক ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার নিভৃত যন্ত্রণার কথা বিধৃত হয়েছে উপন্যাসের 'মৈত্রেয়ী' অংশেও। উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগের অন্তরালে শ্রমিকের কতো যে শ্রম, ঘাম, রক্ত, অশ্রু জমা থাকে, সৌম্যের কাছে কাঞ্চনের স্মৃতিচারণমূলক কথার মধ্যদিয়ে তার ইঙ্গিত মেলে—

> বড়লোকের ছেলে নতুন বিয়ে করেছে–তাই তার প্রেমগুঞ্জনের জন্যে দোতলার ছাদে চিলে-কোঠা উঠবে। আমরা বাঁশ বেঁধে কাঁধে বালি-সুরকির ঝুড়ি নিয়ে প্রায় একুশজন লেগে গেছি। ...বুকের ঘাম ঢেলে-ঢেলে শ্বেত পাথরের মেঝে শীতলপাটির মতো শীতল করে দিলাম। ...লখিয়ার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, ...একটা আধ মনি ইঁটের পাঁজা তুলে আনতে গিয়ে ঘামে ভেজা বাঁশ পিছলে সটান মাটিতে পড়ে গেল— আর উঠল না। টমরুর চোখের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর মাথা ফেটে রক্ত ছুটল— ওর সিঁথির সিঁদুরের মতোই ডগডগে। ১/২৩৯

সমাজ জীবনের নিভৃতস্তরে নিহিত কুৎসিত বাস্তবতার পরিচয় মেলে বৃদ্ধা জননী কর্তৃক যুবতী কন্যাকে দেহব্যবসায়ে প্ররোচিত করার প্রয়াসের মধ্যে—

> এক গা বয়েস হল, বলি, চল শহরে, একটা ঘর বেঁধে তোকে রেখে আসি। এখানে কি সোয়াদটা আছে, বয়েস ভাঙিয়ে চড়া রোদে মাড় মলে? ১/১৭৬

বলে নিজের 'যৌবনের অনেক অপরিজ্ঞাত রহস্য কথা' উন্মোচন করে সে মেয়ের কাছে, এবং কি কি যোগ্যতা তার এখনো অবশিষ্ট আছে তাও বলতে ছাড়েনা। বস্তিনারীর জীবনবাস্তবতাসূত্রে এসেছে জনৈক

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক কর্তৃক পানওয়ালী পুতলির উত্যক্ত হওয়ার কথা, এসেছে দাম্পত্য-সংকট প্রসঙ্গ, বিবাহিতা নারীর নিষিদ্ধ পরকীয় প্রেম ও তার প্রতিক্রিয়া। এ প্রেম প্রসঙ্গে রোমান্টিক আবেগ সত্ত্বেও সমাজবাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি উপন্যাসের রচয়িতা। প্রেমিকা নারীটির উপর নানাভাবে নির্যাতন নেমে আসার কথা জানা যায়, এর অন্যতম চরিত্র সৌম্যের ভাষ্যে। তার স্বামী ও শাশুড়ি কর্তৃক তাকে ঘরে ঝুলিয়ে রেখে লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, আধুনিক ধরনে স্বামীর নির্যাতন— হাল্টারের বাড়ি মারা, সাবেকি ধরনে শাশুড়ির— মেঝের উপর হাত রেখে তা নোড়া দিয়ে ছেঁচা— প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে রয়েছে এর পরিচয়। নির্যাতনের ফলে নারীটির অপ্রকৃতিস্থ হয়ে তার পাগলা গারদে যাওয়া, ফিরে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও শেষে গণিকা-পরিণতি নির্ধারিত হওয়ার কথা জানিয়েছে বক্তা। প্রেমিক যুবকটিও অব্যাহতি পায়নি, ভালোবাসার চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাকেও। জেল, জেল জীবনশেষে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে সে রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। দুটি তরুণ-তরুণীর স্বপ্ন এমনি করেই লাঞ্ছিত হয়েছে নিষ্ঠুর বাস্তবের আঘাতে। কাহিনীর মধ্যে তরুণ প্রেমিককে 'ছেলেটি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত স্বকালবিদ্ধ তরুণের নষ্টস্বপ্ন ও ব্যর্থতাকে সাধারণীকরণের জন্যেই লেখকের এই প্রয়াস। একইভাবে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের দ্রষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনতৃষিত ছাত্র সৌম্যকেও অকালে ঝরে পড়তে হয়েছে। জীবনবাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এইসব দিক লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর স্বকালের চিত্ররূপেই। কাঞ্চনের অনুভূতিতে জেগেছে তাই নৈরাশ্যঃ

> পাটের কারখানায় আগুন লাগে, খোলার বস্তিতে লাগে বসন্ত। সাবাড়, উজাড় হয়ে যায়। ভাঙা থুথুড়ো বাড়ি হঠাৎ একদিন বেচারী পথচারীদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পাগলা ঘোড়া গাড়ি উল্টে দেয়। হাতের উপর গায়ে কেরোসিন লাগিয়ে অবোলা বৌ ছটফট করে চেঁচিয়ে- চেঁচিয়ে মরে। রাস্তার উপরে গরু জবাই হয়, আর দেবীর দুয়ারে পাঁঠা। কসাইর ছুরি চক্‌চক করে।১/২০৩

ভিক্ষে করতে গিয়ে মোটরচাপা পড়ে বস্তিবাসী দীনবন্ধুর কটি ছেলের মৃত্যু ঘটে। গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে দীনবন্ধু করে আত্মহত্যা। সারাবছর 'ন্যাবা'য় ভুগে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে জ্বর ছাড়ে যে স্পন্দিত-প্রাণ চঞ্চল কিশোরটির, তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় আকাঙ্ক্ষিত নতুন জামাটি হাতে পাবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে। আশাবাদী ভূমিজীবী মোড়লের স্বপ্নভরা ক্ষেত-মাছ-জোতজমি, বাড়ি, ঘরদোর ভেসে যায় নদীভাঙনের গ্রাসে। ঝড়ের বাড়ি খেয়ে উপ্‌ড়ে পড়ে যায় নুলোর আকাঙ্ক্ষার নতুন ফুলফোটা ডালিম গাছ। উচ্ছ্বসিত-প্রাণ নবদম্পতি— অরুণ আর মুক্তার জীবন জুড়ে ঘনিয়ে আসে সীমাহীন ক্লান্তি, নৈঃসঙ্গ্য। বনজ্যোৎস্নার তিনটি সন্তান— বিবর্ণ যুগ ও হতাশাজর্জর জীবনের প্রতীক যেন, 'ঝড়ে পড়া পালকখসা শালিকের ছা— মাথার চুল উঠে যাচ্ছে', জন্মের মাস দুয়েকের মধ্যেই চোখে ঘা হয়ে, বিষের মতো নীল হয়ে তারা একেএকে মারা যায়। বড়োলোকের ঘরের নববধূর মধুলগ্ন যাপনের চিলেকোঠা তৈরির কাজ করতে গিয়ে ঘামে ভেজা বাঁশের মাচা থেকে পড়ে প্রাণ হারায় গরীব লোকের ঘরের নব বিবাহিতা মজুর বউটি— এসব ঘটনা-দুর্ঘটনা কাঞ্চনের মানসলোকে সৃষ্টি করেছে জীবন সম্পর্কে পরাভব-চেতনা। তাছাড়া দাদাবাবুর সঙ্গে, বিকাশের সঙ্গে তাদের প্রেমিকার মিলন হয়নি, হয়নি সৌম্যের দিদির

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে তার প্রেমিকেরও। এভাবে এ উপন্যাসে প্রেমে প্রায়ই মিলন নয়, সাধিত হয়েছে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে মর্মছেঁড়া বিচ্ছেদ। বলা যায়— বাহ্যিক যন্ত্রণাজটিল জীবন ও অবস্থা পরিস্ফুটনের নামে হৃদয় খুঁড়ে যন্ত্রণা জাগানোতেই যেন অচিন্ত্যকুমারের আগ্রহ।

সমকালে ঘোর বাস্তবতার পীড়ন শিক্ষিত বেকার তরুণদের হতাশাগ্রস্ত ও অস্থির করেছিল। এ বাস্তবতা ও বাস্তবতাস্পৃষ্ট হতাশা-যন্ত্রণার সন্ধান মেলে বেদে উপন্যাসে। সেখানে শিক্ষিত বেকার যুবকের সমস্যা, যন্ত্রণা ও ক্ষোভ স্ফুরিত হয়েছে তার স্বগত-সংলাপের মধ্যে—

> ...যেখানে তুমি বাস্তব, স্থূল জাজ্বল্যমান, সেখানে তুমি কত কদর্য, ...তুমি তো শুধু একটা প্রতিমা নও, তুমি—
>
> ঈশ্বরের নামটা মুখে আসতে দেরি লাগে। যেন ঐ দেরি করে উচ্চারণ করার মধ্যে কত অভিমান! ১/২২৫

বিজ্ঞাপন দিতে না দিতেই প্রার্থীর ভিড়, চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়ে কাজ হয়না। দরখাস্ত পাঠাবার অফিসখাম আর টিকিট কেনারওতো পয়সা চাই। জামাকাপড়ের শ্রী ফেরাবার জন্যে সাবান, ছেঁড়া বোতামের সমস্যা মেটানোর জন্যে চাই আলপিন। কাজ পেলেও সমস্যা মেটেনা। ওকালতি পেশায় অসফল বনজ্যোৎস্নার স্বামী প্রবোধকে গাঁয়ে চলে যেতে হয় হেডমাস্টারি জুটিয়ে, কন্ট্রাক্টরি ছেড়ে দিয়ে দেবরকে বসতে হয় কবিরাজি ডিস্পেন্সারি খুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৌম্য মাসের পর মাস টিউশনির মাইনে না পেয়ে শেষে পানের দোকান খুলতে বাধ্য হয়। উপন্যাসের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে হতাশা, দারিদ্র্য, নিম্নবিত্ত বা অন্ত্যজস্তরের মানুষের কথা। রয়েছে নগরবাসী মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের ক্ষোভ গ্লানি, সমস্যা ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র। জুতোর দোকানে চোদ্দ টাকা বেতনের বিক্রেতার জন্যে প্রার্থীর ভিড়। মোড়ের মুচির নজর পথচলা পথিকের ছেঁড়া চটির দিকে, গাড়োয়ান তাকায় যাত্রী ভেবে, ডিসপেনসারিতে বসা নতুন ডাক্তারের চোখে রোগী পাবার আকুতি। লেখকের চোখে দেখা অজস্র নেতিচিত্র ফুটেছে এখানে রেখাচিত্রের বিন্যাসে। 'বোবাবন্দী বেজার গলিটার কাতর আকুতি' নিয়ে পথচারীদের আহ্বানকারী বুড়ো কবরেজের ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া, অধিক সন্তানের জনক মেসের বাসিন্দা অখিলবাবুর কুড়িয়ে আনা সিগারেটের টুকরো পিন দিয়ে গেঁথে গেঁথে ধূমপান করা, কোথাও কেরানী নাগরিকের আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত— সাতটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে ট্রামকন্ডাক্টর বন্ধুর সহায়তা প্রার্থনার মধ্যেঃ

> ছেলেটার জন্য অষুধ কেনা যাবে। বুঝলে না ভাই— ত্রিশটাকার কেরানী— ১/১৯৭

কিংবা অসুস্থ সন্তানের জন্যে বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দেবার পর সেই ছেলের মৃত্যু হলে, বেকার যুবকের আফসোসঃ

> ...ছেলেটাও গেছে। ...ছেলে আবার হবে, কিন্তু চাকরি কবে হবে তা যমও জানে না। ১/২০৩

নগরযন্ত্রের চাপে নিষ্পিষ্ট মানুষ— মেস বা বস্তির বাসিন্দা। যে বস্তি আসলে— 'বস্তি, না আঁস্তাকুড়! সমাজের তলানিদের সমুদ্র'। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা এর ঘরগুলো— 'মরা মানুষের চোখের মতো' যার জানালা খুললেও আলোর সন্ধান মেলেনা তাতে। মানুষের জীবন, মৃত্যু সবই সস্তা এখানে।

Dhaka University Institutional Repository

জেলখানায় মাগনা খেতে পাওয়া যাবে বলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বস্তির ভজুলাল উৎফুল্ল হয়। মেসের 'শ্যাওলাপড়া দেয়াল ফুঁড়ে বটের চারা বেরিয়েছে ...কাটা ইঁটগুলি ওর ভাঙা পাঁজরার পানে চেয়ে থাকে।' এই মেসের পথ— 'রোগা পটকা গলি, কেশে কেশে যেন ধুঁকছে, এমনি মনে হয়'। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে কাঞ্চনের মনে হয়েছে— শুধু রাতের অন্ধকার নয়, যেন দিনের রৌদ্রও কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। 'বাতাসি' অংশে— মোড়লের বেতো টাট্টুটা— যে কিনা ঝিমোয় আর মশা তাড়ায় লেজ নেড়ে নেড়ে, সারাগায়ে ঘা, ঘাড়ের লোমগুলি সব খসে গেছে— মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠার শব্দ বাতাসে কান্নার মতো শোনায়, ওর দিকে তাকিয়ে কাঞ্চন শুনেছে ওর জীর্ণ পাঁজরের তলার পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস। শুনেছে, দাদাবাবুর প্রেমিকার 'কথা কইতে না পারার অকথিত কান্না'। ভবঘুরে দাদাবাবু, বিশেষকরে তাঁর প্রেমিকার মুখাবয়বে গভীর ক্লান্তি ও বেদনার ছবি যেন লেখকের যুগসম্ভূত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিরই প্রতিরূপ। অচিন্ত্যকুমার *কল্লোল*-আসরের সভ্য কাউকে কাউকে যেমন, গোকুল নাগ ও সুকুমার ভাদুড়ীকে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে এবং বিজয় সেনগুপ্তকে আত্মহত্যা করে জীবন থেকে অব্যাহতি নিতে দেখেছেন। যে অর্থ-দৈন্যময় জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা কল্লোলীয়দের করে তুলেছিল আশাহীন ঘ্যাকাশে; অচিন্ত্যকুমারের বেদেতে রয়েছে তারই পরিচয়।

একদিকে নৈরাশ্যে নিমজ্জন, অন্যদিকে আশার স্বপ্নচারিতা; রোমান্টিক স্বভাব-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত সমকালীন এই মানসলক্ষণের প্রতিফলন বেদে উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে নেতিবাচক মানসিকতা যেমন রয়েছে, তেমনি সামান্য হলেও রয়েছে আশাবাদের ইতিবাচক ইঙ্গিত। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে মেঘভাঙা রোদের মতো যেন লেখকেরই মুক্তিপিয়াসী আত্মার নিঃশব্দ পক্ষসঞ্চালন। বাতাসিকে নিয়ে তার বৃদ্ধা জননী রচনা করে ভবিষ্যতের সুখরঞ্জিত স্বপ্নকল্পনাঃ

> বাতাসির সারা গায়ে হীরে-জহরত। তখন চাষার ছেলে? আপিসের বাবু। কাতারে-কাতারে। ১/১৮০]

জমিকে ঘিরে মোড়লেরঃ

> জমির আরো বন্দোবস্ত নেব, শুধু রাঙা আলু নয়, মাটির কৌটো থেকে সোনা বেরুবে— সোনা। ১/১৭৫

নুলোর খোঁড়া পা আর অকেজো হাতে অন্নদা কবরেজের 'অব্যর্থ অষুধ' তেল মাখতে মাখতে বাতাসি স্বপ্ন দেখে—

> দেখিস না তোর পা দুদিনেই কেমন টন্‌কো হয়ে ওঠে। এই হাত দিয়েই মারবি কুড়ুল, এই পা দিয়েই তোর বাপের মুখে লাথি। ১/১৮২

নিজের জীবন ও অনুভূতির প্রতীক নতুন ডাল মেলে দেওয়া ডালিম গাছের চারাটিকে নিয়ে চলে নুলোরও স্বপ্নরচনা। নতুন উকিল প্রবোধের যদিও 'তেত্রিশ টাকা বাড়িভাড়া, লাইব্রেরির চাঁদা, ট্যাক্স, ল-জার্নালের খরচ— গাউনটা এমন ছিঁড়েছে যে আর সেলাই চলে না'! তবু ভবিষ্যতের আশা তাকে উদ্দীপ্ত রাখে—

> একবার যদি নাম ফাটে! বাড়ি, গাড়ি আর লাইব্রেরি— চাই কি একটা বাগানবাড়ি পর্যন্ত। ১/২২৬

Dhaka University Institutional Repository

মৃতবৎসা বনজ্যোৎস্না তার সন্তানদের নাম রাখে লেনিন, ম্যাকসুইনি আর মুসোলিনী। 'ঝড়ে-পড়া পালক-খসা শালিকের ছা— মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, চোখের উপর একটা ব্যান্ডেজ— দাঁতের মাড়িতে ঘা'— নিয়ে এক এক করে তারা চলে যায়। তবু অনাগত সন্তানকে নিয়ে তার আশাবাদ—

> আর একটি যখন হবে, নাম রাখব আবদুল ক্রিম। ১/২২৮

'একটা পুঁচকে, খোট্টা-মার্কিক ছেলে' গোবিন্দ। অথচ পরীক্ষার হলে মুহূর্তে পাতার পর পাতা লিখে ফেলছে, 'পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটেছে—বেদুইনের ঘোড়া'— তার কলম। শুধু তাই নয়— ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে পাশ করতেই সে চাকরি পেয়ে যায়, প্রেমের আমন্ত্রণ লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত নারীটির কাছ থেকে। ছোট ভাইকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করানো, কিছু টাকা জমিয়ে ছোটখাট একটা বাড়ি বানানোর স্বপ্ন— সবমিলিয়ে যেন তার প্রাণে জাগে 'চৈত্র-রাত্রির' চাঞ্চল্য। তার দিকে তাকিয়ে কাঞ্চনের মনে হয়—

> ওর কথাগুলি যেন ফুলঝুরি। ও যেন দৌড়ে চলে— ওকে সত্যিই কত সুন্দর, সাবলীল, সমৃদ্ধ দেখাচ্ছে। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি— তাঁতের কাপড়— হাতে একটা স্টিক পর্যন্ত। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। ১/২৬০

সম্ভাবনার প্রাবল্যে যেন টগবগ করে ফুটছে সে। অস্বাভাবিক বেশভূষা ও মুদ্রাদোষে আক্রান্ত যুবকটি রাতারাতি হয়ে উঠেছে এক পরিবর্তিত মানুষ।

তারুণ্যের অনিবার্য স্বভাব-লক্ষণ— স্বপ্নচারিতা ও রোমান্টিক ভাববিলাস থেকে সমকালীন তরুণ লেখকেরা মুক্তি পাননি। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা তাই রোমান্টিক ভাবালুতাআশ্রিত অস্থিরতার তাড়নায় মানসভ্রমণ করেছে স্বপ্নলোকে, ছুটেছে অদৃশ্য অধরার পেছনে। *বেদে* উপন্যাসে এ লক্ষণটি দুর্লক্ষ্য নয়। সমাজের উঁচু নিচু বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র স্বভাবের নারী এসেছে কাঞ্চনের জীবনে। অধরা জেনেও তাদেরকে ঘিরে তার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বারবার, সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। মৈত্রেয়ী ছাড়া অন্য সবাই নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ও অনুভূতিতে মগ্ন থেকে একসময়ে সরে গেছে তার জীবনবৃত্ত থেকে। তবু নারী তার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৈত্রেয়ীর আমন্ত্রণ পেয়ে অস্থির অপেক্ষার লগ্ন অতিবাহিত করতে করতে তার মনে হয়েছে— 'বেলা যেন ভাঁদুরে কুঁড়ে, কাটতে চায়না'। অথচ এ মৈত্রেয়ী যখন তার সঙ্গে জীবনকে জড়াতে চেয়েছে তখন তাকে সরিয়ে দিয়েছে এই বলে—

> আমি একটা কি? চালচুলো নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, আমার মধ্যে স্থিরতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। আমি কাউকে এত ভালোবাসতে শিখিনি মৈত্রেয়ী, যে, সারাজীবন তাকেই ভালোবাসব। ১/২৫৯

মৈত্রেয়ী যখন বলে—

> দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লুসের যেমন লেসবিয়া, মিকাল এঞ্জেলোর যেমন ভিক্টোরিয়া কলোনা— তেমনি আমি তোমার। তোমার। ১/২৫৮

উত্তরে কাঞ্চনের প্রশ্ন—

> কিন্তু মৈত্রেয়ী, বিয়াত্রিচেকে কি দান্তে বিয়ে করেছিল? ১/২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চন ভেসে চলেছে আমোঘ অস্থিরতার টানে, কী সে করতে চায়, তা-ই জানেনা। প্রাণের গভীরে তার নিয়ত অতৃপ্তি। যা পেয়েছে তাতে তৃপ্তি হয়নি, বরং আরো বেশি করে প্ররোচিত হয়েছে প্রাপ্তির অন্বেষণে। এক রোমান্টিক অসুখে ভুগতে ভুগতে সে পথ চলেছে বরাবর। আকৈশোর তারমধ্যে এক যন্ত্রণাদীর্ণ মানসস্বরূপ লক্ষ করা গেছে। এই অতৃপ্তি এখানকার সমস্বভাবের অধিকারী কোনো চরিত্রকেই দাঁড়াতে দেয়নি কোথাও। না প্রেমে, না দাম্পত্যের স্থির ভূমিতে। একদিকে অবস্থার চাপ, অন্যদিকে নিজেরই স্বভাবপ্রবণতা কাঞ্চনকে ঘুরিয়েছে বিভিন্ন ঘাটে, ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবন ও সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার। যাযাবরসুলভ এক অপরিতৃপ্তি তাকে ভাসিয়ে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাদানরত ছাত্রদের দেখে তার মনে হয়েছে—

> ...এতগুলি ছেলে মশাল হাতে কি যেন অনুসন্ধান করছে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কি চায়, কেই বা জানে। হয়তো একটি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন— পুত্র-পরিবার, শোক, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু! ১/২৫৭

নায়ক কাঞ্চন সংসার-বিচ্ছিন্ন, জীবনের শুরুর ইঙ্গিত কিংবা শেষেরও সমাধান বিহীন, স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসেচলা এক লক্ষ্যহীন মানুষ। চলতে চলতে, বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হতে তার চিন্তা ও চেতনার নানাবিধ আবর্তন-বিবর্তন সাধিত হয়েছে, কিন্তু বোহেমিয়ান স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি কখনো। রোমান্টিকতার একইরকম ঘোর মাখানো চরিত্র— বিনোদ, বিকাশ, সৌম্য ও পুতলি। কাঞ্চন ও সৌম্যের কথোপকথনের মধ্যে এবং অন্যত্রও রয়েছে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতার পরিচয়ঃ

> ক. রাস্তা খুঁড়েছি, বস্তা টেনেছি, মোটরে-মোটরে টক্কর লাগিয়েছি, চাকরির উমেদার হয়ে পথে জিরিয়ে-জিরিয়ে পায়চারি করেছি। একবার লাঙলও ধরেছিলাম বাগিয়ে।
>
> —তবু পেলেন না তো তাকে?
>
> —কাকে?
>
> —নোফালিস্-এর নীলফুল, বোয়ার-এর শ্বেতহংস। ১/২৩৭
>
> খ. সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কোন পুরোনো চেনা বন্ধু যেন ওকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। তেপান্তরের মাঠের পারের কার যেন স্নেহস্পর্শ— বহুদূরের কোন তুষারাবৃত আকাশের সুস্নিগ্ধ অভিবাদন ! কার যেন করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস— ওর কাছে সহানুভূতি চায়— অতিদূর থেকে কে যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ১/২৩৭
>
> গ. এই জানলা দিয়েই হয়তো কোনো ব্যথিত সমুদ্রের নিশ্বাস ভেসে আসবে— কোনো একটি মেঠো মেয়ে তার মিঠে দুই চোখে আমার দিকে চাইবে— অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না বাতিটা নেবে। ১/২৪১
>
> ঘ. ওর দেহের এই বিস্তীর্ণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যেন বিদেশিনী বিদেহিনী প্রিয়াকে আবিষ্কার করছি। ১/২০০

Dhaka University Institutional Repository

এই রোমান্টিক অনুভূতির কারণে ট্রামকন্ডাক্টরের পেশায় নিয়োজিত কাঞ্চন জনৈক কলেজগামী তরুণীর হাতের মুঠির ঘামলাগা পয়সা নিজের কাছে রেখে চামড়ার ব্যাগে ঢুকিয়েছে নিজের পকেটের পয়সা। আবার অন্যত্র, অদৃশ্য অধরা রহস্যময়ীর প্রতি এই মানসপিপাসার কারণে 'ভোঁতা ভুটিয়া কুলি মেয়েটার' মধ্যে কোনো ভান নেই বলে তাকে 'বে-আক্কেল' মনে হয়েছে তার কাছে। চলেছে তাই মানস-অন্বেষণ। আত্মভোলা রোমান্টিক প্রাণ তার প্রকৃতির মধ্যে— ঘাসের মধ্যে, গাছের ডালের মধ্যে আবিষ্কার করেছে অবর্ণনীয়ের আভাসঃ

> আকাশ তার ললাটে নীলের স্বচ্ছ স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে ধরে কত রহস্যময়! গৈরিক বৈরাগী পৃথিবী শ্যামলিমার স্নেহাঞ্চলখানি দেহের উপর গুটিয়ে টেনে কত মহিমাপূর্ণ! জ্যোতির অবগুণ্ঠন টেনে রাত্রির নক্ষত্র আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড কত দূর, ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে, কি অনির্বচনীয়! জমিদার-বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কি সুদূর ইশারা! ১/১৯৯

রোমান্টিক এই মানস-অন্বেষণ শুধু তারই নয়, সমধর্মী অন্যদেরও। এই অন্বেষণের স্বরূপ— কখনো জীবনতৃষিত ঐকান্তিকতায়, কখনো বিদ্রোহীচিত্ততায়। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রামে জীর্ণ ক্লিষ্ট নুয়েপড়া যুবক বিনোদ। দেশের বাড়িতে তার স্ত্রী রয়েছে, নগবালা, বোবা মেয়ে। অথচ রোমান্টিক ভাবাবেগে নিত্যদিন সৃষ্টি করে চলেছে তার মানসপ্রিয়ার এক ভিন্নতর কল্পপ্রতিমা। বিবাহের সীমাবদ্ধতায় মন ভরবেনা কাঞ্চনেরও। তাই তার উচ্চারণে মেলে রোমান্টিকতাজাত প্রবল অতৃপ্তিতাড়নার ভাষারূপ—

> গ্রেচেনের বুকে বুক রেখে ফাউস্টের ক্ষুধা মেটেনি, মৈত্রেয়ী, তা তো তুমি জানো। আমাকে ও- রকম ভাবে সত্যি ডেকো না। ১/২৫৯

কল্পনাজগতে অন্বেষণ-প্রবণতার পরিচয় রয়েছে বনজ্যোৎস্নার চিন্তায় ও আচরণে। একের পর এক সন্তানদের হারিয়েও সে স্বপ্নচারী। হ্যামলেটকে চিঠি লেখে, লেখে কীট্‌সের ফ্যানিকে, ডনজুয়ানকে। মানসলক্ষণ-বিচারে বিনোদের সঙ্গে তাকে অভিন্ন মনে হয়েছে কাঞ্চনের কাছে। সৌম্যের কল্পনাচারী 'মেঠো মেয়ে তার মিঠে দুইচোখে' তাকিয়ে থেকে তাকে ক্ষণিক অব্যাহতি দিয়েছে নিশ্ছিদ্র যন্ত্রণা থেকে। এই অতৃপ্ত-তৃষ্ণা ও তৃষ্ণাজনিত রোমান্টিক মানসবিচরণ লক্ষ করা যায় বেদে উপন্যাসের অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে।

সাহিত্যক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের আবির্ভাবকালে শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের মধ্যে প্রথাগত সমাজরীতি ও জীবনাচরণের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। এ বিদ্রোহ কোথাও সরব, কোথাও নীরব। কোথাও আবার বিদ্রোহ ছিল সংসারে নারীপুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কেউ কেউ মনে করেন বিবাহই মানুষের পূর্ণতার একমাত্র পরিচয় নয়। অচিন্ত্যকুমারের রচনায় এ বিষয়টি বেশি করে ধরা পড়েছে। কিছু কিছু নতুন চেতনারও সঞ্চার করেছেন তিনি। বিবাহের চেয়ে বড়ো কিছু সম্পর্ক আবিষ্কারের এক অলক্ষ্য-প্রয়াস তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন লেখক। সমাজসমর্থিত গতানুগতিক ধারণা ও অভ্যাসের পরিবর্তন হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু সূক্ষ্মজটিলতা-আশ্রিত আধুনিক মানুষের মানসিকতা ও জীবনধারা সম্পর্কে নানাবিধ সংশয়ের ইঙ্গিত

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন তিনি। *বেদে* উপন্যাসে এ সংশয়ের পরিচয় ততো স্পষ্ট নয়, কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস— *কাকজ্যোৎস্না* (১৯৩১), *মুখোমুখি* (১৯৩২), *বিবাহের চেয়ে বড়ো* (১৯৩১) প্রভৃতিতে এ পরিচয় সরাসরি লক্ষ করা যায়। বেদের কোনো কোনো নারীচরিত্র ভিন্ন ভিন্নভাবে বিদ্রোহী। সৌম্যের দিদি স্বামী বর্তমানেও অন্য একজনকে ভালোবেসে সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ও নির্যাতিতা হয়েছে, কিন্তু আপোস করেনি। বনজ্যোৎস্না সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর থেকেছে এবং সুস্থ সন্তান প্রত্যাশা করেছে তার দেবরের কাছে। বিমুখ স্বামীর ঘরে নিজের ভাগ্যকে মুক্তা দোষারোপ করেনি, কিংবা এ অবস্থাকে মেনেও নেয়নি। বরং ভালোবাসার ভার থেকে মুক্তি পেয়ে শৈশবের সঙ্গীকে সন্ধান করে ফিরেছে মনে মনে। অবস্থা ও স্বভাবে ভিন্ন হয়েও তারা প্রত্যেকেই সুতীব্র জীবন পিয়াসীও বটে। যদিও জীবন এদের কাউকে কাউকে— যেমন, সৌম্যের দিদি ও বনজ্যোৎস্নাকে বঞ্চনা করেছে।

বিচার করলে দেখা যায় বেদের নায়কের নোঙর বিহীন জীবনযাত্রা বন্ধনঅসহিষ্ণুতার ফল। বন্ধন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াই তার স্বভাব। কী যেন এক অতৃপ্তির তাড়নায় ক্রমাগত ছুটে বেড়িয়েছে সে। বেড়িয়েছে দেশবিদেশে নয়, বাঙালি সমাজেরই উপর থেকে নিচের স্তরে। তার চোখে দেখা ঘটনা ও চরিত্রের চালচিত্র এখানে বিন্যস্ত হয়েছে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনার একেকটি বিষয় নায়কের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে, আবার হারিয়েও গেছে বিস্মৃতির ধারায়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে তার দেখার ও অনুভব করার ধরনের, বৃদ্ধি পেয়েছে স্বভাবের ছন্নছাড়া প্রবণতা। কিন্তু বিস্তর দেখা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানসিক উপলব্ধিজাত যে পূর্ণতা তার কথা জানা যায়না। অবশ্য, কালিদাস রায় এ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারকে চিঠিতে জানিয়েছেন—

> যে ভবঘুরে যে বেদে লক্ষ্যহীন— সে তো কোনো ধারা বা পদ্ধতি বা Principle নিয়ে ঘুরতে পারে না— তার মধ্যে আবার Evolution কি ? তার মধ্যে কোন Teleological principle থাকতেই পারে না। তার সবই সৃষ্টি ছাড়া— সবই At random— সবই Spasmodic.[১৩]

উপন্যাসে প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছে বহু নরনারীর মধ্যে। তবে মৈত্রেয়ী ছাড়া এদের কারো মধ্যে বিবাহবন্ধনের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায় না। এদের সবার প্রেমই শরীর-নিরপেক্ষ। বিকাশের প্রেমিকা বেনু, সৌম্যের দিদি, মৈত্রেয়ী— তারা স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে অন্যকে। একাধিক নারীকে ভালোবেসেছে কাঞ্চন, একাধিক পুরুষের প্রতি আকর্ষণের লক্ষণ মেলে আহ্লাদি ও বনজ্যোৎস্নার আচরণের মধ্যে। প্রেমিকার প্রতি নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে অরুণ, বিকাশ ও কাঞ্চনের আচরণে।

এ উপন্যাসে সমকালীন মানুষের— বিশেষত তরুণ বেকার যুবক, বস্তিবাসী ও দিনমজুরের জীবনবাস্তবতার পরিচয় ফুটেছে। এ বাস্তবতা-চিত্রণের মধ্যে হয়তো লেখকের কল্পনাবিলাস আছে, তবু এরই মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে দারিদ্র্যের নানামাত্রিক রূপ। এ বিচারে অচিন্ত্যকুমারের শিল্পসফলতার সাক্ষ্য বহন করে এ উপন্যাসটি। তবু কোথাও কোথাও বিষয় ও চরিত্র উপস্থাপনের মধ্যে কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। আহ্লাদি যথার্থভাবে কাউকে ভালোবাসে কিনা তা জানা যায়না। দাদাবাবু

Dhaka University Institutional Repository

ও তার প্রেমিকা মাধুর মধ্যে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য সত্ত্বেও দু'জনের মিলনের কোনো আগ্রহ নেই কেন— তা জানা যায়না। 'আসমানি' অংশে— শিক্ষাদীক্ষার সুযোগবঞ্চিত গৃহভৃত্য কাঞ্চন আসমানির 'ভালগার-ফ্র্যাকশান-এর সাম' করে দেয়। অথচ তার যথার্থভাবে পড়াশোনা হয়েছে এ বাড়ির চাকরি ছাড়ার পর, দাদাবাবুর আনুকূল্যে হোস্টেলে থেকে স্কুলে পড়তে গিয়ে। আসমানির বিয়েতে তার গৃহভৃত্য কাঞ্চন, যাকে সে নিজে এবং তার প্রেমিক টিমু দুজনেই নাজেহাল ও অপমান করেছে বরাবর— সে কোনো উপহার না দিলে সবাই কেন ঠাট্টা করবে আসমানিকে— তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সৌম্যকে মাসে মাসে ত্রিশটি করে টাকা পাঠিয়ে তার খরচ চালানোর সহায়তা করে যাচ্ছে তার দিদি। অথচ এই দিদিই আবার অসুস্থ ও বেকার সৌম্যের কাছে এসেছে টাকার জন্যে, তার অসুস্থ প্রেমিকের কাছে যাবে বলে। বিকাশের প্রাক্তন প্রেমিকা বেনুর স্বামী 'ছশো টাকা যার মাইনে— মোটরকার, তেতলাবাড়ি' তার সেবাযত্নের জন্যে বিকাশকেই কেন যেতে হবে— এরও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ জানা যায় না, একদিন বেনুর অসুখে সে প্রাণপণ সেবা করেছিল ছাড়া। কাঞ্চনের জন্যে পানওয়ালী কানা পুতলির রয়েছে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম প্রেমাবেগ। সে তার খাওয়াপরা ছাড়াও যোগায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার খরচ। কাঞ্চনের জন্যে 'সর্ষে ফুলের মতো টাটকা, টুকটুকে একটি বৌ' এনে দিয়ে, সেই বৌয়ের দাসী হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবার স্বপ্নকল্পনা ব্যক্ত করেছে সে কাঞ্চনের কাছে। সবমিলিয়ে এই চরিত্রটির মধ্যে বাস্তবতার চেয়ে আরোপিত হয়েছে লেখকের ভাবালুতাআশ্রয়ী রোমান্টিক অনুভূতি। এগুলোকে ত্রুটিরূপে যদি উল্লেখ করা যায় তাহলেও এটা সত্য যে, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের এক নতুন ধরনের প্রবণতা বা প্রবৃত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক— যা কিনা সমাজসমর্থিত গতানুগতিক চিন্তা ও অভ্যাসের সঙ্গে মেলেনা।

স্বকাল ও স্বগোত্রীয় লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের বিশিষ্টতা তাঁর ভাষা-ব্যবহার-বৈচিত্র্যে। তাঁর রোমান্টিক কবিসত্তা বেশে উপন্যাসলেখকের বক্তব্যকে মাঝে মাঝেই আচ্ছন্ন করেছে, আচ্ছন্ন করেছে তাঁর কাব্যময় ভাষাবিন্যাস, উপমা-অলঙ্কার, কখনোবা সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনার আড়ালে— এমন কথা বলেছেন কোনো কোনো সমালোচক। তাঁর ভাষার বিন্যাস-কৌশলকে 'ভাষার দিকে অতিমাত্রায় নজর' এবং 'পাঠকচিত্ত চমৎকৃত' করার উপায়রূপে উল্লেখ করে সমালোচনা করেছেন সুকুমার সেন—

> কবিওয়ালাদের মত অনুপ্রাসের ঝুকনি, চলিত ভাষায় সিদ্ধ বাক্যরীতির বিপর্যাস এবং অযথা ও অনুচিত শব্দসৃষ্টি এইসব এবং সর্বোপরি অতিভাষণ অচিন্ত্যকুমারের লেখনীর মুদ্রাদোষ। ইংরেজির অনুবাদ এবং চলতিভাষার বিকৃতি একটি বড় দোষ।[১৪]

ভাষা সম্পর্কে এহেন সমালোচনা সত্ত্বেও উপমা-অলঙ্কারের আশ্রয়ে অচিন্ত্যকুমারের বাকবিন্যাস যে পাঠককে মুগ্ধ করে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ উপন্যাসের অনেকগুলো উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ফুটেছে তাঁর রোমান্টিক অনুভূতির শিল্পভাষ্য।

উপমা ঃ

ক. আহাদিকে দেখিনা। ঐ বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি ভোরের শুকতারার মতো দূর আর সুন্দর মনে হয়। ১/১৪২

খ. ভাদ্রের গঙ্গা— শান দেওয়া ছুরির মতো ধার! ১/১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

গ. মরা মানুষের বোজা চোখদুটো জোর করে টেনে খোলাও যেমনি, তেমনিই ঐ ঘরের জানলা খোলা। ১/১৯৩

ঘ. দুরন্ত দস্যুর মতো দখিন হাওয়া ঘরের মধ্যে লুটের লাট্টু ঘুরিয়ে দিয়েছে। ১/২১১

ঙ. মোড়ের মুচিটা ছেড়া হাঁ-করা চটিজুতোর পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে— মাছের উপর বেড়ালের দৃষ্টির মতো; ১/২২১

চ. পারুল বিষাদিতা গোধূলি-বেলাটিরই মতো ছাদে এসে দাঁড়াত। ১/২২৩

ছ. ঝড় উঠবে বলে বন্দরে এত্তেলা দিয়েছিল, তাই ভীতু বৌটির মতো নৌকাকে পাড় ঘেঁষিয়ে নিয়ে চলছি। ১/২৪৭

উৎপ্রেক্ষা ঃ

ক. মাঝে-মাঝে অহ্লাদি ছুটে এসে ছুটে চলে যায়। যেন গেরুয়া মাটির দেশে তরতর করে একটি রজতলেখা নদী বয়ে গেল। ১/১২৭

খ. মনে হয়, নুলোর অসাড় পঙ্গু হাত-পা দুটো যেন সহসা জল-তরঙ্গের বাদ্য হয়ে উঠেছে! ১/১৮২

গ. ও যেন মেঘলা আকাশের বুক-চেরা তৃতীয়া-চাঁদের একটুকরো ঘোলাটে মলিন হাসি। ১/১৮৪

ঘ. ও যেন একটি গীতিকবিতা, ভাটার টানের ভাটিয়াল সুর। ও যেন মধ্যদিনের অলস তপ্ত শ্রান্তিকর দুপহরে ভ্রমরের চপল অস্ফুট গুনগুনানি। ১/২০৭

ঙ. তারপর আরেকবার শিশুর পানে তাকাই একটা ঝড়ে-পড়া গালক-খসা শালিকের ছা– ১/২২৮

চ. দেহ তো নয় দীপশিখা! জ্বলছে অথচ বাতাসে কাঁপছে। ১/২৩২

কোথাও আবার সমাসোক্তি অলঙ্কার-সৃষ্টিতে অচিন্ত্যকুমারের রোমান্টিক কবিসত্তার প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে—

ক. তালগাছের মাথা পর্যন্ত আগুনের শীষ ওঠে— যেন দূরের তারাকে ছুঁতে চায়। ১/১৮৯

খ. দুরন্ত ঝড় ওর সঙ্গে ফাজলামো লাগিয়েছে। ১/১৯০

গ. জমিদারবাড়ির উঁচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে আসতে–আসতেই রোদের হাঁপ ধরে যেন, ঝিমোয়। ১/১৯৩

ঘ. যেন যেতে-যেতে পথের মাঝে মেঘ তার ব্যথার ঘড়াটা উপুড় উজাড় করে ঢেলে দিলে। ১/১৯৮

ঙ. সমস্ত আকাশ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ১/২১৫

400477

চ. আলিসায় একটি সলজ্জা রজনীগন্ধা মৃদু কটাক্ষ করে, তারারা পরস্পরের কানে ফিসফিস করে কি কথা কয়, সবাই কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে আমাদের দেখে। ১/২৪৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অচিন্ত্যকুমারের অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ কখনোবা হয়ে উঠেছে অপূর্ব চিত্রময়—

ক. তখন অন্ধকার তার ডানা মেলেছে। ১/১৮৬

খ. ফেনিল নদী পাক খাচ্ছে— যেন নিজে নিজের চুল ছিঁড়ছে। ১/১৯১

গ. রাক্ষসী নদীটা তার দুই পাড়ের বন্ধন ভেঙে হুড়মুড় করে ডাঙায় এসে পড়েছে কোটি-কোটি ফণা তুলে। ঢেউয়ের পর ঢেউ— যেন মহাসমুদ্র। ১/১৯২

ঘ. বাড়ি আর রাস্তা— দুই ভাই বোন যেন। সমবয়সী। শীতের হাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসে আপন মনে খোশগল্প করে। ১/২২০

তাঁর কবিসত্তা তাকে অনুপ্রাসযুক্ত বাক্য ব্যবহারে প্ররোচিত করেছে কখনো কখনো—

ক. ঐ বিকাশ। দুঃখের দুরপনেয় অন্ধকার— তবু আনন্দের অনিন্দ্য কমনীয়তা। ১/১৭২

খ. বুড়ির ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা। ১/১৮০

গ. হাবার হয়ে গেছে। ১/১৮৮

ঘ. বিচিত্র বর্ণ ওকে অবর্ণনীয় করেছে। ১/১৯৯

ঙ. ভোরের উদাস, বিভোর ভৈরবীর মতো। ১/২১০

চ. ও যেন একটা ফুরোনো ফোয়ারা। ১/২১২

এছাড়াও রয়েছে কিছু কিছু অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ। যেমন— হাসির হাসনুহানা, জ্বরটা জোরেই এল, পচার পঁচিশটা লাথি, মৃতের মন্দির, খসা খ্যাংরাটা, আবোলা বৌ, পা-টমটমে টো-টো করে, অপরূপ অস্থিরতা, নববধূর নবারুণ লজ্জা। আবার বর্ণনার ভাষা তাঁর কখনো হয়ে উঠেছে কাব্যময়—

ক. চারপাশে গা-ঢেলে দেওয়া মাঠের মধ্যিখানে শুয়ে মনে হয়, সমস্ত শূন্য মাটি অফুরন্ত কথায় ভরে উঠেছে। মাঝে-মাঝে অর্ধস্ফুট, কখনো বা নিঃশব্দ— তাই মানুষের কাছে অর্থহীন ! ধানের খেতের পোকা থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত এই কথার বেতার চলেছে !

আলুর খেত থেকে বেগুনের খেতে কথা চলে। পুঁইর লতা ঝিঙের লতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাওয়ায় দুলে-দুলে কথা কয়।

কথা চলে মাটির সঙ্গে মেঘের। ১/১৭৮

খ. মনে হয়, আকাশ তার ললাটে নীলের স্বচ্ছ স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে ধরে কত রহস্যময়! গৈরিক বৈরাগী পৃথিবী শ্যামলিমার স্নেহাঞ্চলখানি দেহের উপর গুটিয়ে টেনে কত মহিমাপূর্ণ! জ্যোতির অবগুণ্ঠন টেনে রাত্রির নক্ষত্র আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড কত দূর, ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে, কি অনির্বচনীয়! জমিদার-বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কি সুদূর ইশারা! ১/১৯৯

গোটা উপন্যাসে বিশেষত এর 'বাতাসি' অংশের নদী ও নদীতীরের বর্ণনার ভাষায় লেখকের যে কবিপ্রাণতা, শব্দবাক্যের অর্থব্যঞ্জনা তা পাঠককে মুগ্ধ না করে পারেনা।

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা সেই বিশেষ অংশ ও তার চরিত্রকে বাস্তব ও প্রাণময় করে তুলেছে—

ক. বুড়ি মেয়েমানুষটি বললে— না বাবা, কাত্তিকের মতো মুখ; এক্কেবারে আমার ছেনাথের মতো! ওলাবিবি ছেনাথকে গেরাস করলে বাবা, বাছা আমার কাটা পাঁঠার মতো— ১/১৫০

খ. তোমার ব্যবসার ক্ষেতি হবে না। ১/১৫১

গ. ওর হাতের ফোঁটা বিষ্টুর চন্নামৃতেরই তুল্য। ১/১৫১

ঘ. কার ঠেঙে পড়িয়ে নিবি ? ১/১৭৯

ঙ. তোর হাত দুটো এমন কি অথব্ব হয়েছে যে একেবারে চাকরানি চাই তেল মেখে দিতে। ১/১৮৭

চ. তার খুরে পেন্নাম হই, বাবা। ১/১৯৫

কিছু কিছু ব্যতিক্রমী শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন— বেতোয়াক্কা, আখখুটে, তুইয়ে-তুইয়ে, আসনাইর কেচ্ছা, খামোখা গরচা, জ্যাঁতা পা-টা, খুশখতের পিওন প্রভৃতি। বিষয়-বর্ণনা-কৌশলেও তাঁর ভাষার কারুকার্য লক্ষ করার মতো—

ক. কাপড়ে ফের মুছে নিয়ে ওর [টাকাটারা] চকচকে মুখখানা দেখতেই বুকটার মধ্যে ঝিরঝির করে বাতাস বয়ে গেল। যেন আমার মা কোন্ দূর দেশ থেকে আমার হাতের তালুতে ছোট্ট একটি চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে। ১/১৩৫

খ. আজিজ নিজে কথা কয় না বটে, কিন্তু ওর পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে কথা কয় আমার পাঁজরার উপর। ১/১৪৭

গ. পুতলি হাতের কুপিটা মাটির উপর উলটে ছুঁড়ে ফেলে, গলার সমস্ত রগগুলি চিরে-চিরে ছিঁড়ে, বুকের পাঁজরাগুলি টোটির করে ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। মানুষের অভিধানে সে-চিৎকারের ভাষা নেই। যেমন নেই সমুদ্রের অগাধ বন্যার, যেমন নেই কালবোশেখীর। ১/১৯৪

ঘ. রুনুঠুনু ঘণ্টা বাজিয়ে টিমিয়ে-টিমিয়ে গাড়ি চলে ঘুম পাড়িয়ে-পাড়িয়ে! ১/২১১

কোথাও রয়েছে সাংকেতিক ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যের ব্যবহারঃ

ক. ওকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অবশিষ্ট শক্তিটুকু প্রয়োগ করে ওর মুখে নিবিড় চুম্বন দিলাম।

আর একটা ঢেউয়ের হেঁচকা ধাক্কায় দুর্বল হাতের বন্ধন থেকে ও খসে ভেসে গেল। হয়তো বানের জলে শ্মশান থেকে একটা পোড়া গাছের গুঁড়িই ভেসে এসেছিল। ১/১৯২

খ. চমকে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম— মুক্তা—

ঝাঁপ খুলে দিলাম— মুক্তা গাড়ির মধ্যে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

> ...হয়তো ও গাড়ি থেকে কখন নেমে বাড়িই ফিরে গেছে। হয়তো ও ওর মেয়েরই ডাক শুনেছে— এই চপল বৃষ্টির উছল কলতান শুনে— গরুর গলার উদাস ঘন্টারব শুনে— ১/২১৬

কোনো কোনো স্থানে প্রায় প্রতিবাক্যেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন লেখক। 'আসমানি' অংশেঃ কন্ট্রিবিউশন্, সিরিয়াস কলিসন্, ডেঞ্জারাস উন্‌ড্, ড্রেস, হুইপ, ক্ল্যাশ, বাইক, ক্লগ, ল্যাশ, রেকারিং ডেসিম্যাল, ওয়ান পয়েন্ট কোর কোর, ইউনিটারি মেথড্, ফরটি টু একজাম্পল্, ভালগার- ফ্র্যাক্শান- এর সামগুলো, অ্যাডিশ্যানাল, এস্‌করট্, প্রেজেন্ট, কোচ্চেন করার রাইট নেই, কনট্র্যাক্ট। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ সমালোচকের মতে ভাষাভঙ্গির ব্যাপারে কাব্যময়তার আতিশয্য, অতিসচেতন শব্দ ও বাক্যবিন্যাস অনেক সময়েই রচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উপন্যাসের ভাষা, উপমা, বিষয়, চরিত্র— সবই কাব্যিক, রোমান্টিকতার ঘোর মাখানো। উপন্যাসের ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত ও খণ্ডিত করেছে লেখকের শব্দ ও উপমার অতিসচেতন বিন্যাস-প্রবণতা ।[১৫] *বেদে* চলতি ভাষায় রচিত, বর্ণনামূলক ভঙ্গি-আশ্রয়ী। জীবনবাস্তবতার যে চিত্র এখানে রয়েছে তা প্রায়ই কাব্যময়তার আবেশ মাখানো। বলা যায় শব্দবাক্যের শিল্পময়তায় লেখক সৃষ্টি করেছেন ব্যঞ্জনার ব্যাপক-আবহ।

বেদের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্র কিংবা ভাষাবিন্যাসগত দিক দিয়ে কিছু কিছু অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। *বেদের* কাঞ্চন, *কাকজ্যোৎস্নার* নমিতা এবং *বিবাহের চেয়ে বড়োর* অশ্রু— এদের কেউই বিয়ের বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে রাজি হয়নি। তারা উপলব্ধি করেছে— সমাজ-পরিবারের যে বন্ধনের মধ্যে মানুষ বসবাস করে, সেখানে সে এক খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ মানুষ। তার আত্মার পূর্ণ বিকাশ সেখানে সম্ভব নয়। মুক্ত জগতে বিচরণ করার মধ্যদিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় পূর্ণ আত্মারও পরিচয়। এই আত্মানুসন্ধানের মধ্যে যে জীবনের পরম সার্থকতা— এমনিতর বিশ্বাস আরও পরিণত চিন্তা ও উপলব্ধির সহায়ক হয়ে ফুটে উঠেছে *আসমুদ্র* (১৯৩৪) উপন্যাসে। শিপ্রার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে আত্মপরিচয় লাভে সমর্থ হয়নি সৌম্য। এই উপলব্ধি হয়েছে তার বনানীর সংস্পর্শে এসে। বিবাহবন্ধন আসলে নরনারীর প্রাণের পূর্ণস্ফূর্তির পক্ষে অন্তরায়। নিভৃত আত্মার প্রচ্ছন্ন তৃষ্ণাও এর মধ্যদিয়ে নিবৃত্ত হয় না। উপন্যাসগুলোয় প্রধানত এ বক্তব্যই ফুটে উঠেছে।

বেদে এবং *বিবাহের চেয়ে বড়োয়* দাম্পত্তে-বিয়াত্রিচের সংসারবন্ধনহীন একত্রবাস ও সন্তানের জন্মদানের কথা কিংবা ইঙ্গিত রয়েছে।

বেদের কাঞ্চনের মতো ভেসে চলায় আগ্রহী না হলেও *আকস্মিক* উপন্যাসের পঞ্চুর জীবনে তারই মতো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্তত তিনজন নারীর আবির্ভাব হয়েছে। অবশ্য, কাঞ্চনের নারীদের মতো তারা কেউই বিস্মৃতির আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং দু'জন মরে গিয়েও পঞ্চুর স্মৃতিচারণের মধ্যে ফিরে এসেছে।

বেদে উপন্যাসের নারীদের কেউ কেউ— যেমন, মুক্তা ও বনজ্যোৎস্না— সংসার ও সমাজের বন্ধন সত্ত্বেও মুক্তিপিয়াসী। কারণ আত্মা তাদের মুক্ত। *কাকজ্যোৎস্নায়* সংসার-সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে নমিতা, আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে তার ননদ উমা। *আকস্মিক* উপন্যাসে ঘর, সংসার,

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের গণ্ডী থেকে মুক্তি-পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে তার সীমা অতিক্রম করেছে অন্ত্যজ স্তরের নারী— গিরি, দামিনী ও কুঞ্জ।

বেদের বনজ্যোৎস্না এবং *কাকজ্যোৎস্নার* নমিতা, উভয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে তাদের জীবনবাদী সত্তা। ভাগ্যের হাতে ক্রমাগত মার খেয়েও একটি সুস্থ সন্তান লাভের প্রত্যাশায় রত থেকেছে বনজ্যোৎস্না। আর মৃত স্বামীর ছায়ার উদ্দেশে নমিতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

> মৃত অতীতের ছায়ামূর্তির প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই। ...আমি তোমার পথে যাব না। আমি যাব আমার নিজের পথে। জীবনের পথে— পৃথিবীর পথে। ১/৪২৭

কোনো না কোনো নারীকে ঘিরে রোমান্টিক অনুভূতিতে আবেগাপ্লুত হয়েছে *বেদের* কাঞ্চন ও *আকস্মিকের* পঞ্চু। কাঞ্চন মুন্সীর 'ভাজি' আমিনাকে নিয়ে নানা কল্পনা করেছে। আর কুঞ্জকে কাছে পেয়ে পঞ্চুর প্রেমানুভূতি উৎসারণের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়েছে তার একই মনোভাব—

> কুঞ্জকে আজ উহার কী যে ভাল লাগিতেছে বলা যায় না। স্বল্পভূষণ দুইখানি হাত একটি কোমল অথচ অনুচ্চারিত প্রেমবাণীর মত যেন উহার প্রতি উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। ক্ষীণরেখা ভ্রূলতার উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি শুভ্র ললাটটি শরৎকালের আকাশাংশের মত উহার চোখে মধুর লাগিতেছে।... কুঞ্জ যেখানেই পা পাতে, সে- জায়গাটিই পঞ্চুর কাছে পবিত্র তীর্থভূমি হইয়া উঠে,— উহার নবপল্লব পেলব ঠোঁট দুইটি নাড়িয়া-নাড়িয়া যে কথা কয়টি উচ্চারণ করে তাহাই ইষ্টমন্ত্রের মতো পঞ্চু বুকে দাগিয়া রাখিতে চায়। ২/৯৬-৯৭

দেহমিলনের ইঙ্গিত অথবা বর্ণনা রয়েছে *বেদে*, *বিবাহের চেয়ে বড়ো* এবং *প্রাচীর ও প্রান্তরে*। পয়সা, পাখি আর লালপানির বিনিময়ে *বেদের* দাদাবাবু তাঁর তাঁবুতে পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হয়— এমন ইঙ্গিত করেছে কাঞ্চন। *বিবাহের চেয়ে বড়োয়*—

> অশ্রুর মুখখানি প্রভাত নিজের মুখের কাছে সরিয়ে আনলো। পরিপূর্ণ ওষ্ঠপুটে নিবিড় চুম্বন করতে করতে সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলোঃ "I can not show my love except through carnal things" ২/৩১৯

আর *প্রাচীর ও প্রান্তরে*—

> 'আমি একটা নিরাবরণ নগ্নতা চাই'। বলে পুরন্দর সীতাকে কোলের কাছে টেনে এনে অস্থির হ'য়ে প্রথমে তার ঠোঁটে, পরে চিবুকের তলায়, ঘাড়ে ও কাঁধের নিচে বুকের অনাবৃত অংশে চুমু খেতে লাগলো। ৩/৮

কখনো আবার দেহস্পর্শহীন পরম মিলন কাম্য হয়েছে *বেদের* দাদাবাবু এবং *বিবাহের চেয়ে বড়োর* অশ্রু ও প্রভাতের কাছে। একই তাঁবুর নিচে, বুকের মধ্যে 'কথা কইতে না পারার অকথিত কান্না' পুষে সারারাত অতিবাহিত করেছে দাদাবাবু ও তার প্রেমিকা মাধু। আর অশ্রু ও প্রভাত—

> একটুখানি দূরে সরে গিয়ে ওরা এখন যেন গভীর হয়ে উঠছে, অজস্র চাঞ্চল্যের ওপর নেমেছে ভাবের গাঢ় মন্থরতা, ব্যাকুল প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে অনুভূতির অবিচল তন্ময়তা। ২/৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

নারী-নিগ্রহের উল্লেখ রয়েছে *বেদে* এবং *আকস্মিকে*। স্বামীর সংসারে থেকেও অন্যকে ভালোবাসার অপরাধে নিগৃহীতা হয়েছে *বেদে* উপন্যাসের সৌম্যর দিদি। আর *আকস্মিকে* রয়েছে জৈব-ক্ষুধায় আক্রান্ত স্বামী শশী কর্তৃক পরপুরুষে আসক্ত স্ত্রী দামিনীকে হত্যা করার বর্ণনা। প্রেমে ঈর্ষান্বিত হয়েছে *বেদের* কাঞ্চন, তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যথাক্রমে নটরু, টিনুদা এবং গোবিন্দকে ঘিরে। *আকস্মিকে*—

> পঞ্চু এবার আর সহিতে পারিলনা, অমানুষিক ঈর্ষায় তাহার শিরা- উপশিরাগুলি পর্যন্ত শূলবিদ্ধ সাপের মত মোচড় দিয়া উঠিতে লাগিল...। ২/৯৯

আর *প্রাচীর ও প্রান্তরে* পুরন্দর—

> জানালাটা ঠেলে উঁকি মেরে দেখলো সীতা দিলীপের তক্তপোষের উপর দিলীপের বিছানায় দিলীপের বালিশে মাথা রেখে বিভোর হ'য়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে।... দিলীপ ঘরে নেই বটে, কিন্তু তারইত' তক্তপোষ, বিছানাময় তারই ফেনায়িত স্পর্শ, দেয়ালে-মেঝেয় টেব্‌লে-সেলফে সব কিছুতে তারই কৌতূহল দৃষ্টি!
>
> পুরন্দর ক্ষিপ্তের মতো দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। ৩/৬৮-৬৯

একজনের স্ত্রী হলেও অন্যজনের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী চরিত্র রয়েছে *বেদে* এবং *বিবাহের চেয়ে বড়োয়*। *বেদের* বনজ্যোৎস্না প্রবোধের স্ত্রী, কিন্তু দেবরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। *বিবাহের চেয়ে বড়োয়* অশ্রুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সনাতন সংস্কারের বিরুদ্ধ-উচ্চারণ—

> একজনের স্ত্রী হয়েছি বলে আরেকজনের বন্ধু থাকতে পারবো না। এত বড়ো একনিষ্ঠতার বড়াই করলে আমার গা জ্বলে। গৃহিণী অর্থ সমস্ত বাহিরকে ঠেলে ফেলে গৃহবন্দিনী হয়ে থাকা নয়। ২/২৩৩

বেদের মুক্তা, বনজ্যোৎস্না, সৌম্যের দিদি—এরা সবাই বিবাহিতা নারী এবং প্রত্যেকেরই স্বামী বর্তমান। তবু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্যপুরুষে তাদের আসক্তি রয়েছে। *কাকজ্যোৎস্নার* নমিতা (বিধবা), *আকস্মিকের* গিরি (পতিতা), দামিনী ও কুঞ্জ (বিবাহিতা এবং স্বামীর সংসারে অবস্থানরত)—এরাও তাই। অথচ কেউই তারা অনূঢ়া নারী নয়।

সমকাললগ্ন বৈরী বাস্তবতায় শিক্ষিত বেকার তরুণের যন্ত্রণাবিদ্ধ অনুভূতি বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে *বেদে* উপন্যাসের 'বনজ্যোৎস্না' অংশের অনেকটা জুড়ে এবং 'মৈত্রেয়ী' অংশেও, *বিবাহের চেয়ে বড়োয়ও* রয়েছে এর পরিচয়—

> এ জীবন একটা অনাবাদী জমি, শুধু কাঁটা জঙ্গলে বোঝাই। বিয়ে করে চারহাজার টাকা পণ পাবার আশা—তাই বা কতদিন! আর তার খেসারত একটা মেয়ে-ব্যাঙাচি, তারই সঙ্গে নটখটি করে জীবন কাবু ও কাবার করে দেওয়া। পান্তা ভাত আর পাকাল মাছ খাবে, দশটা পাঁচটা করবে— একটা সন্তান চিতায় আরেকটা আঁতুড়ে— এমনি হতে-হতে যে কটা হাতের পাঁচ থাকবে— কী করবে তারা? কোথায় তাদের ঘর, তাদের ভবিষ্যৎ ? ২/১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বেদেতে দরিদ্র বস্তিবাসী, অন্ত্যজ সমাজস্তরের চিত্র রয়েছে। *আকস্মিক* উপন্যাসে রয়েছে ভদ্রেতর দরিদ্র মানুষের কথা, *বিবাহের চেয়ে বড়োয়* স্বল্প আয় ও অধিক সন্তানময় সংসারের যা পরিবেশ, তার ইঙ্গিত রয়েছে।

আবার কোথাও কোথাও চরিত্রের আচরণে কিংবা লেখকের মানসাকাঙ্ক্ষায় ব্যক্ত হয়েছে প্রত্যাশারও ইঙ্গিত। বেদের 'বাতাসি' অংশে, 'বনজ্যোৎস্না' এবং 'মৈত্রেয়ী' অংশে চরিত্রের প্রত্যাশা কিংবা আশাবাদ-আশ্রয়ী আচরণ দেখা যায়। তেমনি লেখকের প্রত্যাশাদীপ্ত মানসাকাঙ্ক্ষা শিল্পরূপ লাভ করেছে চরিত্রের মধ্য দিয়ে *আকস্মিকে* ঃ

> যেন এই অন্ধকার পার হইয়া ও কোন প্রভাতের পানে চলিয়াছে। ২/৩৪

অন্ত্যজ সমাজস্তরের মানুষের জীবননিভৃতের সত্য পরিবেশিত হয়েছে *বেদের* কাঞ্চন এবং *আকস্মিকের* পঞ্চুর ভাষ্যে। *বেদেতে* বস্তিবাসী মানুষের জীবনবাস্তবতার এবং শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের মর্মসত্য বর্ণনা করেছে কাঞ্চন, *আকস্মিকে* করেছে পঞ্চু। ঈশ্বরের হৃদয়হীন নিস্পৃহতার বিরুদ্ধে কটাক্ষ রয়েছে *বেদে* এবং *আকস্মিকে*। বস্তির দীনবন্ধুকে খেপানোর জন্যে তার নামধরে নাকীসুরে ডাকে লোকে, আর—

> ও দীনবন্ধু, তেমনিই... দাঁত মেলে বলত—আমি সাড়া দিই না।
>
> সত্যিই। সাড়া দেয়না সে। হয়তো এই দীনবন্ধুর মতোই দাঁত বার করে হাসে।
>
> *বেদে* ঃ ১/১৯৫
>
> এতবড় নিষ্ঠুরতা বিধাতাকে মানাইলেও নগণ্য কুঞ্জকে মানায়না। *আকস্মিক* ঃ ২/১০৫

ভাষা কাব্যব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে— *বেদে*, *আকস্মিক*, *বিবাহের চেয়ে বড়ো* ও *প্রাচীর ও প্রান্তরে*। বেদের 'বাতাসি' অংশের প্রায় সবটুকু জুড়েই অচিন্ত্যকুমারের কবিপ্রাণতার পরিচয় বর্তমান। তেমনি ভাষার কারুকার্য কখনো কখনো অভিন্ন হয়ে ধরা পড়েছে *বেদে* ও *আকস্মিকে*—

> রাক্ষসী নদীটা তার দুই পাড়ের বন্ধন ভেঙে হুড়মুড় করে ডাঙায় এসে পড়েছে কোটি-কোটি ফণা তুলে। ঢেউয়ের পর ঢেউ— যেন মহাসমুদ্র। *বেদে* ঃ ১/১৯২
>
> ঝড়ের সর্প তখন আকাশে কোটি-কোটি ফণা তুলিয়া দংশন লোলুপ জিহ্বা মেলিয়া কিলবিল করিতেছে। *আকস্মিক* ঃ ২/৪৪

বাকবিন্যাসের সাযুজ্যও দুর্লক্ষ্য নয়—

> নুলোর অসাড় পঙ্গু হাত-পা দুটো যেন সহসা জলতরঙ্গের বাদ্য হয়ে উঠেছে।
>
> *বেদে* ঃ ১/১৮২
>
> তার সমস্ত দেহ সেতারের মতো ঝঙ্কার করে উঠলো। *বিবাহের চেয়ে বড়ো* ঃ ২/১৫২
>
> ভাঙা থুথুড়ো বাড়ি হঠাৎ একদিন বেচারী পথচারীদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
>
> *বেদে* ঃ ১/২০৩
>
> থুথুরো কাঁচা ঘর, দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তুফান একটা তুড়ি দিলেই সাবাড়। *বিবাহের চেয়ে বড়ো* ঃ ২/১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

[মৈত্রেয়ীর] মাথার কাপড়টা শিথিল চুলের সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে আঁটা নয়—
বেদে ঃ ১/২৪৬

[অশ্রুর] ...মাথায় ছোট একটুখানি ঘোমটা, হেয়ারপিন দিয়ে আঁটা নয়। *বিবাহের চেয়ে বড়ো* ঃ ২/১৭০

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় অংশ (কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১৩৮১), পৃঃ ৬০২।

২। ১৯৩০ সনের আগস্ট মাসে নীহারকণা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ছদ্মনামের 'নীহারিকা দেবী' এবার 'নীহারকণা' হয়ে দেখা দিলেন বলে রহস্য করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার। তথ্যঃ *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১২।

৩। জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

৪। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮। সিগনেট প্রেস (কলকাতা) প্রথম সিগনেট সংস্করণ প্রকাশ করে ১৩৫৪ সালে, এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬২ সালে।

৫। *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩৬।

৬। ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩৩৭ সালে অচিন্ত্যকুমারের *আকস্মিক* উপন্যাস প্রকাশ করে। তার জ্যাকেটে *বেদে* উপন্যাস সম্পর্কে এরকম প্রশংসাসূচক মন্তব্য ছিল।

৭। ১৩৭৯ সালে শঙ্খ-প্রকাশন অচিন্ত্যকুমারের চারখানা উপন্যাস— *বেদে*, *বিবাহের চেয়ে বড়ো*, *প্রচ্ছদপট* ও *একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী*— একসঙ্গে *চতুষ্ক* নাম দিয়ে প্রকাশ করে। গ্রন্থের ভূমিকায় অচিন্ত্যকুমার তাঁর *বেদে* সম্পর্কে এই উক্তি করেন। দ্রঃ *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩৮।

৮। পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতাঃ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮), পৃঃ ১৯৪-৯৫।

৯। ঐ, পৃঃ ১৯৪।

১০। অনুবাদটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে।

১১। *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭৭।

১২। ঐ , পৃঃ ৬৬১।

১৩। ঐ, পৃঃ ৬৭৭।

১৪। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।

১৫। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জগদীশ গুপ্ত ঃ অসাধু সিদ্ধার্থ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জগদীশ গুপ্ত ঃ অসাধু সিদ্ধার্থ

কল্লোলের অনেক লেখকের চেয়ে বয়সে বড়ো হয়েও সাহিত্যিক প্রকাশ হয়েছিল তাঁদের চেয়ে বিলম্বে— এমন একজন স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। কুষ্টিয়া[১] শহরের গড়াই নদীর তীরবর্তী আমলাপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদিবাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী[২] গ্রামে। পিতামহ আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন কবিরাজ। তাঁর দুইপুত্র[৩]— কৈলাসচন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র, দুজনেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। কৈলাসচন্দ্র ও সৌদামিনী দেবীর ছয়সন্তানের মধ্যে জীবিত দু'সন্তান— যতীশচন্দ্র (১৮৮০-১৯৫৮) ও জগদীশচন্দ্র। তাঁদের কৌলিক পদবী 'সেনগুপ্ত'র সেন ব্যবহার করতেন না তাঁরা কেউই। পিতা কৈলাসচন্দ্র, কাকা প্রসন্নকুমার ও বড়োভাই যতীশচন্দ্র— এই তিনজনেই কুষ্টিয়া আদালতে আইনব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র নিজে লেখাপড়ায় তেমন অগ্রসর হতে পারেননি। খেয়ালি ও জেদি স্বভাব আর কিছুটা স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁর পড়াশোনার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। স্ত্রী চারুবালা দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়— ছোটবেলা থেকেই এবং পরবর্তী জীবনেও শারীরিকভাবে তেমন সুস্থ ছিলেন না তিনি। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনায় ব্যাঘাতের এও একটা কারণ।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল কুষ্টিয়া শহরে, পণ্ডিত রামলাল সাহা দেবভূতির (১৮৪৭-১৯৪৩) পাঠশালায়।[৪] তারপর কলকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে এসে ভর্তি হন রিপন কলেজে। এ কলেজে পড়ার সময়েই, কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত খোক্সা থানার ওসমানপুর গ্রামের যদুনাথ সেনগুপ্তের বারো-তেরো বছর বয়সী কন্যা চারুবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় (১৯০৬)।[৫] দ্বিতীয়বর্ষে পড়ার সময়ে টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় প্রায় চল্লিশ দিন তাঁর কলেজ কামাই হয়। সেবছর কলেজ থেকে তাঁকে এফ. এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি বলে রাগ করে সে কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনি। তাঁর আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার এখানেই সমাপ্তি।

এরপর শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখে প্রথমে (১৯০৮-১১) সিউড়ি জজকোর্টে জব টাইপিস্টের কাজ নেন। তারপর উড়িষ্যার সম্বলপুরে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে টাইপিস্টের চাকরি (১৯১২-১৩) গ্রহণ করেন। কর্মক্ষেত্রে কড়া মাশুল দিয়েও তাঁর আত্মসম্মান বজায় রাখার একাধিক ঘটনার কথা জানা যায়। ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মকর্তার সঙ্গে তর্কাতর্কির এক ঘটনায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন কর্মের উদ্দেশ্যে *গুপ্তের গল্প* নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর Jago's Ink নামে ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরি ব্যবসায়ের চেষ্টা করে, পরে বোলপুর চৌকি আদালতে (১৯২৭-৪৪) টাইপিস্টের কাজ করেন। মাঝে কিছুদিন কাপড়ের ব্যবসাও করেছেন।[৬] ত্রিশ বছরেরও কিছু বেশি সময়কার চাকরিজীবন ক্রমান্বয়ে সিউড়ি, সম্বলপুর, কটক, পাটনা ও বোলপুরে অতিবাহিত করেন। ১৯৪৪ সালে কাজ থেকে অবসর নিয়ে সস্ত্রীক কলকাতায় খুড়তুতো ভাই ক্ষিতীশচন্দ্রের পরাশর রোডের বাসায় বসবাস করেন। তারপর যাদবপুরের কাছে রামগড় কলোনিতে নিজের বাড়িতে উঠে আসেন ১৯৫০ সালে।[৭] জীবনের শেষ সাতটি বছর তাঁর এখানেই

Dhaka University Institutional Repository

কাটে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত ও অসুস্থ হলে খুড়তুতো ভাইয়েরা তাঁকে পরাশর রোডে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেখানেই ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শেষদিকে (১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে) ভারত সরকার কর্তৃক ১৫০ টাকা সাহিত্যিক ভাতা মঞ্জুর হলেও পরে তা ৭৫ টাকায় কমিয়ে আনা হয়। দৃষ্টিশক্তি ক্রমে হ্রাস পেয়ে যাওয়া, শারীরিক অসামর্থ্য এবং যোগ্যস্বীকৃতি ও সম্মানের অভাবে তাঁর মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি ঘনিয়ে উঠেছিল। অর্থাকাঙ্ক্ষা তীব্র না হলেও ন্যায্য সম্মানির প্রত্যাশা ছিল, এ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনের শেষদিকে লেখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন অগ্রসর না হলেও তাঁর পড়াশোনার পরিধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। শৈশবেই স্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল জননীর সাহিত্য-পাঠের প্রভাব, ফলে কিশোর বয়সেই স্ফুরিত হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যচর্চার লক্ষণ। সাহিত্যিক আসরের প্রতি আকর্ষণ ছিল, কিন্তু স্বভাবগত সঙ্কোচের কারণে তা তেমন প্রকাশ পেতোনা। হারমোনিয়ম, বাঁশি, এস্‌রাজ, বেহালা— চারিটি বাদ্যযন্ত্রই তাঁর ভালো আয়ত্ত ছিল। একমাত্র এইসব আসরেই তাঁর মর্মবাসী মজলিশি মানুষটিকে চেনা যেতো।

স্বভাবে কোমল অথচ আত্মসম্মানবোধে দৃঢ় ও অনমনীয় এই মানুষটি খ্যাতি বা অর্থলোভে ফরমায়েশি লেখায় প্ররোচিত হননি কখনো। বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়— জনৈক প্রকাশক জগদীশ গুপ্তের *কলঙ্কিত তীর্থ*[৮] উপন্যাসের কিছু পরিবর্তন সাধন করে দেবার জন্যে অনুরোধ করে পাঠালে তাঁর দেওয়া অগ্রিম টাকা ফেরত দিয়ে তিনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসেন। এই টাকা ফেরত দেবার জন্যে তাঁকে ঋণগ্রস্তও হতে হয়েছিল। এভাবে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে আসার আরও ঘটনা রয়েছে। তবে লেখার ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি কখনোই বিরক্ত হননি। আর্থিক প্রয়োজনে বেশ কিছু গ্রন্থের স্বত্ত্ব বিক্রয় করে দেওয়ার কথাও জানা যায়। পাঠকরুচি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে তিনি কখনো ব্যস্ত হননি।

স্বীয় জীবনের ব্যর্থতাকে জগদীশ গুপ্ত নিজের উপন্যাসের স্থানে স্থানে শিল্পিত বক্তব্যে বিন্যস্ত করেছেন। মানব জীবনের ব্যর্থতা ও পঙ্কিলতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও বোধ ছিল অপরিবর্তনীয়। সম্পূর্ণরূপে আশাবাদ-বঞ্চিত এই লেখকের গোটা জীবন কেটেছে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, কোনো সম্মান কী পুরস্কারবিহীনভাবে। তাঁর 'মৃত্যুও হয় অনেকেরই অগোচরে। তিনি বামপন্থীদের দলে যাননি, বড় পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হননি, তাই তাঁকে কেউ উৎসাহ জোগায়নি'।[৯] তাঁর মৃত্যুতে *শনিবারের চিঠির* 'সংবাদ সাহিত্যে' একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] সম্ভবত এটি লিখেছিলেন সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। গতানুগতিকতার ব্যতিক্রমী সাহিত্য সৃষ্টি করেও তাঁর যোগ্য প্রাপ্তি না হওয়ায় এতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। তাঁর ভাষার জোর এবং চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যের প্রশংসাও ছিল তাতে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-শরতোত্তর বাংলাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে' বলে প্রশংসা ও শোকজ্ঞাপন করেছিল *যুগান্তর* পত্রিকা।[১১] *দেশ* পত্রিকা এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে—

> রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের রচনায় নৈপুণ্য, নতুন রূপ ও রস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আশীর্বাদ করিয়াছিলেন— কিন্তু অনুতাপের বিষয়, সেই শিল্প নৈপুণ্য, রূপ ও রসের স্বাদ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা বর্তমান পাঠক সমাজের আর দেখিনা। তাহার প্রধান কারণ,

Dhaka University Institutional Repository

> জগদীশ বাবুর গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রচারের প্রতি প্রকাশকের কৃপণতা। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম পথিকৃৎ এই শক্তিমান শিল্পীর রচনা সাধারণের লভ্য করিবার সুব্যবস্থা করিলেও বর্তমান ও ভাবীকালের সাহিত্যপাঠক যে লাভবান হইবেন, সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ নাই।[১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *লঘুগুরু* উপন্যাস সম্পর্কে *পরিচয়* পত্রিকার কার্তিক, ১৩৩৮ সংখ্যায় যে দীর্ঘ আলোচনা করেন, তার শুরুতে ছিল—

> 'লঘুগুরু' বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে, একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।[১৩]

তাঁর রচনার সর্বত্র নানানভাবে স্বাতন্ত্র্য তিনি বজায় রেখে গেছেন। কলমে শক্তি নিয়েও তিনি নিজে ছিলেন সস্তা জনপ্রিয়তার প্রলোভন থেকে মুক্ত। এ নিভৃতচারিতার জন্যেই সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁকে প্রায় বিস্মৃতির অন্ধকারেই রেখে দিয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, অনেকের কাছে অদেখা এবং অনুপস্থিত হয়েও 'আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি ছিলেন একটা বড় রকমের বেগ'।[১৪]

কর্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গার বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। এ পরিচয় সূত্রেই তাঁর রচনায় মানুষের নানারকম আচরণ ও শঠতাময় অন্তর্স্বরূপকে তুলে ধরতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। সাধারণ জীবন পরিবেশের বিষয়কে আশ্রয় করেও পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এক অসাধারণ জীবনবোধের পরিচয়। এ যেমন তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে। তাঁর ছোটগল্প বেশি প্রশংসিত হলেও উপন্যাসের গুরুত্ব যথেষ্ট। যতদূর জানা যায়— তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাঁইত্রিশ।[১৫] আর প্রাপ্ত উপন্যাসের সংখ্যা আঠারো। এগুলোর প্রকাশকাল সর্বত্র স্পষ্ট নয়। তাঁর লেখা কবিতা এবং প্রবন্ধও রয়েছে। কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু, পনেরো ষোলো বছর বয়সে অভিভাবকদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া তাঁর কবিতার খাতায় রয়েছে এর সাক্ষ্য। সাহিত্য জীবনের শেষও তাঁর কবিতা দিয়েই। ১৩৬৩ সালের *যুগান্তর* শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিষাক্ত বন্দর' কবিতাটিই সম্ভবত তার শেষ রচনা।[১৬] জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসগুলো হচ্ছে— *অসাধু সিদ্ধার্থ*– ১৩৩৬, *লঘুগুরু*– ১৩৩৮, *তাতল সৈকতে*– ১৩৩৮, *দুলালের দোলা*– ১৩৩৮, *রোমন্থন*– ১৩৩৮, *সূতিনী*– ১৩৪০, *গতিহারা জাহ্নবী*– ১৩৪২, *যথাক্রমে*– ১৩৬০, *নন্দ আর কৃষ্ণা*– ১৩৫৪, *মহিষী*– ১৩৩৬, *নিষেধের পটভূমিকায়*–১৩৫৯, *নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ* (গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের তথ্য নেই।) *রসচক্র*–ঐ, *দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা*–১৩৪৬, *সত্রভোগ*– (গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের তথ্য নেই।) *শনিবারের শাঁখা*–ঐ, *চৌধুরাণী*–ঐ, *কঙ্ক*–ঐ। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য জীবনে যা তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর প্রকাশিত রচনার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। *কল্লোলে* প্রকাশিত তাঁর রচনা মাত্র ছয়টি এবং তার সবই গল্প। *কল্লোল* ছাড়াও তিনি লিখেছেন *কালিকলমে*। ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৫ পর্যন্ত *কালিকলমের* প্রায় চল্লিশটি সংখ্যায় তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা একুশ। তাঁর গল্পের ব্যতিক্রমী অথচ দৃঢ়-সংহত বলিষ্ঠতার কারণে তাঁকে 'গল্প-ত্রিশক্তির অন্যতম শক্তিধর

Dhaka University Institutional Repository

লেখক' বলে উল্লেখ করেছেন অবন বসু।[১৭] *বঙ্গবাণী, বিজলী, উত্তরা, ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, সোনার বাংলা, জাগরণ, দীপিকা* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস *অসাধু সিদ্ধার্থ*।[১৮] উপন্যাসের কাহিনীটি মোটামুটিভাবে এই ঃ জন্ম এবং পরিবেশ সূত্রে গড়ে ওঠা এক নষ্টমানুষ নটবর দাস। জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে এক বৈষ্ণবীর গর্ভজাত অবৈধ সন্তান সে। ফলে জন্মসূত্রেই জীবনের সহজপথ তার কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়। জীবনের শুরুতে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, বিভিন্ন কর্ম গ্রহণ করতে হয় তাকে। কখনো মুদির দোকানের ভৃত্য, কখনোবা থিয়েটারে রাজকন্যার সখী। অভিনয়ের প্রয়োজনে উচ্চারণ শোধিত হয় তার, মেধা ও আগ্রহের বদৌলতে সুযোগ লাভ করে স্কুলে পড়াশোনা করার। অর্থের প্রয়োজনে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সেবাদাসরূপে নিয়োজিত হয় সে। বৃদ্ধার মৃত্যু হলে তার সঞ্চিত অর্থে ব্যবসা শুরু করে নটবর, কিন্তু ব্যবসায়ে আসে ব্যর্থতা। একপর্যায়ে রাসবিহারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হয়। সুন্দর চেহারা ও শিক্ষাদীক্ষাপ্রসূত আচার ব্যবহারের নৈপুণ্য তার অনুকূলে কাজ করে। সিদ্ধার্থ নামে এক ধনবান এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যুবক মৃত্যুবরণ করলে নিজের নাম মুছে ফেলে তার পরিচয় ধারণ করে নটবর। সিদ্ধার্থের নাম লেখা রূপোয় বাঁধানো লাঠি নিয়ে সে বনে যায় নতুন মানুষ। স্বল্পকালীন হলেও সিদ্ধার্থের সান্নিধ্য তার স্বভাবের গভীরে প্রভাব সঞ্চার করেছিল। ফলে, বিধবা এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েও 'মহাপাতকের দ্বার' থেকে ফিরে আসতে সমর্থ হয়। এক সময়ে প্রবঞ্চকের জীবনে ক্লান্তি নামে তার এবং শুদ্ধ জীবনযাপন করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু অতীতের সঙ্গী রাসবিহারী বারবার এসে তার পাওনা টাকার তাগিদসহ প্রতারণামূলক কাজে প্ররোচিত করতে থাকে তাকে। একদিকে নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য ও অসংখ্য পাওনাদারের নিরন্তর তাগিদ, অন্যদিকে পাঁক ও ক্লেদময় জীবনে বিতৃষ্ণা— সব মিলিয়ে মানসযাতনায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে যায় নটবর। কিন্তু সেইক্ষণে, অজয়া নামের এক তরুণীকে দেখে জীবনের ইতিবাচক এক নতুন অর্থ অনুভূত হয় তার কাছে। বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে সে অজয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে। দিনে দিনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে পড়ে অজয়া। কিন্তু তাদের সম্পর্ক পরিণয়ে পৌঁছার ঠিক পূর্বমুহূর্তে আসল সিদ্ধার্থের মাতামহ কাশীনাথ এসে নটবরের জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সমস্ত অতীত ইতিহাস প্রকাশ করে দেন। নটবর যে তাঁরই বিধবা কন্যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল একদিন, তাও বলতে বাকী রাখেন না।

অসাধু সিদ্ধার্থ উপন্যাসে প্রধান তিনটি চরিত্র। গৌণ চরিত্রের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। কাহিনীগত বিশেষত্বের চেয়ে চরিত্রচিত্রণে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির সচেতনতাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। কী গল্প, কী উপন্যাস তাঁর সব রচনারই এ এক সাধারণ লক্ষণ। এখানে প্রতিটি চরিত্রই নিজের ভূমিকা ও ঘটনাপরম্পরায় কাহিনীকে পরিণতি দান করেছে। চিরচেনা মানুষের মর্মবাসী অচেনা সত্তাটির উদ্‌ঘাটনই জগদীশ গুপ্তের চরিত্র সৃষ্টির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ক্রূরতা, কাপট্য, ছলনা ও চাতুর্যের বৈশিষ্ট্যধারী চরিত্রগুলোকে উজ্জ্বল ও জীবনরসে ভরপুর করে অঙ্কন করতে অধিক সমর্থ হয়েছেন তিনি। নটবর বা ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ বিত্ত ও স্বভাবে এবং সামাজিক মর্যাদায় নিচুস্তরের মানুষ। জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রতারণামূলক কাজ করে, নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও 'মাতৃঅঙ্গের অলঙ্কার' বলে গিল্‌টি সোনার

Dhaka University Institutional Repository

অনন্তজোড়া বন্ধক রাখে। রাসবিহারীর পত্রভাষ্যে জানাযায়— তার দেহকান্তি এবং বাহ্যিক আচরণ অসাধারণ। সে ভালো ইংরেজি জানে এবং কথাবার্তা ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক ভাবভঙ্গির মধ্যদিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনেও সমর্থ হয়। স্কুল, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী যুবক সিদ্ধার্থের প্রভাবে দুষ্ট জীবনযাত্রা থেকে উত্তরণের স্বপ্ন দেখে সে, কিন্তু অতীতের কর্মপরম্পরা এবং তার স্বভাবগত দুর্বলতার কারণে তা হয়ে ওঠে না। তার স্বভাবের দু'টি দিক— একটি, প্রকাশ্য জীবন ও আচরণ; অন্যটি, তার সংগুপ্ত অনুভূতির জগৎ। বাইরে সে আত্মশক্তিতে দৃঢ়, মর্মলোকে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী। নিজের চেহারা-অবয়বে সে লক্ষ করে সৌভাগ্যবানের লক্ষণ, কিন্তু অর্থ-সম্পদহীন, ঋণভারজর্জর বলে একে লুকোতে চায় সে। পাশের ঘরে শ্রমজীবী মানুষটিরও প্রাণে গান আছে, আনন্দ আছে। আর এ ঘরে সে নিরানন্দ। তার শরীর ক্ষুধার্থ, আত্মা ক্ষুধার্থ। অনুভূতির কান দিয়ে নিজের বিরূপ ভাগ্যের পদধ্বনি শোনে সে। মানুষের সংসারে টিকে থাকার অনুপযোগী বিবেচিত হয়ে নটবর এবার আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়। তার চরিত্রের দুটি স্তরের প্রথমটি এখানে সমাপ্ত, দ্বিতীয়টির শুরু এরপর থেকে। আপাত-হতাশার নিভৃতে গোপনে কাজ করে চলেছিল তার প্রগাঢ় জীবনতৃষ্ণা। এ জানা যায় তার চরিত্রের পরবর্তী বিশেষত্বে। প্রকৃতিরাজ্যের সর্বত্র সে লক্ষ করছে— টিকে থাকার জন্যে সহজাত প্রবণতার এক সাধারণ ধর্ম। অজয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার অনুভূতির মধ্যে এ জীবনতৃষ্ণারই পরিচয় ধরা পড়ে। অজয়ার রূপের এবং পরে ধনেরও আকর্ষণজনিত স্বার্থচিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করেছে। নিজের কাছে দেওয়া কৈফিয়তের মধ্যেও মেলে এরই সন্ধান।

> জীবন-যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীটপতঙ্গে আছে, উদ্ভিদেও আছে— সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইবনা? ...কীটপতঙ্গ,উদ্ভিদ রং বদলায়। আমি একটু নাম বদলেছি; ...১/১২০

অজয়ার সঙ্গে সম্পর্কের প্রয়োজনে সে নানারকম প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অজয়ার সামনে মূর্ছা যাবার অভিনয় করে 'নিখুঁত' অভিনয়ের জন্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। অবশ্য এসবের মূলেও ক্রিয়াশীল ছিল পাপজীবন থেকে উত্তরণের এবং অজয়ার প্রেমের নীড়ে মানসআশ্রয় লাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মর্মবাসী ভয় এবং অপরাধবোধ তাকে রেহাই দেয়না। কলুষিত জন্ম ও বিকারগ্রস্ত অতীতজীবনের যন্ত্রণা তাকে অহরহ পীড়ন করেছে। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার এক স্বস্তি কেড়ে নেওয়া ভয় তাকে কখনোই সুস্থির হতে দেয়নি।

প্রতারণায় সে যতোটা দক্ষ ও সমর্থ, সুস্থ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে ততোটাই অযোগ্য এবং ব্যর্থ। অতীত জীবনে সে বৃদ্ধা বারাঙ্গনার অর্থে ব্যবসা করতে গিয়ে নিঃস্ব এবং ঋণগ্রস্ত হয়েছে। অতীত পাপের শাস্তি ভোগ করেছে নিজের মধ্যে নিজে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে। আবার বাঁচার তাগিদ অনুভব করে এর সপক্ষে সে যুক্তিও দাঁড় করিয়েছে। নটবরের যে জীবনসমস্যা—তার দু'টি স্তর। জীবনবাদ ও অপরাধজনিত হীনমন্যতা। জীবনবাদী সত্তা যতোবার আশাকে আশ্রয় করে সজাগ হয়েছে, ততোবারই তার নিজের কিংবা রাসবিহারীর কারণে পূর্বকৃত অপরাধের যন্ত্রণা ও হীনমন্যতা মাথা তুলেছে। ফলে অজয়ার প্রেমের শুদ্ধ মন্দির থেকে পলায়নকেই সে শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু অনতিক্রম্য অভাবের চিন্তা আবার তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের শেষে কাশীনাথের কথা বাদ দিলেও কাহিনীর যে পরিণতি, তা আসলে নটবরেরই মর্মনিহিত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মানস-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। তার যন্ত্রণাপ্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে একে ট্র্যাজেডির নায়কের লক্ষণের সঙ্গে মেলানো যাবেনা। অসহায়ের প্রতি, দুর্বলের প্রতি যেমন, নটবরের প্রতি পাঠকের তেমনি একধরনের করুণা জাগে, তবে সে করুণা শ্রদ্ধাহীন।

স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে পাহাড়ে বেড়াতে আসা উচ্চবিত্ত সমাজের দুই ভাই বোন— রজত ও অজয়া। মাতাপিতৃহীন এ ভাইবোন দুটি পরস্পরের সঙ্গে এক নিবিড় মমতার বন্ধনে গাঁথা। ভাইয়ের শরীর-স্বাস্থ্য, জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে অজয়ার যেমন উৎকণ্ঠার অন্ত নেই, রজতের তেমনি বোনের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় প্রাণে স্বস্তি নেই। রজত আবেগতাড়িত মানুষ নয়, সম্পূর্ণরূপে বাস্তবচেতনা সম্পন্ন। যে কোনো কিছুকে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের আলোকেই সে গ্রহণ করে। বোনের স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ভাবাবেগমুক্ত নিজের বাস্তবজ্ঞানকেই গুরুত্ব দিয়েছে সে। মানুষের কথা ও আচরণের নিভৃতে তার লুক্কায়িত গোপন স্বভাবটিকে আন্দাজ করে নেবার এক সহজ ক্ষমতা তার রয়েছে। সুনিপুণ অভিনয় সত্ত্বেও সিদ্ধার্থকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে তারই প্রথমে মনে হয়েছিল। সে স্পষ্ট অনুমান করেছে— তার মধ্যে 'একটা তীক্ষ্ণ চঞ্চু এবং বক্রচঞ্চু অভিসন্ধি যেন সাবধানে ওৎ পাতিয়া আছে'! তবে যুক্তিতর্ক দিয়ে এই সন্দেহটিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা তার নেই। অজয়াকে বুঝিয়ে বলার ব্যাপারে পিসিমার কথার উত্তরে তাই সে বলেছে—

> কে ? আমি ? তর্কে আমি তার সঙ্গে কোনোদিন পারিনে। ১/১৩৫

একদিকে সিদ্ধার্থকে ঘিরে দানা বেঁধে ওঠা সন্দেহ, অন্যদিকে বোনকে কষ্ট না দেবার মর্মগত তাগিদ— সব মিলিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের চরম দোলাচলের মধ্যে একসময়ে তার মনে হয়েছে—

> যাদের ভগিনী নেই তারা আছে ভাল। ১/ ১৩০

রজতের চেয়ে অজয়ার চরিত্রবিন্যাসে লেখক অধিক আন্তরিক। একই বৃন্তস্থিত হয়েও দু'ভাইবোনের মানসগঠনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। অজয়া সুদর্শনা, সেলাই ও সঙ্গীতে নিপুণা, চিত্রশিল্পে 'প্রাইজ হোল্ডার'— কিন্তু মানবচরিত্র-অনুধাবনে অসমর্থ। এসব ক্ষেত্রে সে যুক্তি বুদ্ধির চেয়ে আবেগকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আবেগাশ্রয়ী এ অপরিপক্ব বিচারপ্রবণতাই তার চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। সিদ্ধার্থের কথাবার্তার ধরনে তাকে 'বিরক্ত সন্ন্যাসী' কি অন্যকিছু বুঝে উঠতে না পেরে যখন রজত ভাবছেঃ 'লোকটার মাথায় ক্রু ঢিলে আছে...', অজয়া তখন 'সাতকোটি সন্তানের যিনি জননী' তাঁর ভাষাতীত আহ্বানে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগী ও অস্থির বলে মনে করে তার জন্যে সহানুভূতি অনুভব করছে। পথ থেকে তার কুড়িয়ে আনা অস্পৃশ্য শিশুদের বিষয়ে আবেগনির্ভর বক্তব্য রেখে সিদ্ধার্থ বিদায় নিলে, তার বিলীয়মান পায়ের শব্দ তাকে বেদনার্ত করে তুলেছে। ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাসূত্রে তার যে অনুভূতির সূচনা, তা-ই পর্যায়ে পর্যায়ে তাকে প্রেমের পথে অগ্রসর করেছে। চা মাটি করেছে বলে সিদ্ধার্থের নিন্দে করায় রজতের উপর রাগ করে অজয়া। সিদ্ধার্থের কথা শুনতে শুনতে তার মুখাবয়বে 'অতুল শ্রীসম্পন্ন একটি দীপ্তি' ফুটে ওঠে। কখনো আবার পিসতুতো ভাই বিমলকে সিদ্ধার্থের সম্পর্কে প্রশ্ন করেই 'আরক্ত' হয়ে ওঠে সে। কয়েকদিনের একটানা অদর্শনে তার অসুস্থতার আশঙ্কা জাগে অজয়ার মনে। কখনো আবার কল্পনায় সিদ্ধার্থের 'আত্মনিপীড়িত তপোশীর্ণ সাধকের' মূর্তি ভেসে ওঠে তার সামনে।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর, সিদ্ধার্থের পরিচয় সম্পূর্ণ করে জেনে নেবার আগ্রহ, তার গান শুনে মন আর্দ্র হয়ে ওঠা, তার মাতা-পিতৃহীনতার দুঃখে সমব্যথী হওয়া, সিদ্ধার্থ মূর্ছা যেতেই আর্তনাদের সুরে দাদাকে ডেকে ওঠা এবং জ্ঞান ফিরে পেয়েই তার বিদায় নেবার প্রস্তাবে অজয়ার চোখে জল এসে পড়া— এইস-ব কিছুর মধ্যে সিদ্ধার্থের প্রতি তার ক্রমবিকশিত অনুরাগের লক্ষণ স্পষ্ট। সিদ্ধার্থের পাঠানো বেনামী চিঠির প্রসঙ্গ তুলে তাকে ভর্ৎসনা করা, ভর্ৎসনায় প্রশ্রয়ের সুর মিশে থেকে তার প্রতি অজয়ার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটা—

> এমন একটু সুর যেন বাজিল— যাহা কৌতুকে স্নিগ্ধ, গোপন আনন্দে মধুময়। ১/ ১২৫

তারপর সিদ্ধার্থের পরিচয় সম্পর্কে অনাথ আশ্রমের বালিকার মুখে— 'তোমার বর'— এই প্রশ্ন শুনে তাদেরকে 'দিনভোর' ছুটি প্রদান করার মধ্যদিয়ে অজয়ার প্রেমোদ্বেল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগের পরিচয় প্রকাশ পায়। সিদ্ধার্থের জীবন থেকে আর ফিরে না যাবার অঙ্গীকার, 'এ বিবাহ হইবেই' জেনে— পিতামাতার ছবির সামনে আশীর্বাদ প্রার্থনা, সিদ্ধার্থের নকল পরিচয়ের খবর জেনে 'কি? কি?' বলে আর্তনাদ করে ওঠা, পড়ে যেতে থাকা— এভাবেই সিদ্ধার্থের সঙ্গে অজয়ার গড়ে ওঠা মানস অবস্থার ধারাবাহিকতা এবং পরিণতির শিল্পভাষ্য তুলে ধরেছেন লেখক। অজয়া সিদ্ধার্থকে বিচার করেছে আবেগ দিয়ে, সুগভীর মমতা দিয়ে, প্রেমতপ্ত হৃদয় দিয়ে। রজত, পিসিমা ও ননীর মতো তীক্ষ্ণধার দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি তার নেই। তাদের থেকে এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। ভালোবাসার পাত্র নির্বাচনে চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে ঐশ্বর্যের আধার হয়ে ফুটে উঠেছে এই ঔদার্য ও সরলতা-আশ্রয়ী স্বাতন্ত্র্যেরই কারণে।

রজত ও অজয়ার পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত তাদের চরিত্রকে কৃত্রিম বলে মনে করেছেন কোনো সমালোচক।[১৯] ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক নিয়মধারার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এবং জীবনসংগ্রামের নির্মম বাস্তবতায় পূর্ণ সিদ্ধার্থের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ, তাঁরই হাতদিয়ে এ দুটি চরিত্রের প্রাণহীনতা সমালোচককে বিস্মিত করেছে। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের আচরণগত কৃত্রিমতার প্রতি ঔপন্যাসিকের একধরনের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব পোষণ করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। পরে নিজেই সে সম্ভাবনা নাকচ করে তাঁর অভিজ্ঞতার অভাবকে দায়ী করেছেন। তাছাড়া অজয়ার সংলাপকে 'অত্যন্ত কেতাবি' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বলেছেন যে,

> তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনেই হয়না। সমাজের এই স্তরের নরনারী সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা নিবিড় নয়, দূর থেকে দেখা, এবং অনুমান ভিত্তি করে চরিত্রগুলি গড়ে তোলার ফলে এরা প্রাণ শক্তিহীন।[২০]

কিন্তু এওতো সত্য যে, অভিজাত পরিবারের এধরনের চরিত্র ও তাদের সংলাপ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অনুপস্থিত নয়। রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের বিপ্রদাস ও কুমু ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, দুজনের মধ্যেকার যে কথোপকথন তার ধরনও সাধারণ সামাজিক মানুষদের থেকে আলাদা। অভিজাত্যহীন মধুসূদনের সঙ্গে তাদের ব্যবধান তাই বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের *বাঁশরি* নাটকেও সমাজের উচ্চশ্রেণীর নরনারীর কথাবার্তায় এ ধরনের 'কৃত্রিমতা' লক্ষ করা যায়। *শেষের কবিতার* পাত্রপাত্রীর কথাবার্তাও আমাদের প্রতিনিয়ত জীবন

Dhaka University Institutional Repository

থেকে নেওয়া নয়। সে বিচারে, এখানকার রজত-অজয়া সবদিক দিয়েই সাধারণের থেকে পৃথক, আলাদা জগতের মানুষ হলেও তারা অবাস্তব সৃষ্টি নয়।

তারা ছাড়াও উপন্যাসে রয়েছেন— মানব চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সূচ্যগ্রবিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারিণী পিসিমা। রয়েছে ননী। এ পরিবারে ননীর ভূমিকা তেমন স্পষ্ট নয়। গৃহভৃত্য হয়েও অজয়া এবং রজতের পরিবারে তার অধিকারের মাত্রা একজন পারিবারিক সদস্যেরই মতো। 'নিম্নস্তরের ভিতর' থেকে সংগ্রহ করেও তাকে সখীর তুল্যই বিবেচনা করে অজয়া। এমন কি রজতও তাকে ঠিক পরিচারিকারূপে গণ্য করেনা। সিদ্ধার্থ সম্পর্কে অনুমানপ্রসূত উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ধরা পড়ে। প্রয়োজন বুঝে, অজয়া খুশী হবে বলে,সিদ্ধার্থের পক্ষ-সমর্থনসূচক উক্তিও সে করেছে। সিদ্ধার্থকে হাতের মুঠোয় এনে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর ক্ষেত্রে রাসবিহারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন ধুরন্ধর, প্রতারক ও সুদখোর মানুষরূপেই এখানে তার পরিচয়। পাওনা টাকার তাগিদ দিয়ে সে চিঠিতে লেখে—

> আমি বহুসংখ্যক সন্তানের পিতা, তদ্ধেতু অর্থের অভাব অনুক্ষণ অনুভব করিয়া থাকি,...১/৭৫-৭৬

আবার নিজের প্রতারণামূলক কাজে সহায়তা করতে সিদ্ধার্থ আপত্তি করলে বলে—

> সর্বনাশ করবো ব'লে কোমর বেঁধেছি যদি জানো তবে টাকা দেখাচ্ছ কেন? টাকা আমার ঢের আছে— ব'য়ে ব'য়ে টাক পড়ে গেছে।১/১৩৩

নির্লিপ্ত-নির্দয়তা এবং হৃদয়বৃত্তির শূন্যতা তার চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। এরই পাশাপাশি এক ব্যঙ্গপ্রবণ স্বভাবধর্ম তার নির্দয় বৈশিষ্ট্যকে দিয়েছে তীক্ষ্ণতা। সিদ্ধার্থের ঘরে ঢুকেই সে বলছে— 'সিদ্ধার্থ বাবু, প্রাতঃপ্রণাম'। কখনো 'খলখল' করে হাসতে থাকে। কখনো বলে—

> কম্‌লি, কম্‌লি—সে কি অল্পে ছাড়ে? ...তোমায় কি আমি একটি দিনের একটি কথায় ত্যাগ করতে পারি?১/১৩২

অথবা, ঘরে ঢোকার মুহূর্তে নিজের পরিচয় দেয়—

> আমি গো মাত্তর রাসবিহারী, তোমার বন্ধু এবং অনুগ্রহপ্রার্থী... বুকের ধড়ফড়ানি থামেনি এখনো? দেবরাজও আসছে—... ১/১৩২

কখনো সিদ্ধার্থের কাকুতি মিনতির জবাবে বলে—

> তোমার সর্বস্ব নিয়ে ত'আমি রাতারাতি রাজা হয়ে যাব;...১/১২২

দেবরাজের মাধ্যমে সিদ্ধার্থকে একবার চিঠি পাঠানো ছাড়া উপন্যাসে তার সাক্ষাৎ মেলে মোট দু'বার অতি অল্প সময়ের জন্যে। ওইটুকুতেই তার চরিত্রের বিশেষত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। রাসবিহারীর সহচর দেবরাজ স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। সিদ্ধার্থের মানস-প্রতিক্রিয়াসম্ভূত আচরণকে অভিনয় মনে করে সে কৌতুক বোধ করেছে। আসল সিদ্ধার্থের মাতামহ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও স্নেহাবেগে পরিপূর্ণ মানুষ। উপন্যাসের অতিক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থান করেছে হেমন্তপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার দলপতি, এবং বর্ধিষ্ণু লোক মামলাবাজ সাধুচরণ দাস। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্তের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, নিজের অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে এর বাইরে যাননি তিনি। ফলে তাঁর বক্তব্য ও চরিত্র হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ। মানুষকে তিনি দেখেছেন— তার

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরের বিচিত্র গতিপ্রকৃতিসহ সামগ্রিকভাবে, স্বচ্ছদৃষ্টি ও সংযত ভাবাবেগ নিয়ে। তাদের গুহ্যায়িত নগ্নরূপের উন্মোচনই তাঁর চরিত্র চিত্রণের প্রধান লক্ষ্য। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে দু'ধরনের চরিত্রের সাক্ষ্য মেলে— অর্থে, সামাজিক মর্যাদা ও গরিমায় অভিজাত এবং একই বিবেচনায় সাধারণ পর্যায়ের চরিত্র। তুলনামূলক বিচারে শেষোক্ত গোত্রের চরিত্রগুলো অধিকতর জীবন্ত ও উজ্জ্বল।

সমাজের অভ্যন্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের মধ্যে জেগেছিল নানান প্রশ্ন ও সংশয়। এ সংশয়াশ্রিত মানস পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক একটি বিপন্ন-জগৎ। এ জগতের চরিত্ররা প্রায়ই সাধারণের বিবেচনায় অপ্রকৃতিস্থ। প্রশান্ত সরল জীবনাচরণের পরিবর্তে অশান্ত জটিল, সংকটাকীর্ণ জীবনসংগ্রামের পথে এদের অস্থির-পর্যটন। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির নির্জ্ঞান বা অবচেতন মনের জটিল দিকটিকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন তিনি। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের মর্মস্থিত যে জটিলতা তা মূলত এর প্রধান চরিত্র নটবরের মানসাশ্রিত। অতীত অপরাধের যন্ত্রণা তার মধ্যে রয়েছে, অপরাধবোধও অনুপস্থিত নয়। বুকের গভীরে নিহিত অন্ধকারের কথা সে বলেছে, বলেছে ভগবানের অভিশাপের কথা, আত্মসমালোচনাও করেছে। তার অন্তর্গূঢ় নীতিবোধের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সংঘাত তাকে পীড়িত করেছে। তার সচেতন মন চায় সামনে অগ্রসর হতে, আর অবচেতন চায় অতীত স্মৃতিকে নাড়া দিয়ে তার অপরাধবোধকে জাগিয়ে দিতে এবং তাকে পেছনে টেনে রাখতে। চেতন-অবচেতন স্তরের এই দ্বন্দ্ব গোটা কাহিনী জুড়ে চরিত্রটিকে অস্থির রেখেছে। নীচতা-আশ্রয়ী অতীত জীবনঅধ্যায় সত্ত্বেও তার অপরাধবোধ ও আত্মসমালোচনার প্রয়াসের কারণে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে মানবিকতায় পূর্ণ । নীচতার মধ্যে অবস্থান করেও মর্মনিভৃতে সে অনুভব করে সততার ভগ্নাবশেষ। একে রক্ষা করার প্রাণপণ প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যখন 'অনুমানের অতীত একটা স্থানে কু এবং সু-এর কলহ এখনো ঘটে'। (১/৭৫) তাছাড়া যতো নিচেই নামুক, মানুষের অনিষ্টকারী সে নয়। নিছক আনন্দের জন্যে নীচতায় বিচরণ করেনি। অস্তিত্ববিনাশী এক নিদারুণ সংকট থেকে আত্মরক্ষার অনিবার্য তাগিদেই এ পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়েছে সে। সততার এ ক্ষীণ অস্তিত্বটুকুই তার মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। তমসুক জাল করার প্রশ্নে জেলের ভয়ের অতিরিক্ত এক নৈতিক পীড়নের শঙ্কাই সে ব্যক্ত করেছে— 'যদি টাকা হাতের উপর জ্বলে ওঠে'। দারিদ্র্যজনিত প্রতিকূল অবস্থার পেষণে একান্ত বাধ্য হয়ে যখন এ কাজ করতেই হলো, তারমধ্যে তখন যন্ত্রণার তীব্রতা প্রকট হয়েছে। পরে এ টাকা হাতের উপর জ্বলে না উঠলেও এর স্পর্শ দুরারোগ্য 'ব্রণ-ব্যাধির জ্বালার মত' বহুক্ষণ ধরে তার ভেতরে-বাইরে প্রদাহ সৃষ্টি করেছে। সুতীব্র অপরাধবোধ ও এ বোধসম্ভূত যন্ত্রণার উপরই এ চরিত্রটির অবস্থান।

মানসিক যন্ত্রণাজনিত চাপ বৃদ্ধি পেয়ে তার দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, বিকৃত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তা ধরা পড়েছে।

> সিদ্ধার্থ তক্তপোষের কিনারাটা আঙুল বাঁকাইয়া চাপিয়া ধরিয়া উপরের দিকে টানিতে লাগিল; বলিল,—দাঁড়াও—টানিতে টানিতে হাত দু'খানা তার টান্ টান্ হইয়া সমস্ত দেহটাই খাড়া হইয়া দেখিতে দেখিতে আড়ষ্ট শক্ত হইয়া উঠিল। ১/৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এ সংসারে সৎভাবে বেঁচে থাকবার সবলতাটুকু তার চরিত্রে অনুপস্থিত। এ থেকে উত্তরণের অসহায় অক্ষমতা তাকে মৃত্যু-পরিকল্পনার পথে নিয়ে গেছে। তার এই আত্মহত্যার বাসনাটিকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ মানুষের চিন্তা, ভোগ-বাসনা, অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার মনের অবচেতন-স্তরে সঞ্চিত হয় এবং সুযোগ পেলেই এরা বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু সচেতন স্তরের Psychic censorship-এর কারণে তা পেরে ওঠেনা। এ চিন্তা-বাসনার শক্তি বেশি হলে তা বিকৃত হয়ে চেতনমনের কাজেকর্মে এসে ধরা দেয়। তবে মনের কিছু স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তথা সেফ্‌টি ভাল্ব দ্বারা কতকটা নিষ্কাশিত হয়ে যায় বলেই মন সামান্য বিকৃত হলেও মানুষ একেবারে পাগল হয়ে যায়না, কিছু অস্বাভাবিক কাজ করে মাত্র। সিদ্ধার্থ তাই আত্মহত্যায় প্রয়াসী হয়েছে, আবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়েও এসেছে জীবনের প্রতীক অজয়াকে দেখে।সুগভীর নৈরাশ্যের অন্তরালে তার জীবনবাদী সত্তা মূলত তাকে বেঁচে থাকার জন্যেই প্ররোচিত করেছে। তার গুহায়িত পরনির্ভরশীল মনটি হাতড়ে ফিরছিল একটি অবলম্বন। অজয়াকে দেখেই সে বাসনা তীব্রতা পেয়েছে। মনের চেতনস্তরে যে অস্থিরতার পীড়ন, তা মূলত তার অবচেতনে সঞ্চিত অবদমিত আকাঙ্ক্ষারই প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা তাকে বারবার পরাস্ত করেছে পরিস্থিতির কাছে। অথচ দ্বন্দ্বমথিত-হৃদয় তাকে অব্যাহতি দেয়নি। সে 'মনে করে, যা করিতেছে তা ছাড়া উপায়ান্তর নাই; কিন্তু অনতিবিলম্বেই চেতনার মূর্ছা কাটিয়া সহস্রদিকে পথ দেখিতে পাইয়া তার মর্মদাহের অন্ত থাকে না'। ১/৮৬

মানুষের ব্যক্তিত্বের যে তিনটি পর্যায়— ইদম্ (Id), অহং (Ego) ও অধিশাস্তা বা বিবেক (Super ego) এবং তাদের যা ভূমিকা— জৈবিকপ্রয়োজন চরিতার্থ করা, এসব প্রয়োজনকে সমাজের গ্রহণযোগ্য পথে চালিত করা এবং ইদম্‌কে পরিতৃপ্ত করতে অহং যা করে অধিশাস্তা বা বিবেক যেহেতু তাকে সবসময়ে সমর্থন করে না, তাই অহংকে ইদম্‌ও বাস্তবতা ও অধিশাস্তার মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। এই অহংয়ের দুর্বলতার কারণেই সিদ্ধার্থ তার প্রবৃত্তিকে শোভন-সঙ্গতপথে চালিত করতে পারেনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোবিশ্লেষণ করলে তার ব্যক্তিত্বের দুটি দিক আবিষ্কার করা যায়। প্রথমত জীবনের সহজ পথ থেকে তার যে স্খলন, সেখানে সে ছিল উপায়বিহীন এক অসহায় মানুষ। এ স্খলনের জন্যে তার অনুশোচনার অন্ত নেই। আত্মহত্যার পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে অন্য এক মানুষ। সিদ্ধার্থ-চরিত্রের উপরিউক্ত আপাত-দুটি স্তর ছাড়াও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এর আরেকটি স্তর লক্ষ করা যায়। অজয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তারমধ্যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং থেকে থেকে পলায়নেচ্ছা জেগেছে। এ পলায়নেচ্ছা মূলত তার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রসূত। এ অন্তর্দ্বন্দ্ব তার অবচেতনে সীমাবদ্ধ থাকেনি, চেতনস্তরে উপস্থিত হয়ে তার ব্যক্তিত্বকে বিপর্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয় স্তরের সিদ্ধার্থের কিছু কিছু ভুল ও কপট আচরণ তার দীর্ঘ হীন সংশ্রবজনিত অভ্যাসপ্রসূত বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। কিন্তু এর অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সিদ্ধার্থ প্রতিমুহূর্তে তার অবচেতন স্তরের অবদমিত প্রবৃত্তি, যা কিনা অনেক বেশি শক্তিশালী— তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং পর মুহূর্তে এ প্রবৃত্তির তীব্রতা স্তিমিত হয়ে এলে সচেতন স্তরের বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তবজ্ঞান ফিরে পেয়েছে। আর তখনই স্বকৃত কাজের জন্যে বিস্মিত কিংবা অনুতপ্ত হয়েছে। অজয়া সম্পর্কে সিদ্ধার্থের মানসিকতার পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করা যায় লেখকের বিভিন্ন সময়কার বর্ণনায়। অতীত-অপকীর্তির গ্লানি থেকে সে মুক্তি পাবে অজয়ার প্রেম-সুরধুনীতে অবগাহন করে। বড়োকথা, নিঃসঙ্গ অথচ পরনির্ভরশীল জীবনে একটা আশ্রয় লাভ করবে। তাই এটা বলা যায় যে, অজয়ার প্রতি আকর্ষণ তার যৌন কামনার পঙ্কে বিকৃত নয়। তাছাড়া দৈহিক বাসনা তাড়না কিংবা যৌন-উন্মাদনা তার স্বভাবের পরিচয়ও নয়। বৃদ্ধা বারাঙ্গনার শয্যাসঙ্গী হয়েছিল সে নেহায়েত অর্থলোভে। তার মর্মগত 'অকালশুষ্ক ধরিত্রীর বিস্তৃত' বুকে তৃষ্ণানিবারণীরূপে পরিগণিত হয়েছিল একমাত্র অজয়া। শুষ্ক ও তৃষিতপ্রাণ সিদ্ধার্থের অন্তর্বাসী এ তৃষ্ণা সম্ভবত শৈশবেরই কোনো অভাবপ্রসূত। তাই নিরবলম্ব জীবনে একটা আশ্রয়ের প্রয়োজনে অজয়া তার কাম্য হয়েছিল। একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করেছে সে তাকে লাভ করার জন্যেই। সে জানিয়েছেঃ

> ব্যথাটা বড় বেশী আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেইদিন, যেদিন শুনলাম আপনি বাপ-মা হারা অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মা। মায়ের অভাব মানুষ ইহজন্মে ভুলতে পারেনা। আজন্ম যে মাতৃস্নেহ পায়নি তার তৃষ্ণাটা সেদিন হাহাকার ক'রে উঠেছিল। একটি মাতৃমূর্তির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া যে জীবনের কতবড় সার্থকতা— তা-ই সেদিন দিব্য-চক্ষে প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম। ১/১১৯

সিদ্ধার্থও মাতৃহারা। তার উপরিউক্ত বক্তব্যকে নেহায়েত অভিনয় জ্ঞান করে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। বরং তার মধ্যেকার গুহায়িত সুপ্ত, শিশুর Oral need-কে আবিষ্কার করা যায়। যৌন পরিপক্বতায় পৌঁছার পূর্বপর্যন্ত শিশু যে স্তরগুলো অতিক্রম করে, তার কোনো একটি অতৃপ্ত থাকার ফলে পরবর্তীকালে তার ব্যবহার ওরই মধ্যে স্থিরীকৃত (Fixated) হয়ে পড়ে, ফলে পরিণত বয়সে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষণ (Personality Syndrome) দৃষ্ট হয়। সিদ্ধার্থ শৈশবে মাতৃহারা, তাই তার প্রথম স্তর (মৌখিক স্তর বা Oral stage) অপরিতৃপ্ত। অজয়া তাই তার কাছে জননীর প্রতীক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার অবচেতন স্তরে সঞ্চিত, জীবনের অপরিতৃপ্ত ও অবদমিত আকাঙ্ক্ষা। এ থেকে মুক্ত হবার প্রাণপণ প্রয়াস এবং ব্যর্থতা তাকে যন্ত্রণায় আক্রান্ত করেছে প্রতিমুহূর্তে। অজয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে চপল এক মনোভাব তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে। কিন্তু মুখোমুখি হবার পর তার দিকে তাকানো সম্ভব হচ্ছেনা তার। সিদ্ধার্থের মর্মগত অপরাধবোধ থেকে উৎসারিত সঙ্কোচ ও দুর্বলতাই তাকে তাকাতে দিচ্ছে না। অজয়ার কাছে এসে সে আশ্রয় পেয়েছে, 'যে মন্দিরে সে প্রবেশ করিতে চায়...' অজয়ার হৃদয়কে মন্দির জ্ঞান করেছে সে। এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'বাপ মা হারা অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মা' স্বয়ং অজয়া। অজয়ার মাতৃমূর্তি সিদ্ধার্থের অপরাধী ভীত মনকে আশ্রয় দান করেছে। প্রথমদিকে অজয়ার প্রতি তার রূপাকর্ষণ ও ধনাকর্ষণ বিদ্যমান, পরবর্তীকালে তার অনুভূতিতে উক্ত নতুন মাত্রাটি যুক্ত হয়েছে। অজয়া তার সংগৃহীত ছাব্বিশ-সাতাশটি অনাথ, জন্ম পরিচয়হীন ছেলেমেয়ের জননীস্বরূপা জেনে সে পুলকিত হয়েছে। কারণ 'এইটিই তার নিজস্ব বিভাগ'। এদের জন্ম এবং পরিবেশ ছিল অসুস্থ, এদের সঙ্গে নিজের জীবনের সাযুজ্য রয়েছে বলে সে উৎসাহ বোধ করেছে এদের সম্পর্কে কথা বলতে—

Dhaka University Institutional Repository

> পতিতকে ত্যাগ না ক'রে তাকে তুলে আনার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে জানিনে—আমরা আত্মাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করি, কিন্তু কাজে বাহিরের অশুচির বিরুদ্ধে আমাদের দেহের সতর্কতার সীমা নাই; যেন— ১/১০৬
>
> একটি মানুষকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে শিক্ষিত ভদ্র ক'রে তুললে দেশের যথার্থ জনসংখ্যা আর চরিত্রবল বাড়ে। ১/১০৮

এসব যুক্তি ও ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে নিজের জন্ম ও জীবন-অধ্যায় থেকে ফিরে আসার পরোক্ষ-সাফাই। অজয়া তাদের দয়া করে, ভালোবাসে, সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চায়, তাহলে তার নিজের জন্যেও এটা কেন সম্ভব হবে না!

উপন্যাসের মূল বর্ণনায় সাধু এবং সংলাপে চলতি ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন লেখক। তবে এর আনুপূর্বিক গঠনকৌশলে সর্বত্র সমতা রক্ষিত হয়নি। সাধুগদ্যের ব্যবহার হলেও কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও আন্তরধর্মে তা হয়েছে চলতি ভাষার কাছাকাছি। সাধুশব্দকে চলিতের মতো প্রয়োগ করার সময়ে কোনো অক্ষরের অবলুপ্তি বোঝাতে তিনি Apostrophe-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। সংযত এবং নির্মোহ ভাষারীতি এবং এর অনাড়ম্বর শিল্পবিন্যাস এ উপন্যাসের গুণ। উপন্যাসের প্রথাগত বর্ণনাধর্মী রীতিকে আশ্রয় করেননি জগদীশ গুপ্ত। বাকবিস্তারের পরিবর্তে কখনো কখনো তাঁর বাকবিন্যাস এতোই সংযত ও সংক্ষিপ্ত যে, তা স্কেচধর্মিতা লাভ করেছে বলে মনে হয়—

> মেধা ছিল, আগ্রহও ছিল।খুশী হইয়া ম্যানেজার বাবু তাহাকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।
>
> লেখাপড়ায় উন্নতি হইল ঢের, কিন্তু মনের ইতরতা ঘুচিলনা।
>
> অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার—
>
> সিদ্ধার্থ এইখানে ব্যথায় মুখ বিকৃত করিয়া 'উঃ' বলিয়া একটা আর্তনাদই করিল।
>
> সেই নরক!
>
> তারপর সেই বৃদ্ধাকে হাসপাতালের ডোমের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাহারই পরিত্যক্ত অর্থ মূলধন করিয়া সে শুরু করিল ব্যবসা।
>
> পাপের কড়ি প্রায়শ্চিত্তে গেল। নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত হইয়া সে হাটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ১/১৩১

এই ধরনের বাকসংযমরীতি প্রয়োগের কৌশলরূপেই সম্ভবত স্থানে স্থানে এক একটি চুম্বকবাক্য ব্যবহার করেছেন তিনি। আর এটাই বোধহয় তাঁর সংযত বাকশিল্পের এক চরম উদাহরণ। বাক্যের মধ্যদিয়ে এভাবে তিনি অপরূপ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের বাক্যে তাঁর তীক্ষ্ণতা এবং শব্দ-প্রয়োগের অসাধারণত্ব লক্ষ করার মতো—

> সকলের আগে গিয়াছেন লক্ষ্মী। ...
>
> পালাইয়াছে সবাই। সঙ্গে আছে কেবল সয়তান। ১/৭৮
>
> সে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব নাই। ১/৮০

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধার্থর মরা হইল না।১/৮০

চাকা কেবলি ঘুরিতেছে। ১/৯২

তার আশার মুকুল মুখ খুলিতেছে। ১/৯৬

সিদ্ধার্থ শ্রম সার্থক জ্ঞান করিল। ১/১০৭

সিদ্ধার্থ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।১/১১৩

স্বদেশের হিত কল্পনা সিদ্ধার্থর প্রথম বিভাগ।

মাতৃ-পিতৃবিষয়ক আলোচনা তার দ্বিতীয় বিভাগ।১/১১৯

সে পরবর্তী কথাটাই প্রাণপণে ভাবিতেছিল।১/১৪৪

সাদামাটা আবেগবর্জিত এক নাট্যিক নির্লিপ্তি নিয়ে উপন্যাসের বিষয় বর্ণনা করেছেন লেখক। এর বিষয়ের দিকদিয়ে যেমন, ভাষা ও শব্দচিত্রের দিকদিয়েও তেমনি তাঁর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। এর আরম্ভ এবং শেষ নাটকীয়। যেমনঃ 'সিদ্ধার্থ তার নামই নয়' বলে কাহিনী শুরু এবং 'নটবর যাইতে যাইতে মুখ না ফিরাইয়াই বলিয়া গেল, না,—' বলে এর সমাপ্তি। কাহিনীর প্রথম দিকের তুলনায় আত্মহত্যার পর্যায় অতিক্রম করার পর সিদ্ধার্থের প্রসঙ্গে লেখকের ভাষার চাল পরিবর্তিত হয়েছে। গোড়ার গুরুগম্ভীর ঢঙের পরিবর্তে "সিদ্ধার্থর মরা হইল না" বলার পর ভাষায় এসেছে লঘুবিন্যাস। তার চরিত্রের পরিবর্তন উপন্যাসের ভাষায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। আত্মহত্যা করতে আসার সময়ে সিদ্ধার্থকে প্রেরণা জোগাচ্ছে চারপাশের পরিবেশ—

> অস্থির জলের নীচে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর বিবেকদংশনের পরমশান্তি যেন মিলনাকুলা প্রেয়সীর মত তাহাকে গ্রহণ করিতে বাহু মেলিয়া বুক পাতিয়া বসিয়া আছে। ১/৭৯

আর মৃত্যু অপেক্ষমাণ বলে—

> ...সে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব নাই। ১/৮০

আবার জীবনের প্রতীক অজয়াকে দেখার পর—

> সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত...সম্মুখে কত রঙের মেঘ স্তরে স্তরে সাজান, রঙের আর শেষ নেই— স্তরের প্রান্তরেখায় তরল সোনার ঢেউ; পীত মেঘের গর্ভান্তরাল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্মরশ্মির সূত্রগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া আকাশের মধ্যস্থল অমনি একটু স্পর্শ করিয়াই মিলাইয়া গেছে, ...পুষ্পস্তর হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দিক-সীমানায় লীন হইয়া গেছে। এই ছবিটা সিদ্ধার্থের আগে চোখে পড়ে নাই। ১/৮০

জগদীশ গুপ্তের ভাষাশিল্পের প্রকৃষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে কখনো কখনো তাঁর চরিত্রের কায়িক বর্ণনার মধ্যে, যখন তার মধ্য থেকে এক একটি রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে, যাতে করে সেই চরিত্রের বাহ্যিক দিকটি ছাপিয়ে তার অন্তর্প্রকৃতিও স্পষ্ট ধরা দেয় পাঠকের কাছে। যেমন—

Dhaka University Institutional Repository

কাশীনাথ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। মুখাবয়ব এমনই শুষ্ক যেন তাঁর আয়ুষ্কাল দুঃসহ ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে— তাঁর লোলচর্মের উপর দিয়া নিদারুণ একটা কণ্টকতরঙ্গ বহিয়া গেল। ১/১৫০

সিদ্ধার্থর চোখের জ্যোতিটা ফিরিতেছিল। বৃদ্ধ কাশীনাথকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া সেইটাই আগে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল।১/১৫১

কোথাও আবার দীর্ঘ ও অসরল বাক্যের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়ঃ

ক. যে আসিল সে যে সিদ্ধার্থর বন্ধু তাহাতে কোনো বিসম্বাদই নাই, উপরন্তু সে পথে-পাওয়া লৌকিক বন্ধু নয়; সুখ-দুঃখের দরদী জন। ১/৭৪

খ. ভিখারীরও কাণ্ডজ্ঞান আছে— অভাবের তাড়নায় দেহ আর রূপ যার পণ্য তারও ধর্ম আছে; তারও ঘৃণার বস্তু পৃথিবীতে আছে; তার নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে; পরলোক, পাপ-পুণ্য সে মানে; শ্রদ্ধার দাবীও সে করে; কিন্তু কোন্ নরকের অতল গহ্বরে নামিয়া গেলে মানুষ দুনিয়ার আর সবই একধারে ঠেলিয়া দিয়া কেবল অর্থকেই প্রাপ্তির চরম স্বর্গ মনে করে! ১/৭৫

গ. আশা ফলিত, ছিল সবই, কিন্তু ছিলনা কেবল সেইটি— যার সংজ্ঞা নাই, যার স্বরূপ বলিয়া বুঝান যায়না; যাহাতে উদ্যম সফল হয়, বড় আরো বড় হয়, ছোট উঠিতে থাকে, ছিলনা তাই। ১/৭৮

ঘ. সংসারের যে ধর্ম পালন করিলে মানুষের টিকিয়া থাকিবার বনিয়াদ প্রস্তুত হয়, মানুষে মানুষ বলিয়া মানে, সেই ধর্ম সে পালন করিতে না পারিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়াছে।১/৭৯

ঙ. তারপর ত্রাসে কি কিসে কে জানে তাহার মূর্তি এমন বেপমান বিবর্ণ হইয়া উঠিল যেন সে রোগশয্যা ছাড়িয়া এইমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১/১৫১

সংযত সংহত, কাব্যময়তার স্পর্শহীন হয়েও জগদীশ গুপ্তের ভাষাশৈলী তুলনাহীন। অযত্নকৃত মনে হলেও এ ভাষা যে একজন সুদক্ষ শিল্পীর সাধনাপ্রসূত সৃষ্টি তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, বিষয়বিন্যাস ও আরো নানান শিল্পকৌশল প্রয়োগের মধ্যে।

উপমাঃ

ক. এই দিনব্যাপী কঠিন শ্রান্তি এক মুহূর্তেই কি করিয়া ভুলিয়া ঐ লোকটি প্রভাতের পাখীটির মত আনন্দে মাতাল হইয়া গান গাহিতেছে!১/৭৯

খ. পাওনাদার পরপর ক্ষুধিত নেকড়ের খড়গের মত অসহিষ্ণু শাণিত দৃষ্টি লইয়া অবিশ্রান্ত তাড়িয়া আসিতেছে না। ১/ ৭৯

গ. রুগ্ন সন্তানের মুখের উপর জননীর নিঃশ্বাসের মত বায়ু অতি সতর্ক; ১/৮০

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পা দু'খানি দীর্ঘকাল এইখানে রক্ত-কমলের মত ফুটিয়া ছিল। ১/৮০

ঙ. জোঁক যেমন শিকারের রক্তে পূর্ণ হইয়া আপনি খসিয়া পড়ে, সিদ্ধার্থের মনে হইতে শুরু হইয়াছিল, তার অতীত তার বুকের রক্তে ভুল ভারাক্রান্ত হইয়া তাহার জীবনের অঙ্গ হইতে তেমনি বিচ্যুত হইয়া গেছে।১/১২১

উৎপ্রেক্ষাঃ

ক. তার স্পর্শ যেন একটা দুরারোগ্য ব্রণ-ব্যাধির জ্বালার মত এখনো তার ভিতরে বাহিরে দপ্ দপ্ করিতেছে।১/৭৯

খ. বিঘূর্ণিতচক্র যেমন তার পৃষ্ঠের উপর কোনো বস্তুকেই তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে দেয় না— তেম্নি একটি কাণ্ড ঘটিতেছিল সিদ্ধার্থের জ্ঞান-জগতে— ১/৯৫

গ. সিদ্ধার্থ এমন দু'টি চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল যেন সর্পের যাদুদৃষ্টির সম্মুখে পক্ষীশিশুর মূর্ছিত প্রাণটুকু ভিতরে কেবল ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ১/১২২

ঘ. একটা তীক্ষ্ণচঞ্চু এবং বক্রচঞ্চু অভিসন্ধি যেন সাবধানে ওৎ পাতিয়া আছে! ১/১৩০

সমাসোক্তিঃ

ক. রৌদ্র ঘরে ঢুকিতেই অজয়ার চুলের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ১/১২৪

খ. পা দু'খানির সাড়া পাইয়া মাটি যেন আগাইয়া আসিয়া বুক পাতিয়া দিতেছে।১/৮০

গ. গাছের মাথায় মাথায় আলোর স্পর্শ ছিল--তাহাও সর্বোচ্চ বিন্দুতে মুহূর্তেক দাঁড়াইয়াই সরিয়া গেল।১/৯০

ঘ. তাহারই রক্তরশ্মি যেন তাহাকে রথে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ১/১৩২

চরিত্রের চিত্তানুভূতি কিংবা মনোভাবের প্রকাশ, অতীতের স্মৃতিচারণ, মর্মচিত্র পরিস্ফুটনের বিষয়কে উক্তির পরিবর্তে চিত্রকল্পের আধারে সংস্থাপন করেছেন লেখক।

ক. ভাবনাটা যেন মাঝে মাঝে থমকিয়া হা হা করিয়া শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে— যেমন দীপের চঞ্চল শিখাগ্রটা ঊর্দ্ধের অন্ধকারের অঙ্গে সূক্ষ্মতম রেখায় বিদ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়— ১/৭৩

খ. অন্ধকার কোথায় যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া গহ্বরে নিদ্রিত ছিল, বাহিরে আসিয়া ক্রমাগত সে দেহ বিস্তৃত করিতেছে।১/৯০

গ. সিদ্ধার্থ মনে মনে ডানা মেলিয়া যেন বসন্তের পুষ্পশাখে যাইয়া বসিল। ১/১৪৩

ঘ. ...ভিতরকার যে পশুটাকে এতদিন সে সযত্নে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল সেইটাই জাগিয়া উঠিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল। ১/১৫১

কখনো তা হয়ে উঠেছে শ্রুতিব্যঞ্জনাময়—

পর্বত মালার গায়ে গায়ে আছাড় খাইয়া খাইয়া সুগম্ভীর শব্দটার মৃত্যু ঘটিতে বহু বিলম্ব হইল।১/৯১

Dhaka University Institutional Repository

কখনো আবার শব্দ ও চিত্রের একত্র সমাবেশে বাকবিন্যাসে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব শিল্পসুষমা—

> প্রপাতের খরস্রোত খাদের গর্ভে লাফাইয়া নামিতেছে।
>
> একটা ক্রুদ্ধ আহ্বান-গর্জনের মত অবিরাম অনন্ত তার শব্দ; উৎক্ষিপ্ত চূর্ণ জলের প্রতিকণায় ইন্দ্রধনুর সবগুলি রং ফুটিয়া উঠিয়াই ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। ১/৮০

ভাষাশিল্পের অপূর্বতাগুণে স্পষ্ট হয়েছে চরিত্রের মানসক্রিয়া—রাসবিহারীর 'খল খল' করে হাসির নির্দয়তা একটা বীভৎস অনুভূতি যেন সঞ্চারিত করে দিয়েছে সিদ্ধার্থের চেতনার সর্বত্র।

> ...সিদ্ধার্থ মনে মনে খুব হাসিতেছে, এমন সময় তাহার বন্ধ দুয়ারের উপর ভীষণ শব্দে করাঘাত পড়িল।
>
> —কে ?
>
> প্রশ্নটা যেন একটা ঝটিকাবর্ত। এমনি করিয়া সে সিদ্ধার্থের সুখের চূর্ণ প্রাসাদটিকে মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।
>
> বাহির হইতে আওয়াজ আসিল,— পাওনাদার।
>
> সিদ্ধার্থর কানের ভিতর ঝমঝম করিতেছিল, বলিল,— ভেতরে আসুন।
>
> আসিল রাসবিহারী। এবং আসিয়াই খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল; ১/১৩২

অনুপ্রাসঃ

> অন্ধকারের অঙ্গে, আতঙ্কের আতপে, তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে দেয়না, আশার মুকুল মুখ খুলিতেছে, যেমন বাহার তেমনি বহর, গুলি চালালে গোল মিটবেনা, পরলোকের লোক, শুক্তিকোষে মুক্তাটির মত, স্বপাকে সেবা করে, দারোগা-গ্রাসকারীর ত্রাস।

কখনো কখনো অন্ধকারের অনুষঙ্গে চরিত্রের জীবনানুভূতির নানামাত্রিকতাকে ব্যঞ্জিত করেছেন লেখক। মনের আশাহীন, নিশ্চয়তাহীন অবস্থার মধ্যে চলমান অস্থির চিন্তারাশিকে 'অন্ধকার' ও 'দীপের' চিত্রকল্পে বিন্যস্ত করা হয়েছে এই ভাবে—

> ভাবনার আদিও নাই, অন্তও নাই; কি ভাবিতেছে তারও বিশেষ দিক দিশা নাই— তবে ভাবনাটা যেন মাঝে মাঝে থমকিয়া হা হা করিয়া শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে— যেমন দীপের চঞ্চল শিখাগ্রটা ঊর্দ্ধের অন্ধকারের অঙ্গে সূক্ষ্মতম রেখায় বিদ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়— কিন্তু দাহ তার থাকেই। ১/৭৩

আবার অভাব আর অভিশপ্ত জীবন- অবস্থার প্রতীকরূপে এসেছে অন্ধকার—

> সিদ্ধার্থ বলিল— ...বড় অন্ধকার বন্ধু।...
>
> —বাইরে নয়, ভাই, ভেতরে।— বলিয়া অনিচ্ছুক দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের উপর টানিয়া তুলিয়া সিদ্ধার্থ বলিল,
>
> —অন্ধকার এইখানে। ১/৭৪

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা অর্থে অন্ধকার বিন্যস্ত হয়েছে সাপের ভাবচিত্রে—

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার কোথায় যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া গহ্বরে নিদ্রিত ছিল; বাহিরে আসিয়া ক্রমাগত সে দেহ বিস্তৃত করিতেছে। ১/৯০

আলোঅন্ধকারের অনুষঙ্গে সিদ্ধার্থের বর্তমান জীবন-অবস্থার দু'টিদিককে নির্দেশ করেছেন লেখক। একদিকে অজয়াকে নিয়ে গড়েওঠা স্বচ্ছ সুস্থজীবন, অন্যদিকে তার জন্মসহ স্বকৃত পাপের বোঝাময় কদর্য জীবন—

পর্দার ও-দিকে কুঞ্জে কুঞ্জে আলোর মধু-উৎসব—এ দিকে অনন্ত অন্ধকার।১/১৪৫

জীবনের সহজ সুস্থ গতি ব্যাহত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অন্ধকার—

অমন দৃষ্টি অন্ধকারে পথ পাইবেনা। ১/১৪৫

জ্ঞানহীন বোধবুদ্ধিহীন মানস অবস্থা বোঝাতে অন্ধকারের উল্লেখ—

মা সরস্বতীর হাস্যচ্ছটা নিকষের উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণরেখাটির মত, কঠিন অজ্ঞানান্ধকারের কোন্ স্থানটি প্রথম আলোকিত করিয়াছিল তাহার উদ্দেশ নাই। ১/১৪৭

অন্ধকারের প্রতীকে বিভীষিকাময় অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার ইঙ্গিত—

অপরদিকে অতল অন্ধকার, তার নীচে পাথর। পড়িলে অন্ধকারের উদরে দেহ চূর্ণ হইয়া মিলাইয়া যাইবে। ১/১৪৮

পদের বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে ও বাক্যের কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটিয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন লেখক। যেমন—

ক. দু'টিতে যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায় তবে—
রজত ভাবে, সে সুখ অনির্বচনীয়। ১/৮২

খ. বলিল, — সুরেনের প্রতি তোমার মন কেন এমন বিমুখ, সত্যি বলছি তোমায়, সেটা আমার বড় হেঁয়ালির মত ঠেকে। সে ত সব দিক দিয়েই তোমার যোগ্য! তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে, এমন কি—
রজত জানে না যে, এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচারের দায়িত্ব তাহার নহে, এমনকি তাহাতে তাহার অধিকার আছে কি-না সন্দেহ। ১/৮৩

গ. রজত বলিয়া গেল, "ভবঘুরে জুটে তোমার খেয়ালের সামনে প'ড়ে গেলেই—"
ঐ সামনেই তাকে পড়িতে হইবে। ১/৮৪

ঘ. রজতের সে পিছু লইয়াছে। রজত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়, যদি দৈবাৎ সে পা পিছলাইয়া পড়ে, পা একখানা মচকাইয়া—
রজত নিজে না পড়ুক পাথরই একখানা গড়াইয়া পড়ুক না তার পায়ের উপর— কাঁধে করিয়া রজতকে সে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। তখন—
ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধার্থের মনে হইল, সে যেন রজতকে কাঁধে করিয়াই চলিয়াছে।১/৯১

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. লেখা-পড়ায় উন্নতি হইল ঢের, কিন্তু মনের ইতরতা ঘুচিলনা।
অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার—
সিদ্ধার্থ এইখানে ব্যথায় মুখ বিকৃত করিয়া 'উঃ' বলিয়া একটা আর্তনাদই করিল।
সেই নরক! ১/১৩১

জগদীশ গুপ্ত পৌরাণিক অনুষঙ্গ আশ্রয় করেছেন মাঝে মাঝে, আর তা করেছেন আধুনিক নানান তাৎপর্যে, যা কিনা সমকালীন চিন্তা ও বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সেগুলো কখনোই তাঁর ধর্মীয় বিবেচনাপ্রসূত নয়। কখনো ব্যঙ্গ, কখনো চরিত্রের দিবাস্বপ্ন, কখনো তার প্রেম ও শ্রদ্ধাপ্লুত মানসানুভূতির ইঙ্গিত-আশ্রয়ী হয়েছে এই পৌরাণিক অনুষঙ্গ—

ক. সিদ্ধার্থ সিদ্ধিদাতা গণেশের পাঁচসিকে ভোগ মানত করিয়াছে।
উল্টাইয়া না পড়া পর্যন্ত গণেশ ঠাকুরকে কেহ বড় স্মরণ করেনা; সিদ্ধি প্রদানের প্রার্থনাসহ কিঞ্চিৎ ভোগের আশা গণেশ বোধকরি এই প্রথম পাইলেন।১/৯০

খ. সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—শুনেছি, এই পাহাড়ে বালখিল্য মুনিগণের প্রেতাত্মারা সব বাস করেন; মানুষকে একা আর দুর্বল পেলেই তাঁরা তার পথ ভুলিয়ে দিয়ে অনিষ্ট ক'রে থাকেন। ১/৯১

গ. সন্ধ্যার আগেই ফেরবার কথা ছিল বটে, কিন্তু এ সন্ধ্যা ত' দুর্বাসার সেই সন্ধ্যা নয় যে ভস্ম হবার ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে! ১/৯৪

ঘ. কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ননী হঠাৎ বলিয়া উঠিল,— উঃ, কি চেহারা, যেন দ্বিতীয় বৃকোদর! চোখ দুটো দেখেছ দিদিমণি, যেন জ্বলছিল। ১/৯৭

ঙ. মানুষের প্রাণে এত সয়! বসুমতীর বুকের ভিতর দ্রবীভূত অগ্নি যেমন আছে, তেমনি সুশীতল জলস্রোতও বহিতেছে। কিন্তু তার বুকে কেবল আগুন। যদি কোনো ভগীরথের শঙ্খধ্বনির পিছু পিছু যদি কোন সুরধুনী তাহার বুকের দিকে নামিয়া আসে, তবে সে ত' এই অগ্নির তাপে বাষ্প হইয়া যাইবে।১/১২২

চ. সিদ্ধার্থর মনে হইল, সাগর-গর্ভ হইতে উঠিবার সময় লক্ষ্মীর বরাঙ্গের উত্থিত অর্ধসূর্যালোকে ঠিক এমনি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। দেবতাগণ উল্লাসে বিস্ময়ে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁর একহস্তে ছিল সুধার কলসী, অন্যহস্তে—১/১২৪

ছ. তার কল্পনা-পক্ষী উড়িতেছিল, ত্রেতার সমুদ্র-মন্থনের উপর।১/১২৪

এ ছাড়াও রয়েছে শিল্পকৌশলময় আরও বিভিন্ন কারুকাজ, যা কিনা কাব্যময়তার আড়ম্বরমুক্ত হয়েও সৌন্দর্যে অভিনব। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতিবর্ণনা রয়েছে, যদিও তা খুব বেশি নয়—

ঊর্দ্ধে নিস্তরঙ্গ নীলিমা— নিম্নে তরঙ্গায়িত শ্যামলিমা— দু টিতে চুম্বনে মেশামেশি। ১/৭৮

সিদ্ধার্থের জীবনবাদী অনুভূতিতে কল্পপ্রকৃতির বর্ণনা—

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত— অসীম আঁধার সাগরের উপর জ্যোতির্ময় শতদল ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই অঙ্গপ্রভায় দিগন্ত পর্যন্ত স্বর্ণপ্রভাতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সম্মুখে কত রঙের মেঘ স্তরে স্তরে সাজান, রঙের আর শেষ নেই— স্তরের প্রান্তরেখায় তরল সোনার ঢেউ; পীত মেঘের গর্ভান্তরাল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম রশ্মির সূত্রগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া আকাশের মধ্যস্থল অমনি একটু স্পর্শ করিয়াই মিলাইয়া গেছে, রুগ্ন সন্তানের মুখের উপর জননীর নিঃশ্বাসের মত বায়ু অতি সতর্ক; পুষ্পস্তর হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়া দিক-সীমানায় লীন হইয়া গেছে। ১/৮০

পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি পল্লী; তার পশ্চিম প্রান্তে রৌপ্য-প্রবাহের মত নদীটি। নদীর ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র; ক্ষেত্রের সীমান্ত ব্যাপিয়া দিক-চক্ররেখা— তারি নীচে সূর্য অর্দ্ধেক ডুবিয়া গেছে। এদিকে রাখাল বালকেরা গরু ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে; মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা; কোনোটি নিজের বাড়ীর কাছে আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, কোনোটি ঘাড় ফিরাইয়া পিছাইয়া-পড়া বাছুরের দিকে চাহিয়া আছে। ১/ ৯২

কখনো আবার বিষয় বর্ণনায় গতির মাঝে বৈপরীত্যের ক্ষণিক বাধা বেগকে আরো শক্তিশালী করেছে যেন, বক্তব্যকে করে তুলেছে শাণিত—

সিদ্ধার্থ অতিশয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে করিতে রজতদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু পথে আসিয়াই তার আহ্লাদের অন্ত রহিলনা।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে পা দিয়াছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ, চোখে চোখে চাহিয়া বাক্য বিনিময় ঘটিয়াছে। যাওয়া-আসার নিমন্ত্রণও পাইয়াছে।

এ-পর্যন্ত কল্পনার চরিতার্থতার কিছু বাকি নাই। কিন্তু পরক্ষণেই খচ্ করিয়া কোথায় যেন বিঁধিল।

সে অপবিত্র। মনে হইতেই তাহার সমগ্র চিত্ত একাগ্রতা ভাঙিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহিলনা। ১/ ৯৮

সেই অপার ব্যথার তাড়নে তার শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী এখনো টনটন্ করিতেছে। কিন্তু সেই ব্যথার পশ্চাতেই যে আনন্দ হাসিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা নাই। সে-আনন্দ বিশল্যকরণীর অমোঘ রসে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বপ্ন মিথ্যা, কিন্তু আনন্দটি ত' পরম সত্য। ১/১৪৭

বিপরীত মানসাশ্রয়ী একজনের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে গৃহহীন, আনন্দ-স্বস্তিহীন সিদ্ধার্থের মানসযন্ত্রণার তীব্রতা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক—

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি অনেকগুলি ঘর।

একটি ঘরের বাসিন্দা হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল। কণ্ঠ মধুর নহে, কিন্তু আনন্দ অনাবিল, উচ্ছল।

লোকটি শ্রমজীবী; বাহির হইয়াছিল সকাল সাতটায়; ফিরিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। এই দিনব্যাপী কঠিন শ্রান্তি এক মুহূর্তেই কি করিয়া ভুলিয়া ঐ লোকটি প্রভাতের পাখীটির মত আনন্দে মাতাল হইয়া গান গাহিতেছে।

সিদ্ধার্থর বুভুক্ষু আত্মা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এ গান মুখের গান নয়— কেবল বুকের গানও নয়।

এ গান গৃহের; চারিটি দেওয়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র একটু চতুষ্কোণ স্থানের ভিতর যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি, আরাম আর বিলাস সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহাই যেন লোকটির কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া মহোল্লাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থ গৃহী নয়; গৃহ তার নাই।

বৈরাগী সে নহে; বৈরাগ্য তার জন্মে নাই। মাঝখানে সে দুলিতেছে।

ইহা যে কত বড় ব্যর্থতা, বিরহ আর শূন্যতা তাহা কেবল সে-ই জানে যার ঘটিয়াছে।১/৭৯

বিবেকতাড়নাজনিত সংকট ভেতরে ভেতরে সিদ্ধার্থকে কিভাবে এবং কতদূর পীড়ন করছে তা জানা যায় জগদীশ গুপ্তর স্বপ্নদৃশ্য-পরিকল্পনায়। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তার বিবেক উঠে এসেছে আসল সিদ্ধার্থের বেশে। অজয়া তো আসলে তারই প্রাপ্য, সিদ্ধার্থ নামের ছদ্মবেশধারীর নয়। অজয়াকে সে অধিকার করতে চাইলে নটবর তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তার অতীত জীবনের সাক্ষী মুদি, যার দোকানে একসময়ে বালক ভৃত্যরূপে নিয়োজিত ছিল— সে লাঠি নিয়ে তাড়া করে তাকে। স্বপ্ন সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের যা ব্যক্তিগত উপলব্ধি তা ফুটেছে এই *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে নটবরের স্বপ্নদর্শনের মধ্যে। তার অসহায় অথচ সুতীব্র জীবনতৃষ্ণা, যা কিনা নিয়তির নিষ্ঠুরতা-কবলিত, তা-ই স্বপ্নের আকারে ধরা দিয়েছে তার কাছে। পাপজীবন থেকে মুক্তি প্রত্যাশী হলেও এ জীবনের গ্লানি তাকে মুক্তি দেয়নি। তাকে তা তাড়া করে বেড়িয়েছে তার জাগরণে, ঘুমে, স্বপ্নে। এরকম স্বপ্নদর্শন রয়েছে জগদীশ গুপ্তের অনেকগুলো উপন্যাসে। ধারণা করতে কষ্ট হয়না যে, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব ও স্বপ্নতত্ত্ব তাঁর অধীত ছিল। তবে ফ্রয়েডের স্বপ্নসমীক্ষণের সূত্রে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যক্তির অবদমিত বাসনা কামনা স্বপ্নে ধরা দেয় প্রতীকের মাধ্যমে— জগদীশ গুপ্ত এই প্রতীককে প্রয়োগ করেননি, বাস্তবের সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রায় স্পষ্টই দেখিয়েছেন। এই স্বপ্নদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও লক্ষ করা যায়। তবে সেখানে চরিত্রের ভবিষ্যৎজীবন স্বপ্নের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কিংবা লেখকের প্রবণতাগত নৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে এর পেছনে। জগদীশ গুপ্তের চরিত্রদের যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে তা তাদের হতাশাপূর্ণ বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের মানসপ্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের স্থানে স্থানে কখনো সিদ্ধার্থের চিন্তা কিংবা বক্তব্যে, কখনো লেখকের ভাষ্যে রয়েছে তাঁর উপলব্ধিজাত বক্তব্য—

ক. মিথ্যা যে মিথ্যাই— এ জ্ঞানটা মিথ্যা কহিবার আজন্ম অভ্যাসেও লুপ্ত হয়না ; ১/ ৭৭

খ. আবর্ত রচনা করিয়া কালের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতের বেগ ক্ষিপ্ত, প্রখর; কিন্তু ঐ স্রোত আর আবর্তই ত' মানুষের অদ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র। স্রোতের বাহিরে পল্বল আর পঙ্ক। ১/ ৭৮

গ. নিজের সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য— এইটি মনে করিয়ে দিয়ে যাদের আমরা উঠতে দিইনা, উঠতে চেষ্টা করলে ধর্মের রব তুলে যাদের মাথার উপর দেবতার নামে লাঠি উদ্যত করি, তাদের প্রশান্ত বাহ্য অবয়বের নীচে কত বড় একটা বিক্ষোভ অহর্নিশি আলোড়িত হচ্ছে তা বুঝি আমরা কল্পনাও করতে পারিনে। ... তাদের ধমনীতে জল না রক্ত বইছে... রক্তই বইছে আর সে রক্ত ফুটছে। ধর্মের গ্লানির ভয়ে কল্পিত বড়র পা চিরদিন তারা কণ্ঠের উপর রাখবেনা। ১/ ১০৬

ঘ. একটি মানুষকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে শিক্ষিত ভদ্র ক'রে তুললে দেশের যথার্থ জনসংখ্যা আর চরিত্রবল বাড়ে। অস্পৃশ্য ব'লে কেউ ঘৃণা না করলে বোঝা যায় না, সেই ঘৃণার আঘাত কত বড় আঘাত। বুঝেছি— বাইরে থেকে সে আঘাত হাতুড়ির ঘায়ের মত বুকে এসে পড়ছে, আর্তনাদ করছি; আবার নিজেরই ঘরের লোকের বুকে সেই আঘাতই করতে আমাদের বাধছে না।১/১০৮

দেশকালের পটভূমিকা-সূত্রে, সিদ্ধার্থের বেনামে কোথাও কোথাও উচ্চারিত হয়েছে লেখকেরই যুগলগ্ন ভাবনাপ্রসূত বক্তব্য—

ক. পল্লীর দিক দিয়ে ভরসার কথা এই যে, সে শিক্ষাপটু। উপকার কিসে হয়, বুঝিয়ে বললে সে তা বুঝতে পারে কিন্তু শেখাবার লোক নেই।

...আর, তারা অশিক্ষিত নয়, নিরক্ষর। তাদের মধ্যে জন্মার্জিত শিক্ষার একটা ধারা বইছে। তারা সভ্য এবং সাধক— জগতের সম্মুখে নিজস্ব প্রশ্ন নিয়ে যে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল, সে আমাদের পল্লী। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে— গা তুলে অগ্রসর হলে বীজ বপন করতে পাথরে লাঙল বসাতে হবে না— অবশ্য যদি সহিষ্ণুতা আর অপর্যাপ্ত সময় মানুষের থাকে।১/১১৩

খ. আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি যে-অঙ্গ আশ্রয় করে সে-ই শুকিয়ে উঠেছে— ভেঙে চুরে পড়লাম ব'লে। ১/১১৩

গ. একটি পল্লীর সুখ-দুঃখ সর্বসাধারণের সুখ-দুঃখ বোধে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সে আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবে না — সার্থকই করবে। আপনার কাজের মাঙ্গল্য

Dhaka University Institutional Repository

তাকে আকর্ষণ করবে, মুগ্ধ করবে, উন্নত করবে— কারণ সে শিক্ষিত এবং সভ্য। একটুখানি এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন, যাদের সাহায্য করতে এসেছেন তারাই আপনার সহায়। ১/১১৪

ঘ. এই জ্ঞানটা ফিরিয়ে আনতে হবে যে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, পুণ্য— এর কোনোটাই হাত-ধরা নয়। আত্মদানের প্রেরণা যখন দুর্বল হয়ে আসে তখনই অধ:পতিতের মনে হয়, পরিত্রাণ সাধনা-নিরপেক্ষ এবং সুলভ। একটু হরিনাম ক'রেই, গঙ্গায় একটি ডুব দিয়ে উঠে, হাত-পা ছুঁড়ে একটু আস্ফালন ক'রেই তার মনে হয়, যথেষ্ট করা হচ্ছে। সভ্যজগৎ তাই দেখে হাসে। পৃথিবীকে আমাদের দেবার কিছু আছে কিনা জানিনে, থাকে ত' ভালই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য কিছু নেই। অথচ ঐ জিজ্ঞাসারই তন্তুটুকু সভ্যতার নিদর্শন— আগেও ছিল, এখনো আছে।১/১১৩

ঙ. বহুদিনের আবর্জনা দেখতে দেখতে ছাই হয়ে যেতে পারে যদি আলস্য ত্যাগ ক'রে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। ১/১১৪

চ. শূন্য উদরে ধর্মের জয়ঢাক বাজাইয়া বেড়ানো নির্বোধের কাজ, আত্মঘাতীর কাজ। আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবারও অধিকার কাহারও নাই— তাহারও নাই। কে কবে পরের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের প্রাপ্য কপর্দক ত্যাগ করিয়াছে! কথকের মুখে শোনা গেছে, শত্রুভাবেও ভগবানকে লাভ করা যায়। সে-ও অধর্ম; তবে অধর্ম ঘৃণ্য কিসে? ১/১৩৪

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে মানুষের আপাতবিন্যস্ত সরল জীবনাচরণের অন্তরালে বিদ্যমান রয়েছে এক জটিল নষ্ট-স্বপ্নের নিয়ন্তা ক্রূর অদৃশ্য শক্তি। এর অস্তিত্ব লেখকের উপলব্ধ চেতনায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে। দয়াহীন এই শয়তানশক্তির কূটলীলা ও উল্লাস তাঁর *লঘুগুরু, তাতল সৈকতে* প্রভৃতি উপন্যাসের মতো এখানেও স্পষ্ট-বিম্বিত। লেখক দেখিয়েছেন এরই কারণে অন্তর্নিহিত বাসনার অমৃতধারায় স্নাত হয়ে পাপজীবন থেকে উদ্ধার পাবার সব আয়োজন নস্যাৎ করে দিয়ে নটবরদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। *অসাধু সিদ্ধার্থের* নটবর অশিষ্ট অতীত ও তার কর্মফলকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চেয়েছিল নতুন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে। এই অতীত-অধ্যায় বারবার তাকে বিপর্যস্ত করেছে, জীবনকে অসঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছে। একে লঙ্ঘন করা সম্ভব হয়নি কোনোভাবেই। জীবনধারা পরিবর্তনের সকল প্রয়াস তার নিস্ফল হয়েছে নিয়তির ক্রূর আঘাতে। 'সে [সিদ্ধার্থ] বেঁচে নেই'—উক্তির মধ্যদিয়ে ব্যঞ্জনায়িত হয়ে উঠেছে—আসল নকল কোনো সিদ্ধার্থই এখন বেঁচে নেই। সৌভাগ্যরূপী সিদ্ধার্থদের আয়ু যেমন ক্ষণস্থায়ী, তারা বাঁচেনা; নকল সিদ্ধার্থদের প্রয়াসও তেমনি জীবনের স্পর্শ হারায়। কাহিনীর চুম্বক এখানেই, এই বাক্যের মধ্যেই রয়েছে এই ঔপন্যাসিক বক্তব্য।

এই কূটনিয়তির হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি জগদীশ গুপ্তের অন্য উপন্যাসের চরিত্ররাও। কেউ কেউ একে প্রাচীন গ্রীক নিয়তির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করেছেন। বলেছেন যে, সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা-

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ এই নির্মম নিয়তিকে আমন্ত্রণ কিংবা লঙ্ঘনের ক্ষমতা মানুষের নেই।[২১] 'অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয়' এক নির্যাতনকারী শক্তির কথা স্বীকার করেছেন মোহিতলাল মজুমদারও—

> জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার এক প্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্ব্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে— মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার,... মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগরচৈতন্যের অগোচর; সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে— এ সকল যেন তাহারই ক্বচিৎ-দৃষ্ট মূর্তি; আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চেতনায় ইহারই ছায়া পড়িত। কিন্তু এখনও সেই সকল অনুভূতি হয়তো আমাদের নির্জ্ঞানস্তরে সঞ্চিত আছে, অতিপ্রাকৃতের সেই বিরাট বেষ্টনী যে এখনও আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে— নানা ইঙ্গিতে ইসারায় আমরা সেকথা স্মরণ করিতে বাধ্য হই।[২২]

মানুষের জীবনচক্র এই নিষ্ঠুর হিংস্র-অস্তিত্বের হাতে বন্দী। এই উক্তির সমর্থন মেলে সুকুমার সেনের বক্তব্যেও ঃ

> জগদীশ চন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে,— ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ।[২৩]

মানুষ তার আশাআকাঙ্ক্ষা ও সীমিত শক্তি দিয়ে একে উপেক্ষা করতে চায় কিন্তু পারেনা। এই নিয়তি জগদীশ গুপ্তের কাহিনীকে প্রায় সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরিবেশ এবং তার নিজস্ব জীবনবৃত্ত— যার মধ্যে সে বসবাস করে, জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন— তার প্রভাব অলঙ্ঘনীয় এবং তা দুর্নিবার। এই তার নিয়তি, এ নিয়তি প্রায়ই বাইরের কোন শক্তি নয়। সিদ্ধার্থের ব্যক্তি চেতনার গভীরে অবচেতন স্তরে নিহিত যে প্রবৃত্তি তাই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

কাহিনীর ঘটনা ও চরিত্র পর্যালোচনায় জগদীশ গুপ্তকে দুঃখবাদী, অদৃষ্টবাদী, অমানবতন্ত্রী বলে মনে হলেও এর বিপরীত প্রমাণও বিরলদৃষ্ট নয়। পরাজয় জেনেও তাঁর মানুষেরা নিয়ত সংগ্রামে রত। বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রদের এই সংগ্রামশীলতার জন্যেই সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে নৈরাশ্যবাদী আখ্যা দিতে চাননি।

> অন্ধনিয়তির কাছে মানুষের পুরুষকারের প্রচেষ্টা সর্বদা পরাজিত— একথা বলেও জগদীশ গুপ্ত মানুষের প্রচেষ্টাকে ক্ষুদ্র করে দেখেননি। নিয়তির অলঙ্ঘ্য বাধাই যদি তাঁর উপন্যাসের একমাত্র কথা হত তবে তিনি বিভিন্ন পরিবেশের নরনারীর মানবিক প্রচেষ্টার বিবরণ এত নিপুণভাবে দিতেন না। মধ্যযুগীয় কাব্যকথার প্রায় ব্যতিক্রম মনসামঙ্গলের কাহিনীতে চাঁদ সদাগর যেমন দৈবী শক্তির কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে এবং বারবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে—পরাজয়ের গ্লানিকে বড় করে দেখেনি, জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-সংসারের মানুষগুলিও নির্মম নিয়তির কাছে অলঙ্ঘ্য বাধা পেয়েও থমকে যায়না।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতাআশ্রয়ী বলে তাঁর সাহিত্যে একদিকে জৈবপ্রবণতা, অন্যদিকে দুঃখের স্পষ্ট পদচারণা তাঁর রচনার অধিকাংশ জুড়ে। তবু নৈরাশ্যবাদী, অদৃষ্টবাদী, অমানবতন্ত্রী চেতনার উদ্‌গাতা— তাঁর সম্পর্কে এমন সরলউক্তি মানতে চাননি সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ

> জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তিকে দুঃখবাদী জগদীশবাবু সর্বত্রই পরাভূত দেখেছেন।... কিন্তু তিনি কখনও জীবনের চেষ্টাকে ছোট করে দেখেননি।... বরঞ্চ প্রাক্তন কর্মফলের বন্ধনে বন্দী মানুষ স্বীয় ভূমিকার স্বাধীন বিকাশের জন্য, অশেষ যন্ত্রণাকে শিরোধার্য করেছে, হয়েছে সংগ্রাম পরায়ণ— এই ছবিই মানুষের সত্যছবি বলে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। [২৫]

জগদীশ গুপ্তের *লঘুগুরু* উপন্যাসের উত্তম, *অসাধু সিদ্ধার্থের* নটবর, *গতিহারা জাহ্নবীর* কিশোরী, *যথাক্রমের* নিত্যপদ, *রতিবিরতির* রাম যদিও অদৃষ্টকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি, তবু তারা কেউ আশাবাদ-বঞ্চিত ছিল না। জয়ী হবার বাসনায় ভাগ্যের সঙ্গে অবস্থা ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে। এই নিয়তি বা অদৃষ্ট প্রায়ই আলৌকিক কোনো শক্তি নয়। লেখকের অভিজ্ঞতায় ধৃত বাস্তব জীবনের ঘটনা পরম্পরায় সৃষ্ট এক অদৃশ্য প্রবণতার ফল। তাঁর বিক্ষত-হৃদয় মানুষ সতত সংগ্রামশীল এবং সম্পূর্ণরূপে আবেগমুক্ত। এসব চরিত্র মোটামুটিভাবে কয়েকটি নিয়মচক্রের জালেবন্দী। কলুষিত বিরূপ পরিবেশ, অন্ধ নির্মম নিয়তি, মানুষের স্বভাবগভীরে প্রোথিত তার আদিম প্রবণতা— এসবেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ক্লান্তিআক্রান্ত মানুষ তার উপন্যাসের চরিত্র। নটবরের বেলায় একথা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

বাস্তব অভিজ্ঞতার বাইরে যাননি জগদীশ গুপ্ত। আশ্চর্য নির্লিপ্ততা নিয়ে একান্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকেই প্রতিফলিত করেছেন উপন্যাসে। ওরই মধ্যে ফুটেছে বস্তুজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও বক্তব্য। বিশশতকের বাঙালী সমাজজীবন ছিল তাঁর সৃষ্টির অবলম্বন। দেশকালের অনিবার্য ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েই জগদীশ গুপ্ত রূপায়িত করেছেন তাঁর সৃষ্টির শিল্পভাষ্য। তাঁর বাস্তবানুসারিতার জন্যে উপন্যাসের কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয় দেশকাল-আশ্রয়ী পটভূমির ইঙ্গিত। সমাজের বহুবিচিত্র ভাবনা ও চরিত্র তাঁর রচনায় উপস্থিত। এই সূত্রেই তিনি উল্লেখ করেছেন ইংরেজ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) প্রত্যক্ষ ফলজনিত প্রতিক্রিয়ার কথা। জমিদাররা প্রায়ই নায়েব গোমস্তার হাতে তাঁদের জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নগরবাসী হতেন, সেখানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসে গা ভাসাতেন। আর গাঁয়ে, নায়েব গোমস্তার সহানুভূতিবর্জিত আচরণ ও শোষণে প্রজাদের দুর্গতির অন্ত থাকতো না। কাললগ্ন এ বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের একটি টুকরো চিত্রের মধ্যে। এর চোদ্দ পরিচ্ছেদের শেষ অংশে, যেখানে সিদ্ধার্থের পারিবারিক পরিচয় সংগ্রহ করতে রজত হেমন্তপুর গ্রামে আসে এবং এখানকার জমিদার সম্পর্কে জানতে চায়।

> —... গ্রামের জমিদার কে?
>
> —জমিদারের কথা আর শুধোবেন না, বাবু। একটিবার চোখে দেখতে পেলাম না তাঁর চেহারাখানা কি রকম। তিনি বার মাস কলকাতাতেই থাকেন। এখানে নায়েব গোমস্তারা থাকে, হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ যা করবার তা তারাই করে। ১/১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

লেখক দেখিয়েছেন প্রজায়-প্রজায় হাঙ্গামা, মামলা-মিথ্যামামলা,মোকদ্দমা আর সাজানো মামলার সাক্ষীদের নিয়ে মহড়ার টুকরো চিত্র। মুসলমান বিবাদীর বিরুদ্ধে একজন মুসলমান সাক্ষী হলে যে মামলা জোরালো হয়—তার ইঙ্গিত মেলে ছমির সেখের বিরুদ্ধে হামিদকে তালিম দিয়ে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টার মধ্যে।

কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হয়েছে জগদীশ গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রবণ মানসের পরিচয়। অজয়ার মুখোমুখি হবার বাসনা পূরণ করার জন্যে গণেশের কাছে পাঁচসিকে মানত করেছে সিদ্ধার্থ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ডাকাতরা কালীপুজো করে তারপর তাদের কাজে যায়। কিন্তু সে পুজোয় খরচ বেশি, শব্দও বেশি। তার চেয়ে গণেশের কাছে নিরিবিলিতে মানত করাই সিদ্ধার্থের জন্যে সুবিধেজনক। 'সিদ্ধার্থ তাই নিঃশব্দে নিরীহ গণেশের শরণাপন্ন হইয়াছে'।

> উল্টাইয়া না পড়া পর্যন্ত গণেশ ঠাকুরকে কেহ বড় স্মরণ করে না। সিদ্ধি প্রদানের প্রার্থনাসহ কিঞ্চিৎ ভোগের আশা গণেশ বোধকরি এই প্রথম পাইলেন। ১/৯০

মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তার সাক্ষীদের মহড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করছে যে লোক, লেখক সেই চরিত্রের নাম দিয়েছেন সাধুচরণ। এই সাধুচরণ—

> বসিয়াছিল,উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,— দারোগা ধমক দেবে আমি থাকতে! হামিদ, তুই বলছিস কি! হুঁ, আশু বিশ্বেস আবার দারোগা— তাকে আবার ভয়! আরশোলাও পাখী, আশু বিশ্বেসও দারোগা! কত বড় বড় জাঁদরেল দারোগা, যার চোখ দেখলে তোরা কুঁকড়ে আধখানা হয়ে যাবি, লাট সাহেবের খাস দারোগা— তাদের পর্যন্ত আমি এই—
>
> বলিয়া লাটসাহেবের খাস দারোগাগুলিকে একত্র করিয়া সাধু ট্যাঁকে পুঁজিতে যাইতেছিল, এমন সময় স্থানাভাবে নহে, অন্যকারণে কাজটা তার শেষ করা হইলনা।
>
> সাধুচরণের ছোট ছেলেটা কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিয়া গেল,–বাবা, দারোগা।—বলিয়াই সে পোঁ করিয়া সিটি বাজাইয়া যেন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।
>
> —এঁ্যা, দারোগা? কোথায় দেখলি?
>
> কিন্তু ছেলে তখন বহুদূরে; লাটসাহেবের খাস দারোগা-গ্রাসকারীর ত্রাস দেখিবার জন্য সে দাঁড়াইয়া নাই।
>
> —নিতাই, দেখত' এগিয়ে কে।
>
> কিন্তু নিতাই দেখিতে সুপুরুষ হইলেও ভিতরে কাপুরুষ। এতগুলি লোক উপস্থিত থাকিতে স্বয়ং তাহাকেই অগ্রসর হইতে বলায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বলিল,— আমি একা যাবো?
>
> কাপুরুষতা সাধুচরণের একেবারে অসহ্য; ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,— এ কি বুনো শুয়োর মারতে যাচ্ছো যে লোক-লস্কর-হাতিয়ার সঙ্গে না নিলে ফেঁড়ে ফেলবে? যা এরফান, নিতাইয়ের সঙ্গে যা। ১/১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অসাধু সিদ্ধার্থ উপন্যাসের গঠনকৌশলে লেখক প্রধানত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ আশ্রয় করলেও মূল বিষয়কে বিবেচনা করেছেন সিদ্ধার্থের চিন্তাভাবনার আলোকেই। উপন্যাসের যেমন চকিত আরম্ভ, এর সমাপ্তিও তেমনি আকস্মিক। তাঁর সব রচনারই এ এক সাধারণ লক্ষণ। কাহিনী যখন জমে উঠে একটি রসপরিণতির জন্যে অপেক্ষমান, ঠিক তখনই তাতে নেমে আসে এক অপ্রত্যাশিত উপসংহার। চরিত্ররা সীমিত শক্তি নিয়ে অসীম শক্তিধর নিয়তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ। কিন্তু তাদের জীবনের অসার্থক পরিণতি বয়ে আনে তাঁর উপন্যাস। প্লটের চেয়ে চরিত্র-চিত্রণই তাঁর মূল অভীপ্সা। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাস এর ব্যতিক্রম নয়। কাহিনীর শুরুতে মর্মযাতনাপীড়িত সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ মেলে, অজয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অন্তত তিন তিনবার বিবেকের দ্বারা দংশিত হয়েছে সে। শেষের দিকে, স্বপ্নের মধ্যেও এ বিবেকের শাসন নেমে এসেছে তার কাছে আসল সিদ্ধার্থের বেশে। এ বিবেক-তাড়নার কারণেই অজয়ার কাছ থেকে সরে পালিয়ে যেতে চেয়েছে সে, যদিও চরম অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে সে বিদায় নেবার পরিকল্পনা বারবারই মুলতবী রেখেছে। উপন্যাসের চরিত্রসংখ্যা বেশি নয়, চরিত্রের চেয়ে তাদের মনোরাজ্যের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাঠকের কাছে তুলে ধরাই ছিল লেখকের লক্ষ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিস্তার ঘটানোর পরিবর্তে এক অদ্ভুত সংযম রক্ষা করার ফলে আকৃতির দিক দিয়ে এটি স্বল্পায়তন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে *কল্লোল*কথাকারগণ, তাঁদের রচনায় নানামাত্রিক বাস্তবতাকে আশ্রয় করেছিলেন, কিন্তু একধরনের রোমান্টিক ভাবাবেশ তাঁদের সে বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদেরই একজন হয়েও জগদীশ গুপ্ত ছিলেন এ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং এই অর্থে তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র। যথার্থরূপে রবীন্দ্রবিরোধিতা, জীবন সম্পর্কে তিক্ত অনুভূতি এবং সংশয়সহ এক নেতিবাদী মনোভাব তাঁর বিশেষত্ব। সমকালীন অধিকাংশ তরুণ সাহিত্য রচয়িতার থেকে তাঁর রচনা আশ্চর্য রকমে পরিণত। তাঁর জীবনবীক্ষণ পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায়— জীবন নিঙড়ে অশান্তি অশুভ আর ক্রূরতাকেই খুঁজে বের করেছেন তিনি। *কল্লোলে*র প্রবণতাকে তিনি ধারণ করেছিলেন সংশয়াচ্ছন্ন এক নেতিবাদী দৃষ্টিকোণের সাযুজ্যে। *কল্লোলে*র লেখকদের সঙ্গে তিনি সাদৃশ্য রক্ষা করেছেন মনস্তাত্ত্বিক দিকের আশ্রয় ও যৌনবাস্তবতার প্রসঙ্গে। তাঁর মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক নেতিবাচক বাস্তবতাকে তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন। অবশ্য তারমধ্যে মানবিক হৃদয়ধর্মের অস্তিত্বটুকু অনুভব করতে কষ্ট হয়না। মানুষকে অস্বীকার করেননি তিনি। মানুষের মধ্যেকার জীবনতৃষ্ণাকে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন তার শুদ্ধ জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে তাদেরকে পৌঁছাতে পারেননি কোথাও। পরাজিত-পরিণাম আশ্রয় করে তারা নিজেকে সমর্পন করেছে অন্ধ নিয়তির কাছে। যৌন-বিষয়ক খোলামেলা আলোচনা *কল্লোলে*র পূর্বে তেমন করে লক্ষ করা যায়নি। রবীন্দ্রনাথে এবং *শেষপ্রশ্ন* বাদে শরৎচন্দ্রেও খুঁজে পাওয়া যায় না। জগদীশ গুপ্ত এদিক দিয়ে এবং অন্যান্য দিকদিয়ে *কল্লোলে*র লেখকদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছেন। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে যৌনবিষয়ক বক্তব্য না থাকলেও অন্যদিকে, যেমন— বিয়ের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে অজয়ার মতামত নেওয়ার কিংবা রজতের আদেশ দেওয়ার উল্লেখের মধ্যে রয়েছে *কল্লোলে*রই একটি লক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে দেহবাদ-সম্পর্কিত বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে *কল্লোল*কালের লক্ষণ। অজয়াকে পাবার কল্পনায় সিদ্ধার্থের জীবনবাদী চিন্তা স্বতঃধারায় উৎসারিত হয়ে চলেছে। সে ভাবছে— সৃষ্টির আদিযুগ থেকে প্রাণের দাবি ঘোষিত হয়ে আসছে জীবনের পক্ষে, আর জীবনতো দেহসম্পৃক্ত।

> প্রেমে পশুত্ব যে দিয়াছে সে-ও ধন্য। প্রেমে স্বর্গীয় দেহাতীত পবিত্রতা কল্পনা করিয়া মানুষের এই অতিষ্ঠকর কলরব কতদিনের? দেহ স্বল্পজীবি, আত্মা অমর— কিন্তু দেহ কি মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছার বিগ্রহ নয়? শিবের পূজা শুদ্ধমাত্র তাঁর মাঙ্গল্যের পূজা নয়—সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষয় রাখিবার তাঁর যে শক্তি তাহারও পূজা। ১/১৪৭

অন্ত্যজ সমাজস্তরের বিত্তহীন মানুষের জীবনবাস্তবতা রূপায়ণের প্রয়াস *কল্লোল*ধর্মের আর একটি লক্ষণ। নটবরের জন্ম ও জীবন বৃত্তান্তের অনেকখানি জুড়ে তারই পরিচয় ফুটে উঠেছে। অন্ত্যজ স্তরবাসীদের জীবনচিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে এভাবে মিল রক্ষা করলেও জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে বাস্তবতা এসেছে অন্যভাবে—চরিত্রের স্বভাব ও তার পরিণতিকে আশ্রয় করে। ব্যাপক অভিজ্ঞতানির্ভর উপলব্ধির আলোকে তিনি বিচার করেছেন সমাজ ও সমাজস্থিত মানুষকে। পঙ্কিল জীবনস্তর থেকে উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা এবং তার ব্যর্থপরিণতিকে তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর *অসাধুসিদ্ধার্থ, লঘুগুরু* প্রভৃতি বিভিন্ন উপন্যাসে। এ ক্ষেত্রে কোনো রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা কি ভাবালুতার প্রশ্রয় তাঁরমধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। একেবারেই সাধারণ মানুষের জীবনআশ্রিত এক নব জীবনবোধ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয় ও বাস্তবতার অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে মানব চরিত্রের অন্যায়, শঠতা ও বঞ্চনার নানামাত্রিক দিক। তবে এই দিকগুলো এসেছে তাদের অন্তর্গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে। জগদীশ গুপ্ত মানুষের চরিত্র-নিভৃতের এই রহস্যজটিল দিকটিকে শিল্পরূপ দিয়েছেন, এ দিকেই তাঁর স্বভাবজ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় বেশি। একদিকে বাস্তবতা ও অন্যদিকে রোমান্টিক স্বপ্নময়তা— এই নিয়েই *কল্লোল* স্রষ্টাদের জগৎ গড়ে উঠলেও জগদীশ গুপ্ত আশ্রয় করেছিলেন শুধুমাত্র এর নেতিবাচক বাস্তবতার দিকটিকে। রোমান্টিক ভাবালুতার লেশমাত্র, কল্পসুখের স্বপ্নচারিতা বা তত্ত্বময়তার প্রশ্রয়মাত্র তাঁর রচনায় নেই। আবার *কল্লোলে*র লেখকরা নরনারীর যৌনতার বিষয়টিকে যে তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনায়, তা উপস্থাপন করেছেন মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক তাগিদ অর্থে, জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন তার বিকার। এ বিষয় আশ্রয় করে গল্প তৈরির চেয়ে তাঁর বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছে। সুস্থ যৌনাচার নয়, বিকারই এর প্রধান কথা। তাঁর রচনায় কখনো কখনো 'বিবাহ' যৌনাচারের নামান্তররূপে বিবেচিত হয়েছে। 'ধর্মপত্নী কথার কোনো মানে নেই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল,— তার দেহটাই আসল' *(দুলালের দোলা ১/৭৮)*। তাঁর সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্যঃ

> তাঁর প্রতিপত্তি অবিসংবাদিত। তিনি মুখ্যত অস্বভাবি মনোজীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবচরিত্রে অস্বাভাবিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা ও কৌতূহল এবং শ্লেষমিশ্রিত রচনারীতি সে কালের তুলনায় অভিনব। [২৬]

সমসাময়িক যে সকল বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়াকে আশ্রয় করে *কল্লোল*মানস গড়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রবিরোধিতা তার অন্যতম। কিন্তু কল্লোলীয়দের প্রায় সবারই রবীন্দ্রবিরোধিতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁদের সুগভীর

Dhaka University Institutional Repository

শ্রদ্ধাবোধ। তাঁদের রচনা এবং জীবন পর্যালোচনায় এর প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়। জগদীশ গুপ্ত যথার্থ-ভাবেই ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী। কর্মসূত্রে শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে, বোলপুরে অবস্থান করেও রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যাবার আগ্রহ বোধ করেননি। শুধু তাই নয়—তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পের ভৃত্য ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার ভৃত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। জগদীশ গুপ্তের গল্পের ভৃত্য চরিত্রটি তার মনিবের পরিবারে অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হওয়া সত্ত্বেও নির্জন মাঠে তার প্রভুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে পলায়ন করেছে। *কল্লোলের* সাহিত্য-স্রষ্টাদের রূপায়িত বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিক ভাববিলাসের যে মিশ্রণ, সমসাময়িকতার ভিত্তি আশ্রয় করেও জগদীশ গুপ্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম। বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব *কল্লোলের* প্রধান লেখকদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং কখনো কখনো তা বাঙালি পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি বলে রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেকেই অভিযোগও করেছেন। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে সে কথা বলার সুযোগ নেই। তিনি বাংলা সাহিত্যে যে ব্যতিক্রমী মাত্রা নির্মাণ করে গেছেন, তারমধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ কিংবা রোমান্টিকতার লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাঁর রচনায় তিনি প্রায়ই আশ্রয় করেছেন গ্রামীণ পটভূমিকে। আর সে গ্রামও সুস্থ স্নিগ্ধ গ্রাম নয়, বরং তার ওল্টানো রূপ। এইসব বিচারে *কল্লোলের* লেখকদের একজন হয়েও তাঁর স্বতন্ত্র এক সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নিরূপিত হয়েছে। জীবনের শুভ পরিণামের বিপরীত— সংশয়, অবিশ্বাস এবং অনিবার্য এক নেতিপরিণতি তাঁর বাস্তবতার ধরন। *কল্লোলের* লেখকরা বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে সর্বত্র সফলভাবে তা চিত্রিত করতে সমর্থ হননি, তার কারণ তাঁদের রোমান্টিক ভাবাবেশ। *কল্লোলের* প্রাণধর্মকে তাঁরা সর্বত্র ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হননি, তার মূলেও ওই কারণ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন— তাঁদের 'লক্ষ্যভ্রষ্টতা' এবং এরও কারণ,তাঁর ভাষায়,তাঁদের 'অপরিণত উদ্দেশ্য'।[২৭] জগদীশ গুপ্তের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে *কল্লোলের* লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে জানা যেতো না। আসলে *কল্লোলের* যা মূল বিশেষত্ব তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনায়ই বিদ্যমান।

রোমান্টিক স্বপ্নচারিতার বিপরীত এক নৈরাশ্যমগ্ন জীবনবোধ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি জগদীশ গুপ্তের মানসলক্ষণ। তাঁর রচনার বিষয় উপাদান এবং বিন্যাসকুশলতা লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রথমবিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এই উপমহাদেশের মানুষের মানসপ্রবণতাকে শিরোধার্য করেই তার মধ্যে তিনি যুক্ত করেছেন নতুন মাত্রা। তির্যক দৃষ্টিকোণ-আশ্রয়ী স্বতন্ত্রমাত্রার এক জীবনদর্শন তাঁর কথাসাহিত্যের সর্বাঙ্গন জুড়ে। সার্বিক বিচারে হতাশা-প্রত্যাশার এক সন্ধিলগ্নের ফসল হলেও তাঁর সাহিত্যপ্রবণতায় নৈরাশ্যের লক্ষণই স্পষ্ট। নিরাশা-কবলিত সামাজিক মানুষের মর্মগভীরে নিহিত যে অসঙ্গতি, জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য যেন তারই সংগ্রহমালা।

সভ্যতার পলেস্তারাহীন, বিশেষত গ্রামীণ স্বল্পবিত্ত মানুষের আপাতবিন্যস্ত সরল জীবনাচরণের নিভৃতে তিনি যেন আবিষ্কার করেছেন এক জটিল ও ক্রূরশক্তিকে। তিনি দেখিয়েছেন—এই অদৃশ্য শক্তি নানাভাবে মানুষের জীবনকে লাঞ্ছিত করে। এর হাত থেকে অব্যাহতি নেই তাদের। পরিবেশ এবং নিজস্ব জীবনবৃত্ত—যার মধ্যে সে বসবাস করে, লেখক দেখিয়েছেন যে, তার প্রভাব অলঙ্ঘনীয় এবং তা দুর্নিবার। এই তার নিয়তি, এই নিয়তি কোনো বাইরের শক্তি নয়। মানুষের ব্যক্তি-চেতনার গভীরে অবচেতন স্তরে

Dhaka University Institutional Repository

নিহিত যে প্রবৃত্তি তা-ই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর হাত থেকে তার নিস্তার নেই। তবু পরাজয় জেনেও মানুষ নিয়ত সংগ্রামে রত। এ জন্যেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা প্রায় সবাই আবেগমুক্ত ও বিক্ষত-হৃদয়। এরা মোটামুটি কয়েকটি নিয়মচক্রের জালে বন্দী। কলুষিত বিরূপজন্ম কিংবা পরিবেশ, অন্ধনির্মম-নিয়তি, মানুষের স্বভাবগভীরে নিহিত তার আদিম প্রবণতা— এই সবকিছুর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ক্লান্তি-আক্রান্ত মানুষ *অসাধু সিদ্ধার্থ* সহ তাঁর সব উপন্যাসের চরিত্র। এদের অন্তর-উপর উভয়তলের রূপায়ণে কোনোরকম ভাবালুতাআশ্রয়ী নৈতিকতার প্রশ্রয় নয়, বরং সমাজ ও মানুষের সভ্যমুখোশ উন্মোচন করে করে তিনি দেখিয়েছেন তার ক্রূর-কুৎসিত, নগ্ন-বিকৃত রূপকে। এ উন্মোচন-প্রবণতার মূলে রয়েছে—জীবন সম্পর্কে তাঁর নির্মোহ, নিরাশা-তিক্ত ও তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি। আপাতসমতল সমাজের অন্তরালে পরিবেশ তথা এ নিয়তির দ্বারা তাড়িত তাঁর কথাসাহিত্যের মানুষ। এরই কারণে নতুন প্রবণতাকে আশ্রয় করে বেঁচে উঠতে চাইলেও তারা ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনা।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর চরিত্রের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন যে, মানুষ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেই পশু তৃপ্ত। কিন্তু মানুষের ক্ষুধার শেষ নেই, খাদ্যাখাদ্যেরও বিচার নেই।তাঁর *অসাধু সিদ্ধার্থ, দুলালের দোলা* প্রভৃতি উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্র জন্মসূত্রে পিতামাতার লালসার ফসল—অবৈধ সন্তান। এরা নিয়তি-তাড়িত, এদের অলঙ্ঘ্য কর্মফলের মুক্তিহীন যন্ত্রণার অসহায় স্বরূপকে সরাসরি তুলে দেখিয়েছেন লেখক। এ ক্ষেত্রে নৈতিকতার কোনো আবেগকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। অবশ্য, তাদের এই যন্ত্রণা, অসহায়তা দুর্বলতার পরিচয় বহন করে না। তা দুর্জয় সংগ্রাম শেষের পরিণতি মাত্র। 'বস্তুত দুঃখবাদী জগদীশচন্দ্র এই তিক্ত জ্বালার জগতের বার্তা আমাদের শুনিয়েছেন।' [২৮]

একদিকে সমাজ,মানুষ ও জৈবনিক বাস্তবতা,অন্যদিকে অন্ধ অদৃষ্ট নির্ভরতা—এ-ই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের ধর্ম। বাস্তবতাসূত্রে যে সমাজ ও মানুষকে তিনি আশ্রয় করেছেন, তারা প্রায়ই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, ঠিকানাহীন, অবলম্বনহীন ও অসহায়। অদৃষ্টনির্ভরতা তাই তাদের স্বভাব-ধর্ম। জগদীশ গুপ্তের অদৃষ্টবাদিতা এ জন্যেই বাস্তবের সঙ্গে বিরোধ বাধায়না।

> জগদীশ গুপ্তের নরনারী দেশকাল ও সমাজ-কাঠামোর অসঙ্গতিজাত বাস্তবতার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, নৈরাশ্যে আতঙ্কিত এবং পরিণামে অদৃষ্টে সমর্পিত। অতি আধুনিক বুর্জোয়াবিশ্বে অদৃষ্টবাদের অনিবার্য পরিণাম যেমন ফ্যাসীবাদী—তেমনি স্বল্পবুদ্ধি, গ্রাম্য, অচ্ছুৎ, স্থূলরুচির মানুষ একক নিঃসঙ্গ এবং রাজনৈতিক বোধশূন্য ব'লেই স্বাধীকার প্রমত্ত—অর্থলিপ্সায়, মানবতার অমর্যাদায় এবং দৈহিক কামনাবাসনার তামসীপঙ্কে তাদের নিরুপায় গুহ্যবাস। [২৯]

জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ চরিত্র অন্তর্পরিচয়ে নিজেরা স্খলিত-সৌন্দর্যের অধিকারী শুধু তাই নয়, বাইরের সমাজ পরিবারের সুস্থ শৃঙ্খলারও বিনাশকারী। মানবতা লাঞ্ছিত হওয়ার কাহিনী সংবলিত সংখ্যাধিক সৃষ্টি তাঁর রয়েছে, তবু মানবতা-বিরুধী বলে তাঁকে আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ পঙ্কে নিমজ্জিত চরিত্রের পঙ্কজ হয়ে ওঠার অভিলাষ ক্রিয়াশীল রয়েছে তাঁর অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে, আর তা যেমন ছোটগল্পে, তেমনি উপন্যাসে। চরিত্ররা দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে, কিন্তু নিয়তির অনিবার্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকূলতায় ভেঙেচুরে নস্যাৎ হয়ে গেছে সে প্রয়াস। লক্ষ করলে দেখা যায়— এ নিয়তিরই অনির্দেশ্য ভূমিকা সর্বত্র ক্রিয়াশীল। মানবজীবনের ভাঁজ খুলে খুলে এর বিচিত্র বাঁকা গতিময়তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন মানবজীবনের নিস্ফলতা ও ব্যর্থতাকে। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তা-ই রূপায়িত হয়েছে তাঁর রচনায়।

সমাজ মানসস্তরের গুহায়িত শ্বাসরোধকারী অন্ধকারকে তিনি টেনে বের করেছেন চোখের সামনে। মানব চরিত্র মন্থনের গরল জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের সর্বত্র। অমৃতের সন্ধান সেখানে নেই। সমাজ ও ব্যক্তিকে নিঙড়ে তার তেতো রসটুকু তিনি বের করেছেন। 'লক্ষ্মীদিয়া' গ্রাম তাঁর 'পোড়াবউ' পরিচয়ে অবসিত, পৈতাধারী পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুর নেপথ্যপরিচয়ে 'চোরের ভাঁড়ারী।...দুশো সিঁধেল চোর তার হাতে' *(দুলালের দোলা)*, নাম সংকীর্তনকারী ধর্মকর্মে নিবেদিতপ্রাণ মানুষটি তার স্ত্রীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে দেহব্যবসায়ে নিয়োজিত হতে প্ররোচিত করে নিজের রক্ষিতাকে দিয়ে *(লঘুগুরু)*। প্রেমের মাধুর্য থেকে তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা বঞ্চিত। তাঁর নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে যৌনতা-আশ্রিত জটিলতার যে পরিচয় অন্যত্র দেখা যায় *অসাধু সিদ্ধার্থে* তা নেই। বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্র— যেমন, *লঘুগুরুর* উত্তম-টুকি ও পরিতোষ-সুন্দরী, *দুলালের দোলার* দ্বারিক ঠাকুর, *তাতল সৈকতের* শরৎ ও রণজিতের গ্রামবাসী, *নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের* নকুল ও তার কন্যা, *রোমন্থনের* মুসলমান চাষী, তার স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাইয়েরা এবং নালিশ করতে আসা বিপন্ন বিধবার কন্যা, জামাই ও প্রাণনাথ ঠাকুর—তারা অবস্থা ভেদে হয় নির্যাতক, না হয় নির্যাতিত। এই শেষোক্ত মানুষের মধ্য থেকেই জগদীশ গুপ্ত নির্বাচন করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের অধিকাংশ প্রধান চরিত্র। শোষিত ও নির্যাতিত বলেই তারা নিঃসঙ্গচারী। দুঃখের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগ। এই দুঃখ অদৃষ্টের সঙ্গে, অবস্থা ও পারিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ। কখনো কার্যকারণ-সূত্র দ্বারা গঠিত অসঙ্গতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার সুস্থ জীবনপিপাসা তাদের মধ্যে কখনো কখনো জাগ্রত হলেও প্রথাবদ্ধতা, সামাজিক গতানুগতিক মূল্যবোধ ও অনুশাসন ডিঙিয়ে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসেই রয়েছে তার যথার্থ পরিচয়। কাহিনীর পরিণতি লেখকের একই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত। এরই মধ্যদিয়ে 'অজ্ঞেয় নিয়তির নিষ্ঠুর ক্রীড়াকে জগদীশ গুপ্ত...মানুষের ক্ষীণ শক্তির ওপর জয়ী দেখিয়েছেন।' [৩০] জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ছিল পূর্বাপর একই সংহত-সিদ্ধান্ত।

যুগসম্ভূত নষ্ট মানবাত্মার রূপকার এই জগদীশচন্দ্র কারো অনুসারী নন, তাঁর অনুসারীও কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি একক স্বাতন্ত্র্যে বিরাজমান। তাঁর চরিত্ররা সমাজভুক্ত হয়েও নিঃসঙ্গ এবং সমাজ বিচ্ছিন্ন, অথচ সমাজমূলের সঙ্গে অন্তর্গূঢ় সূত্রে সম্পর্কিত। লেখক সেভাবেই তাদেরকে শিল্পমণ্ডিত সুষমায় বিন্যস্ত করেছেন। মহাযুদ্ধোত্তর অস্থির সময়াশ্রিত বাস্তবকে রূপ দিয়েছেন লেখক। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে লেখকের এই বক্তব্যই প্রকাশিত যে, ভাগ্যহত নটবরেরা কখনো সিদ্ধার্থ হতে পারে না। শয়তান নিয়তি বারবার এসে দাঁড়ায়, বিরোধ বাধায় স্বপ্নচারিতার সঙ্গে, কামনার সঙ্গে অতীত কর্মের ফলের। কোনো সুখস্বপ্নসম্ভব আয়োজন, আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন এখানে অনুপস্থিত। এখানে রয়েছে শুধু অনিবার্য ক্রূর নিয়তির তাড়না। জগদীশ গুপ্তের মানসদর্শনের সঙ্গে যিনি পরিচিত, তিনি জানেন নটবরের সিদ্ধার্থসাধনা সফল হবার নয়। শুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তনপ্রয়াসের যন্ত্রণা এবং ব্যর্থতাকে তিনি সুনিপুণ শিল্পভাষ্যে বিন্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন এখানে। এর সবই তিনি রূপায়িত করেছেন আগাগোড়া তিক্ত, রুক্ষ এবং নৈরাশ্যবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে। সম্ভবত এ দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কাজ করেছে তাঁর আশাবঞ্চিত ব্যক্তিজীবন।

জগদীশ গুপ্তের শিল্পবোধ ও প্রকরণকৌশলে তাঁর নিরীক্ষাধর্মিতার লক্ষণ স্পষ্ট। শব্দনির্বাচণে, বিষয়ের গুরুত্বে, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, চরিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ, যা তাঁর মানসবৃত্তের অনুকূল তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যের বিষয় করেছেন। সমকালীন অন্য লেখকের মতো নতুন পটভূমি আশ্রয় না করে করেছেন পুরনো প্রচলিত পটভূমি। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সমাজ-পরিবারের ঘটনাই তাঁর রচনার বিষয়। পটভূমিকে ঠিক রেখেও, চেনা অতি সাধারণ জীবনপরিবেশ আশ্রয় করেও উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন তার অসাধারণ জীবনবোধের পরিচয়। এক্ষেত্রে বাইরের পরিবেশকে ততোটা প্রশ্রয় না দিয়ে মনোযোগী হয়েছেন মানুষের অন্তর্গূঢ় জটিলতার চিত্রায়ণের দিকে। মানব মনের সুগভীর তলের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, তাকে সাহিত্যে রূপদানে জগদীশ গুপ্তের দক্ষতা অপরিসীম। পুরনো প্রচলিত সমাজপরিবেশ এবং ভাষা ব্যবহারে প্রাচীন প্রবণতাকে আশ্রয় করলেও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তাঁর আধুনিকতা অনস্বীকার্য। প্লটের চেয়ে চরিত্র-পরিস্ফুটনকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। পল্লবিত কাহিনীবিন্যাস তাঁর উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। বস্তুনিষ্ঠ জীবনদর্শন এবং চরিত্রকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরিচয় তাঁর সব উপন্যাসে স্পষ্ট। চরিত্রের বাস্তবসম্মত উন্মোচন ও বিশ্লেষণ, বিশেষ করে তার জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নিয়তির নিষ্ঠুরতা ও অলঙ্ঘনীয়তা তাঁর উপন্যাসের প্রধান দিক। ক্রীড়নক নিয়তির কাছে সংসারের মানুষ নিতান্তই অসহায়, তার উত্তরণের সব প্রচেষ্টাই তিনি ব্যর্থ হতে দেখিয়েছেন। তবে তাঁর এই নিয়তিবাদ অলৌকিক কিংবা অন্ধ ধর্মবিশ্বাস-আশ্রিত সাহিত্য স্রষ্টার জীবনদর্শন নয়, আধুনিক মানুষের রূঢ় জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। চরিত্রের পরিণতি-নির্ধারণে তাঁর ভাবাবেগমুক্ত নির্মোহ উচ্চারণে তাঁর ব্যর্থ ও হতাশাপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের প্রক্ষেপ বর্তমান, এটা অনুমান করতে কষ্ট হয়না।

জগদীশ গুপ্ত যা সৃষ্টি করেছেন— তা তাঁর একান্ত নিজস্ব চিন্তা ও দর্শনের ফল। জীবনের বিচিত্র পর্যায়ে বঞ্চনা ও অপ্রাপ্তিজনিত মনস্তাত্ত্বিক অসহায়ত্বই সম্ভবত তাঁকে এর অধিকারী করেছিল। তাঁর কথাসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো প্রধানত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে— সমাজ, মানুষ, সামাজিক পটভূমিতে গড়েওঠা তার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিচিত্র লক্ষণ এবং নিয়তির স্বেচ্ছাচার। ব্যক্তিচরিত্রের তলদেশ পর্যন্ত অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়াস তাঁর আধুনিক সাহিত্যচিন্তারই লক্ষণবাহী। যে সমাজজীবনকে তিনি আশ্রয় করেছেন তার রূপ তাঁর কাছে কখনোই ইতিবাচক ছিলনা। বরং সমাজ ও জীবন-লগ্ন থেকে এর অন্ধকার গলিত বীভৎস রূপকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, মহিমার দিকটিকে খুঁজে পাননি কোথাও। তাঁর রচনায় মানুষের সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার বিপরীতে কাজ করেছে তার প্রবৃত্তি। কিন্তু এ থেকে উত্তরণের কোনো ইঙ্গিত দেওয়ার আবশ্যকতা তিনি বোধ করেননি। এ প্রবৃত্তিজনিত পাপ প্রায়ই সামাজিক শোষণ, অবিচার বা অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত। তাঁর গল্প-উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে নিচুপর্যায়ের মানুষ। অবস্থাচক্রে তারা নৈতিক আচার-আচরণের সীমা ও সমাজশোভন রীতিনিয়মের লঙ্ঘনকারী। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা সমাজ ও তার অবিচারকে প্রত্যক্ষ করছে, এর

Dhaka University Institutional Repository

যাঁতাকলে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এর সঙ্গে এসে মিলেছে দারিদ্র্যের তীব্রতা। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসেই লেখকের এ প্রবণতার সূচনা। নটবরের বেঁচে থাকার চেষ্টা এবং তজ্জনিত জটিলতারই রূপায়ণ এই উপন্যাসটি। এর কাহিনী, পরিণতি, চরিত্রায়ণ— এ সবকিছুর মর্মকোষে নিহিত রয়েছে লেখকের এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ-আশ্রয়ী বক্তব্য।

জগদীশ গুপ্তের অন্য উপন্যাস *লঘুগুরু*র উত্তমের সঙ্গে নটবরের ভাগ্যবিপর্যয়ের তুলনা করা যায়। মাতৃহীনা টুকির জননী হয়ে অতীত অধ্যায়কে মুছে ফেলতে চেয়েছে পতিতা নারী উত্তম। কিন্তু টুকির পিতা বিশ্বম্ভর সে অধ্যায়কে খুঁচিয়ে তুলে বারবার তাকে যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে পতিতা। কিন্তু উত্তম চেয়েছে শুদ্ধ জীবনে উত্তরণ করতে। টুকিকে গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে চলে তার অব্যাহত প্রয়াস। রান্নাবান্না, সেলাই ইত্যাদি সাংসারিক ও মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম শেখানোর মাধ্যমে উত্তম টুকির ভেতর দিয়ে নিজের জীবনেরই সংশোধিত রূপ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু তার অতীতের অভিশপ্ত ছায়া টুকির বিবাহিত জীবনকে গ্রাস করে ফেলে যেন নিয়তিরই চক্রান্তে। উত্তমের প্রত্যাবর্তন-প্রয়াস অমোঘ ব্যর্থতায় ভেঙে টুকরো হয়ে যাবেই— টুকির অন্ধকারে অন্তর্ধানের মধ্যদিয়ে লেখকের উপলব্ধিজাত এ সত্যই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। নাট্যিক নির্লিপ্ততা এবং স্বল্পভাষী সংযতকৌশলে লেখক তার চেতনস্তরে উত্থিত প্রশ্নগুলোর মীমাংসা এভাবে খুঁজেছেন। কর্মফলের অনিবার্যতার কাছে মানুষের স্বাধীনতার অবলুপ্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। গণিকা-প্রতিপালিতা বলেই টুকির জীবন শেষ পর্যন্ত গণিকাবৃত্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। টুকির জীবন যেন উত্তমেরই দ্বিতীয় অধ্যায়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, উত্তম নষ্টজীবন থেকে শুদ্ধতায় ফিরে আসার আগ্রহী, আর নানান ঘাতপ্রতিঘাতের কারণে টুকিকে শুদ্ধজীবন থেকে চলে যেতে হয়েছে নষ্টজীবনের অন্ধকারে। উত্তম ও সিদ্ধার্থের নতুন জীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা ও পুরনো জীবনকেন্দ্র থেকে প্রত্যাবর্তনের ব্যর্থতা অভিন্ন। কিন্তু টুকির বিষয়টি ভিন্ন বলে সিদ্ধার্থের সঙ্গে তাকে খুব বেশি মেলানো সম্ভব নয়। তবে উভয়েই নষ্ট হয়েছে নিজের দোষে নয়, সম্পূর্ণরূপে পরিবেশের দ্বারা তাড়িত হয়ে। সিদ্ধার্থের প্রথম জীবন আর টুকির শেষের জীবন নষ্টতার সাক্ষী। উত্তম ও টুকির জীবনের দুটো অংশ ভিন্ন ভিন্নভাবে নটবরের দুটো অংশের সঙ্গে মেলে। উভয় উপন্যাসে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, নটবরেরা যেমন সিদ্ধার্থ হয়ে অভিশপ্ত অতীত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেনা, তেমনি উত্তমরাও পারেনা শুদ্ধ, সুস্থজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবন বিষয়ক নির্দিষ্ট এবং অভিন্ন সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যকে প্রাণদানের চেষ্টা করেছেন তাঁর *অসাধু সিদ্ধার্থ* এবং *লঘুগুরু*তে।

*অসাধু সিদ্ধার্থে*র সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের অন্য উপন্যাসেরও রয়েছে বিভিন্ন দিক দিয়ে মিল। নায়কের রূপের বর্ণনা রয়েছে *অসাধু সিদ্ধার্থ*, *মহিষী*, এবং *রোমন্থন* উপন্যাসে। প্রথমটিতে রাসবিহারীর পত্রভাষ্যে সিদ্ধার্থের আভিজাত্যপূর্ণ চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়। আয়নায় মুখ দেখে সে নিজেও এর সত্যতা জেনেছে। *মহিষী*র অশোকও 'সুপুরুষ, বর্ণ গৌর, দেহ সুগঠিত সবল; মোটের উপর এমন একটা অভিজাতশ্রী আর গাম্ভীর্য আছে যা সুলভ নয়'। ১/১৫৭ *রোমন্থনে* 'তিনভাইই সুপুরুষ, নধর গঠন, ধনীর দুলাল বটে'। ২/৮৩

অসাধু সিদ্ধার্থে নায়কের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানসঅবস্থা বোঝাতে দীপশিখার চিত্রকল্প এবং *মহিষী*তে অশোকের দ্বিধাগ্রস্ত আত্মবিশ্লেষণে তুলাদণ্ডের চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন দীপের চঞ্চল শিখাগ্রটা ঊর্দ্ধের অন্ধকারের অঙ্গে সূক্ষ্মতম রেখায় বিদ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—

কিন্তু দাহ তার থাকেই। *অসাধু সিদ্ধার্থঃ* ১/৭৩

অশোক মনে মনে একটা তুলাদণ্ড বসাইয়া তার একদিকে চাপাইল কাল্পনিক সুন্দরী স্ত্রীকে, অপর দিকে চাপাইল বাপের টাকাগুলিকে। প্রথমটা তুলাদণ্ড সমতালে দুলিতে লাগিল, কোনদিকে ওজন বেশী তাহা ধরা গেল না। তারপর এক-একবার মনে হইতে লাগিল, টাকার দিকটাই যেন বেশী ভারি; আর একবার মনে হইতে লাগিল—না, ওই দিকটাই, যেদিকে সুন্দরী স্ত্রী। তারপর একদিন টাকার দিকটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একেবারে অনড় হইয়া রহিল—আর তার উঠিবার গতিক দেখা গেলনা। *মহিষীঃ* ১/১৬০

উভয় উপন্যাসেই কখনো কখনো বিন্যস্ত হয়েছে শ্রুতিময়তাআশ্রয়ী বাক্য—

একটা রুদ্ধ আহ্বান-গর্জনের মত অবিরাম অনন্ত তার শব্দ; ... অতলে গর্জন করিতেছে মৃত্যু। *অসাধু সিদ্ধার্থঃ*১/৮০

তাঁর তীর্থগামী কণ্ঠস্বর যেন খড়ের চালের আর মাটির দেয়ালের বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া অশোকের কানের কাছেই মধুপগুঞ্জনের মত ঘুরিতে লাগিল। *মহিষীঃ* ১/৬১

স্বপ্ন দেখার পর নায়কের মানস-প্রতিক্রিয়ার কথা এবং স্বপ্ন-বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের কথা রয়েছে—

স্বপ্ন মিথ্যা, কিন্তু আনন্দটি পরম সত্য। *অসাধু সিদ্ধার্থঃ* ১/১৪৭

স্বপ্নে দেখা মূর্তি শান্ত কোমল সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই; *নন্দ আর কৃষ্ণঃ* ২/৩৩

ভাষা কিংবা বাকবিন্যাসের দিকদিয়ে সঙ্গতি লক্ষ করা যায় বিভিন্ন উপন্যাসের কোনো কোনো স্থানে—

তার কল্পনাপক্ষী উড়িতেছিল, ত্রেতার সমুদ্রমন্থনের উপর। *অসাধু সিদ্ধার্থঃ* ১/১২৪

আমার কল্পনা ছুটিতেছিল। *দুলালের দোলাঃ* ১/২২৩

একটি কথা তার জিহ্বাগ্রে কাঁপিতেছে— আকর্ষিত জ্যা-লগ্ন তীরের মত লক্ষ্যে পৌঁছিবার তার স্পন্দহীন অব্যক্ত অধীরতা। *অসাধু সিদ্ধার্থঃ* ১/১৪৪

রক্ত তোলপাড় করিয়া একটি উত্তর নন্দকিশোরের জিহ্বাগ্রে নাচিয়া উঠিল, *নন্দ আর কৃষ্ণঃ* ২/৩৯

কোনো কোনো চরিত্রের বেনামে ধর্মের নামে যুক্তিহীন অপসংস্কারকে আঘাত করেছেন লেখক—

নিজের সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য— এইটি মনে করিয়ে দিয়ে যাদের আমরা উঠতে দিই না, উঠতে চেষ্টা করলে ধর্মের রব তুলে যাদের মাথার উপর দেবতার নামে লাঠি উদ্যত করি, তাদের প্রশান্ত বাহ্য অবয়বের নীচে কতবড় একটা বিক্ষোভ অহর্নিশি আলোড়িত হচ্ছে তা বুঝি আমরা কল্পনাও করতে পারিনে। ...ধর্মের গ্লানির ভয়ে কল্পিত বড়-র পা চিরদিন তারা কণ্ঠের উপর রাখবেনা। *অসাধু সিদ্ধার্থঃ* ১/১০৬

Dhaka University Institutional Repository

আগে মানুষ, তার পরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে— আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছে। ...কবে শূদ্র অপবিত্র ছিল জানিনে, কিন্তু আমি আপনাদের কারো চাইতে দেহে-মনে কম পবিত্র নই; আপনারা না জানলেও অন্তর্যামী তা জানেন। *দুলালের দোলা*ঃ১/২৫১

কপটতা-আশ্রয়ী চরিত্র-নিরূপণে অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে কোথাও কোথাও—

তারপর সিদ্ধার্থ চোখ বুজিয়াছিল,...। তার অবশ জিহ্বা জড়িতস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিল,— আমি কোথায়? অজয়া—

কিন্তু আগাগোড়া তার অভিনয়। *অসাধু সিদ্ধার্থ*ঃ ১/১৩০

ব্রজকিশোর অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলেন—

...শুনিতে বিস্ময় লাগে, ব্রজকিশোরের এই ক্রোধাভিব্যক্তির বারোআনাই ভান।

মহিষীঃ ১/ ১৯০

রূপাকর্ষণের কারণে নায়কের অভিলাষ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার কথা রয়েছে *অসাধু সিদ্ধার্থ* এবং *নন্দ আর কৃষ্ণায়* । রূপাকর্ষণ ছাড়াও সিদ্ধার্থের রয়েছে অজয়ার ধনের প্রতি আকর্ষণ। নন্দও কৃষ্ণার রূপের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে, শুধু তাই নয়, তার শরীরও তাকে টেনেছে, 'সে আরো চায়'। আবার দু'জনেরই এ ক্ষেত্রে বিবেকতাড়না এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। দু'জনেই এই দ্বন্দ্ব ও তাড়নার কারণে পলায়ন করতে চেয়েছে একাধিকবার।

নিয়তি তাড়া করে ফিরেছে এবং শেষপর্যন্ত সফল হতে দেয়নি কোনো কোনো চরিত্রকে। তারা হলো—*অসাধু সিদ্ধার্থের* সিদ্ধার্থ *লঘুগুরুর* উত্তম এবং *তাতল সৈকতের* শরৎ।

নষ্ট জীবনে লগ্ন থাকতে সিদ্ধার্থকে বারবার প্ররোচিত এবং বাধ্য করেছে রাসবিহারী। রণজিতের জননী হয়ে নিশ্চিন্ত জীবনে স্থিত হতে দেয়নি শরৎকে, রণজিতের গ্রামবাসী। সিদ্ধার্থের শুদ্ধতায় উত্তরণআকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করার সর্বশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন কাশীনাথ। শরতের আত্মহত্যার পথ তৈরি হয়েছিল ভিক্ষা করতে আসা তারই গাঁয়ের রমাবৈষ্ণবী এবং রণজিতের গাঁয়ের রাজনন্দিনী নাম্নী নারীর সহযোগে ও আচরণে।

অসাধু সিদ্ধার্থ, নন্দ আর কৃষ্ণা এবং *নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের* স্থানে স্থানে মনস্তাত্ত্বিক শিল্পপ্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে কোনো কোনো চরিত্রের আচরণে।

অসমাপিকা-ক্রিয়াসূচক বাক্য রয়েছে বিভিন্ন উপন্যাসে—

অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গণার—

সিদ্ধার্থ এইখানে ব্যথায় মুখ বিকৃত করিয়া 'উঃ' বলিয়া একটা আর্তনাদই করিল। *অসাধু সিদ্ধার্থ*ঃ ১/১৩১

আর তোমার শ্বশুরের যে সম্পত্তি আছে তার সিকি পেলে আমিই এই বয়সে—

যে কোনো কালোকুশ্রী মেয়েকে বিবাহ করিতে রাজি আছেন তাহা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভৃত্যের উদ্দেশে মধুসূদন বলিলেন— ওরে, তামাক দে। *মহিষী*ঃ ১/১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

যদি ভালবাসার ফলে আমার বাপের জন্ম হ'ত তবে একটা প্রবোধ ছিল—অতিশয় ঘৃণ্য লালসার ফলে তাদের—

বলিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, *দুলালের দোলা* ঃ ১/২২৯

প্রাণনাথের আরো মনে হইল, ইহারা আহ্নিক করে না, গায়ত্রী ইহাদের মুখস্থ নাই—যদি থাকে তবে—আমার এই টিকি—

কিন্তু পারত্রিক টিকিটি কঙ্কালী-দেবীর দুয়ারে বাঁধা দিবার পূর্বেই প্রাণনাথ শিহরিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। *রোমন্থন*ঃ ১/৮৩

ঘটনা বর্ণনাচ্ছলে দু'একস্থানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন—

জমিদারের কথা আর শুদোবেন না বাবু। ... তিনি বার মাস কলকাতাতেই থাকেন। এখানে নায়েব গোমস্তারা থাকে, হাঙ্গামা হুজ্জুত যা করবার তা তারাই করে। *অসাধু সিদ্ধার্থ* ঃ ১/১৩৯

মন্মথনাথ দুর্ধর্ষ লোক বলিয়া একটা জনশ্রুতি বিবাহের পর ক্রমশঃ তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। এবং ইহাও অবগত হওয়া গেছে যে, মুসলমান আমলের শেষভাগে তাহার পূর্বপুরুষগণ জলে স্থলে দস্যুতা করিতেন; বর্তমানে সেই ধনেরই জের চলিতেছে। ধনের সঙ্গে নরহত্যা প্রবণতাও বংশ-পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে কি না কে জানে।

মহিষী ঃ ১/১৮৪

দুলালের দোলায় আশীবছর বয়সী পিরুর স্মৃতিচারণ-মূলক বক্তব্যে এসেছে অনেক অতীতচিত্র, যার অনেকটাই ইতিহাস-সমর্থিত।

পল্লীর সঙ্গে অন্তর-যোগহীন শহরবাসী মানুষের পল্লীগ্রাম সম্পর্কে ভ্রান্তধারণাপ্রসূত চিন্তাভাবনা ও আচরণের কথা রয়েছে কোনো কোনো উপন্যাসে। *অসাধু সিদ্ধার্থে* নটবরের সঙ্গে রজতের পল্লীভাবনা-আশ্রয়ী কথাবার্তায় এবং *রোমন্থনে* তিন ভাইয়ের পল্লীগ্রামে যাত্রার আয়োজনের সময়কার বর্ণনায় রয়েছে তার পরিচয়। শেয়ালের ডাক শুনে ভীত শিশু রজতকে নিয়ে পরদিনই তার জননীর শহরে ফিরে আসার কথা জানিয়েছে সে। *রোমন্থনেও* মাত্র এক রাত অবস্থান করেই 'বিসর্জনের পর সুগঠিতা বহুবর্ণা প্রতিমাকে জলের উপর টানিয়া তুলিলে যেমন দেখা যায়'— পল্লীগ্রাম তেমনি শ্রীহীনা বিবেচিত হয়েছে তিন ভাইয়ের কাছে। তারা পরদিনই শহরে প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তুতি নিয়েছে। *দুলালের দোলায়ও* নানারকম বিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে দ্রুত শহরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে উপন্যাসের কথক নিরোদ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। সে সময়কার নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

২। মেঘচামী 'মেঘচুম্বী' শব্দের আঞ্চলিকতাদুষ্ট উচ্চারণ।

৩। প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে* (কলকাতাঃ বেস্ট বুকস, ১৯৯২),পৃঃ ২২৪। গ্রন্থে উল্লিখিত বংশ লতিকায় দেখা যায়— আনন্দচন্দ্র গুপ্তের কন্যা আলোমণি দেবী, তাঁর দুই পুত্র—কৈলাশচন্দ্র গুপ্ত ও প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত।

৪। আবুল আহসান চৌধুরী, *জগদীশ গুপ্ত* 'জীবনী গ্রন্থমালা'১৩ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮) পৃঃ ১৪।

৫। যদুনাথ সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন আইনজীবী। নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৫) এর 'জীবনীর সংক্ষিপ্ত তথ্য' অংশে 'চাকরি জীবনের সূত্রপাতের সময়েই' তাঁর বিয়ে হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৭। চারুবালা দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়— পিতৃদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় করে বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন তিনি নিজে, স্বামীর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করেননি।

৮। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর এটি প্রকাশিত হয়।

৯। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,'বাংলা ছোটগল্পের তিন দিকপাল', *দেশ,* ৫৯ বর্ষঃ ৩১ সংখ্যা ৩০মে ১৯৯২, পৃঃ ৩৫।

১০। *শনিবারের চিঠি,* বৈশাখ, ১৩৬৪, পৃঃ ৫। আবুল আহসান চৌধুরী, পৃঃ ৩৮-এ উদ্ধৃত।

১১। *যুগান্তর,* ৪ বৈশাখ, ১৩৬৪। প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪—৪৫-এ উদ্ধৃত।

১২। *দেশ.* সাময়িক প্রসঙ্গ, ২৪ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ ১৩৬৪। প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৫—৪৬-এ উদ্ধৃত।

১৩। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩৭।

১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯।

১৫। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩৬।

১৬। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতাঃ জগদীশ গুপ্ত* (কলকাতাঃ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃঃ ১১৪।

১৭। অবন বসু,'তিন ঈশ্বরের কালিকলম', *দেশ,* সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃঃ ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় রাখহরি শ্রীমানী এন্ড সন্স, কলকাতা থেকে। প্রথম প্রকাশের সময়ে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল একশ' তিরানব্বই। বর্তমানে আটাত্তর পৃষ্ঠায় এটি সমাপ্ত।এর প্রকাশকাল নেই, তবে অনুমান করা হয় যে— ভাদ্র, ১৩৩৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯। প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

২০। ঐ,পৃঃ ১০২।

২১। অনিলবরণ রায়,'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ', *বিচিত্রা,* ভাদ্র, ১৩৩৬। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬০-এ উদধৃত।

২২। মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য বিতান* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ বিদ্যালয় লাইব্রেরী, ১৩৮৮), পৃঃ ৩৭৩।

২৩। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫১।

২৪। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪।

২৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৮।

২৬। রণেন্দ্রনাথ দেব, *বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়* (কলকাতাঃ বুকল্যান্ড, ১৯৬৪),পৃঃ ১১।

২৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮০।

২৮। সমরেশ মজুমদার, *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৯।

২৯। ভীষ্মদেব চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ছোটগল্প, *সাহিত্য পত্রিকা,* অষ্টাবিংশ বর্ষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯১, পৃঃ ৪৯।

৩০। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু ঃ সাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু ঃ সাড়া

ভূদেব বসু ও বিনয়কুমারীর প্রথম সন্তান বুদ্ধদেব বসু (১৯৮০-৭৪) জন্মগ্রহণ করেন (৩০ নভেম্বর) কুমিল্লায়। মাত্র ষোলোবছর বয়সে এবং সন্তান জন্মাবার মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনয়কুমারী মৃত্যুবরণ করেন। জন্মলগ্নে মাতৃহীন হয়েও মায়ের মমতাবঞ্চিত থাকেননি বুদ্ধদেব। সে মমতা লাভ করেছিলেন দিদিমা স্বর্ণলতা দেবীর কাছ থেকে। স্ত্রী বিয়োগজনিত শোকে ভূদেবচন্দ্র বছরখানেকের জন্যে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করলে বুদ্ধদেব লালিত ও বর্ধিত হন মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ও দিদিমা স্বর্ণলতা দেবীর স্নেহচ্ছায়ায়। পিতামহ তাঁর জীবনের 'প্রথম শিক্ষক, প্রথমবন্ধু ও প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী', যিনি চাকরির সময়টুকু ছাড়া বাকি সবটুকুই তাঁর পেছনে ব্যয় করেছেন। তাঁকে তিনি ইংরেজি শিখিয়েছিলেন পরম যত্নে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত। অল্প বয়সে স্কুলে ভর্তি হননি বুদ্ধদেব, নোয়াখালির বাংলো বাড়িতে মাতামহের কাছে শৈশব কৈশোরের পড়াশোনার পর্ব অতিবাহিত হয়েছে তাঁর। মুখে মুখে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার, ইংরেজিতে রোজনামচা লেখা, সংস্কৃত শ্লোক, শব্দরূপ, ধাতুরূপ– এ সবকিছুরই চর্চা তাঁর এইখানে। আর বাংলা শেখায় সহায়ক হয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাভাষার 'জাদুকর'দের রচনা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দের অনুরণন তাঁর কান ও প্রাণকে আকর্ষণ করেছিল সেই কৈশোর কালেই, যখন তাঁর বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। চিন্তাহরণ সিংহ তাঁকে টাউনহল লাইব্রেরি থেকে জোগাড় করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর* আর *ছিন্নপত্র*। বুদ্ধদেবের সাহিত্যমানস গঠনে এবং সাহিত্যচর্চার অঙ্কুরোদ্গমে চিন্তাহরণ সিংহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কলকাতা থেকে ভি.পি. ডাকে তাঁকে আনিয়ে দিতেন *সন্দেশ* ও *মৌচাক*। *প্রবাসী* এবং *ভারতবর্ষ*ও তিনি পড়তেন অতি অল্প বয়সে। এভাবে এক সময়ে নিজের পত্রিকা প্রকাশের আত্মবিশ্বাস জন্মে যায় তাঁর। প্রকাশ করেন *বিকাশ* অথবা *পতাকা* নামে হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা—যার সম্পাদক, প্রধান লেখক এবং লিপিকার– সবই তিনি নিজে। বয়স যখন তাঁর বারো কি তেরো– নানান পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে তখন থেকেই। ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা *তোষিণী*তে তাঁর লেখা বেরোয়, বেরোয় কলকাতার *অর্চনায়*,এমন কি *নারায়ণে*ও। তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা নোয়াখালি শহরে ওই অস্ফুট কৈশোরেই।

শৈশবাবধি নিরিবিলি স্বভাবের মানুষ হলেও সনাতন সংস্কারের কিছু কিছু প্রচলিত চিন্তাচেতনার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব তৈরি হয়েছিল তাঁর তখন থেকেই।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বালকমাত্র, কিন্তু ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন তাঁর কিশোর চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। 'অজ্ঞান বয়স থেকেই' যে চা পানে আসক্ত, তা ছেড়ে দিলেন 'কুলির রক্ত' নামে অভিহিত হওয়ার কারণে। মোটা খদ্দর পরতে থাকলেন, লিখতে লাগলেন দেশপ্রেমমূলক রচনা। জেলে যাবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্যে সাধ্যের মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই করেছিলেন সে সময়ে।

বুদ্ধদেব ১৯২২ সালে ঢাকায় চলে এলেন পরিবারের সবার সঙ্গে। ১৯২৩-এ নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায়। ঢাকায় ওয়ারির ২৩ নম্বর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের বাড়িতে অবস্থিতির সময়টি তাঁর সাহিত্যিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কাল। এ সময়েই তিনি বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন প্রভুচরণ গুহঠাকুরতার,

Dhaka University Institutional Repository

যাঁর মাধ্যমে দেশবিদেশের বিচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন তখন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্বেই, ১৯২৪ সালে, যখন বয়স মাত্র ষোলো, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মর্মবাণী*। ত্রিশটি কবিতা সংবলিত এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলো কবিতার নামকরণে এবং কাব্যভাবে রবীন্দ্রানুসরণের লক্ষণ ছিল বর্তমান।

পরে, *প্রগতি* পত্রিকার সম্পাদনাকালে, *মর্মবাণী*কে তাঁর কাছে 'ছেলেমানুষী' মনে হয়েছিল। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার সময়ে তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে মিলে প্রকাশ করেছিলেন *ক্ষণিকা* নামে হাতে লেখা পত্রিকা। ১৯২৫ সাল থেকে ঢাকায় তাঁর বসবাসের ঠিকানা পরিবর্তিত হয়ে যায় ৪৭ নম্বর পুরানা পল্টনে। ১৯২৭ সালে আই.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকার স্কলারশিপ পেলেন বুদ্ধদেব। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন, এ সময়েই তাঁর সম্পাদিত হাতে লেখা *প্রগতি* পত্রিকাকে প্রকাশ করলেন ছাপার অক্ষরে। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় ছিলেন প্রভুচরণের পিসতুতো ভাই অজিতকুমার দত্ত (১৯০৭-৭৪)। ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার সময়েই কলকাতায় এসে *কল্লোলে*র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। *প্রগতি*র দ্বিতীয়বর্ষ থেকে এতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর প্রথম উপন্যাস *সাড়া*। *কল্লোলে*র প্রভাব পড়েছিল *প্রগতি*তে, সমাজের নিচুতলাবাসী ক্ষুধার্দীর্ণ, হতাশাগ্রস্ত মানুষেরা হয়েছিল এরও বিষয়। *কল্লোলে*র মতোই অশ্লীলতার অভিযোগে তখন আক্রান্ত হয়েছিল *প্রগতি*। স্কলারশিপের টাকা, কিংবা দিদিমার গহনা বিক্রির সম্বল সত্ত্বেও পত্রিকাটি দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয়নি। ১৯২৭ সাল থেকে'২৯ মাত্র দু' বছর কালের *প্রগতি* যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, 'রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে' আটকা পড়ে না থাকার অঙ্গীকার ছিল তার। রবীন্দ্রবিদ্রোহীর আখ্যা লাভ করেছিলেন *প্রগতি*-সম্পাদক বুদ্ধদেব তখন থেকেই। অথচ, 'রবীন্দ্রবিদ্রোহ' নয়, 'রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করার প্রয়োজনেই 'প্রগতি' তাঁকে পরিহার করেছে, রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যকে ঋদ্ধতর করতে চেয়েই তাঁর সর্বগ্রাসী, মোহময় উপস্থিতিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে'।[২]

প্রগতি -সম্পাদনার সময়ে *কল্লোলে*র সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, শিবরাম চক্রবর্তী, মণীশ ঘটক, প্রবোধ সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ছাত্র-সংসদের সাহিত্যপত্র-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এ সময়ে জগন্নাথ হলের বার্ষিক পত্রিকা *বাসন্তিকা*র শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তাঁরই দ্বারা। কিন্তু ঢাকার জীবন তাঁর ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছিল। *প্রগতি* উঠে গেলো। অনার্সে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করলেও এম. এ. পরীক্ষার ফি জোটানো দায় হলো। মাতামহের জীবনবীমার সঞ্চয়, দিদিমার বাকি সামান্য অলঙ্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি, পুরস্কারলব্ধ স্বর্ণপদক, লেখার সামান্য কিছু উপার্জন—সব শেষ হয়ে গেলে এম. এ. পরীক্ষার ফি-র ব্যবস্থা হয় দিদিমার ভাইয়ের আনুকূল্যে।

এম.এ. পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন বুদ্ধদেব। কিন্তু ওই সময়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিক্ষোভ আর রাজনীতির উত্তাল পরিবেশে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছিল। ১৯৩১-এ শেষবারের মতো ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। ভালো রেজাল্ট সত্ত্বেও কলকাতায় চাকরি পাওয়া সহজ হলোনা। অচিন্ত্যকুমারের সহযোগিতায় গৃহশিক্ষকতার একটি কাজ পেয়ে সাহিত্যরচনায় মন দেন তিনি। প্রতিটি বছরে কাব্য ও গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাসের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ সালের ১৯ জুলাই তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন প্রতিভা বসুর সঙ্গে, এ সময়েই তৃতীয়বারের চেষ্টায় রিপন কলেজে অধ্যাপনার চাকরিটিও হয়ে যায় তাঁর।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে *কবিতা* পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। *কবিতার* প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪২-র আশ্বিনে (১৯৩৬), আর তা বন্ধ হয়ে যায় ১৩৬৭-র চৈত্রে (১৯৬১)। পঁচিশ বছর আয়ুষ্কালের এ পত্রিকাটি প্রধানত বুদ্ধদেবই সম্পাদনা করেছেন।[৩] *প্রগতি*তে যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখার প্রয়াস, *কবিতায়* তেমনি তাঁর 'অনায়াস অবিরল উপস্থিতি' লক্ষ করা যায়। *কবিতা*র পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেছেন *বৈশাখী* নামে একটি বার্ষিকী। ১৯৩৮ সালে হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) সঙ্গে সম্পাদনা করেন *চতুরঙ্গ* নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। নানান কারণেই রিপন কলেজের অধ্যাপনা-জীবন তাঁর সুসহ হয়নি।[৪] তাই ১৯৩৫ থেকে'৪৫ কোনোরকমে বছর দশেকের কাছাকাছি কাটিয়ে অবশেষে রিপন কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেন। সাংবাদিকতা (১৯৪৪), ইউনেস্কোর প্রকল্পে উপদেষ্টা (১৯৫২), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অধ্যক্ষতা (১৯৫৬) ইত্যাদি বিভিন্ন পদ ও পেশা গ্রহণ ও ত্যাগ করেন। পেশাগত জীবন বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল হলেও সাহিত্যজীবনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। প্রতিদিন নিয়ম করে গড়ে দশঘন্টা লেখার টেবিলে কাটিয়েছেন, নিজেকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তোলার অভ্যাসে নিয়োজিত থেকেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। লেখালেখি করে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেছেন, বলা বাহুল্য,এ প্রচেষ্টায় তাঁর সাফল্য অর্জন খুব সহজ হয়নি। কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন অজস্র ধারায়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী (১৯২৮-৭১) রচিত তাঁর উপন্যাসের সংখ্যাই চল্লিশের অধিক। এ ছাড়াও সাহিত্যপত্র সম্পাদনা, মৌলিক ও অনুবাদ কবিতাগ্রন্থ, স্মৃতিকথা, কিশোর পাঠ্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য, নাটক, গোয়েন্দা উপন্যাস ইত্যাদি মিলিয়ে সংখ্যাধিক রচনা রয়েছে তাঁর।

সাহিত্য-রচনায় তাঁর নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই জুটেছে। পরবর্তীকালে দেশে ও দেশের বাইরে সম্মান পুরস্কারও কম লাভ করেননি। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় লিখে অনেকেই বিখ্যাত হয়েছেন। কবি তৈরি করা না গেলেও 'অনুকূল অনুষঙ্গে' কবিতার ভালো পাঠক তৈরি করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি *কবিতার* আষাঢ়, ১৩৪৩ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাঁর যে অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির জগৎ তৈরি হয়েছিল, সারাজীবন ধরে তারই বিকাশলাভ ঘটেছে পরস্পরের স্নেহে এবং শ্রদ্ধায়। বুদ্ধদেবকে লেখা অনেকগুলো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অসমর্থতার জন্যে তাঁর কাছে লেখা না চাওয়ার অনুরোধ করেছেন। আর বুদ্ধদেব প্রতিটি চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে যথানিয়মে তাঁর কাছে লেখা প্রার্থনা করে গেছেন। এ থেকে কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধান্বিত দাবির জোরটুকু অনুমান করা যায়। অথচ রবীন্দ্রবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত হয়েছেন তিনি। রবীন্দ্র বিদূষণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার। প্রথম জীবনে অন্য আধুনিক লেখকদের মতোই রবীন্দ্রনাথ নয়, বরং রবীন্দ্রদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ অভিযোগের কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ছিল কৈশোরপ্রান্তিক মানসানুভূতি, যৌবন-সূচনায় যা কিনা আর লক্ষ করা যায়নি। অবশ্য, আর একবার এবং শেষবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত *বাংলাকাব্য-পরিচয়* নামে কবিতার সংকলন গ্রন্থ বেরোলে (আগস্ট, ১৯৩৮) তাতে তরুণ কবিদের প্রতিনিধিত্ব-মূলক কবিতা স্থান না পাওয়ায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। *কবিতা* পত্রিকায় একুশপৃষ্ঠা-ব্যাপী সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু নিজের ক্ষুব্ধপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এইভাবে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> গুজব শুনছি এডওয়ার্ড টমসনের উদ্যোগে একটি 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' বেরোবে খোদ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়— কিন্তু তার বদলে একদিন বেরোলো বিশ্বভারতী থেকে 'বাংলাকাব্য-পরিচয়' আমাদের জন্য গভীরতর নৈরাশ্য নিয়ে, এমন একটি নিশ্চরিত্র সংগ্রহ যে, চোখে দেখেও বিশ্বাস হয়না রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক। ... ভাবলে আমার এখনো মনে হয় সেই প্রেমের-কবিতা-বর্জিত গদ্য কবিতা রহিত পাঠ্যবইগন্ধী সংকলনটি জ্যোতিষ্মান রবীন্দ্রনাথ- নামের নিতান্তই অযোগ্য।[৫]

১৯৩৮ ডিসেম্বর প্রগতি লেখকসঙ্ঘের সম্মেলনে একদীর্ঘ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করে প্রকাশ করে *অমৃত বাজার পত্রিকা*। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং এই বক্তৃতাটি যে-প্রবন্ধের 'সারাংশ' তার কপিটিও সেই সঙ্গে পাঠান। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঃ

> কী বলেছিলাম ঈশ্বরের দয়ায় সবই বিস্মৃত হয়েছি; শুধু একটা কথা, যেহেতু 'অমৃত-বাজার' সেটাকে হেডলাইনে বিঁধে খেলিয়েছিলো এবং তা নিয়ে বাগবিতণ্ডাও মন্দ হয়নি, এখনো আমাকে কৌতুকের কণ্ডুয়ন জোগায় মাঝে-মাঝে। The age of Rabindranath is over. শুনেছি রবীন্দ্রনাথও ব্যথিত হয়েছিলেন কথাটা শুনে। তিনি কি জানতেন না ঘোষণাকারীর একদণ্ড রবীন্দ্রনাথ বিনা চলেনা।[৬]

কবিতা পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত রবীন্দ্রনাথের লেখা ও রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা থাকতো। বুদ্ধদেবের গোটাজীবনের রচনা জুড়েই রয়েছে তাঁর রবীন্দ্রভক্তির সাক্ষ্য। *রবীন্দ্র রচনাবলী* প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব *কবিতা* পত্রিকার পৌষ ১৩৪৬ সংখ্যায় তাঁর আলোচনা করেন। এর মধ্য থেকে বুদ্ধদেবের চোখে রবীন্দ্রনাথের স্থান কী তা জানা যায়ঃ

> সত্যি বলতে, পৃথিবীর মহৎ কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয় শুদ্ধ এই কারণে যে তিনি একা, তাঁর জীবনের সাধনায় নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর অন্যকোনো কবি তা করতে পারেননি।[৭]

বুদ্ধদেব সপরিবারে দু'বার রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে। এর স্মৃতিচারণ রয়েছে তাঁর *সবকপেয়েছির দেশে* গ্রন্থে।[৮] বুদ্ধদেবের সারাজীবনের লেখায়, গল্প-উপন্যাসে, বিশেষত প্রবন্ধের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রবীন্দ্রভাবনার পরিচয় ছড়ানো। মেয়ে রুমির কাছে লেখা অনেকগুলো চিঠিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অজস্র বয়ান। তাঁর *সাড়া* উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি কমপক্ষে পাঁচবার।

কল্লোলের খুব নিয়মিত লেখক না হলেও গভীরতর অর্থে বুদ্ধদেব ছিলেন *কল্লোল*গোষ্ঠীভুক্ত লেখক। *কল্লোল* প্রকাশের প্রায় তিনবছর পর একটি কবিতার মাধ্যমে এ পত্রিকায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। গোকুল নাগের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে রচিত 'যৌবন-পথিক' *কল্লোলে* প্রকাশিত (তৃতীয় বর্ষঃ ৮ম সংখ্যাঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) তাঁর প্রথম রচনা। এরপর থেকে, অচিন্ত্যকুমার- প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো না হলেও দু'একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে দিয়ে প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি এতে লিখে গেছেন। এতে লিখেছেন তিনি একটি অনুবাদ ও দশটি মৌলিক কবিতা, ছয়টি প্রবন্ধ, চারটি গল্প ও একটি সমালোচনা। *কল্লোলে* তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মর্ম্মবাণী* প্রকাশিত হলে *কল্লোলের* 'ডাকঘর' বিভাগে (আষাঢ়, ১৩৩২)এর প্রশংসা এবং কিশোর কবির সাহিত্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল। *কল্লোলে* প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প এবং চতুর্থ রচনা 'রজনী হ'লো উতলা' প্রকাশিত হলে (৪র্থ বর্ষঃ ২য় সংখ্যাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) রক্ষণশীল সমাজ, বিশেষকরে,আধুনিক সাহিত্যের বিরোধী মুখপত্র *শনিবারের চিঠির* আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন তিনি। বয়স তখন তাঁর আঠারোর মতো। এরপর *এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে* (১৯৩২) গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হলে অশ্লীলতার অভিযোগে তা বাজেয়াপ্ত হয় (১৯৩৩)। *রাত ভ'রে বৃষ্টি* (১৯৬৬) উপন্যাসের জন্যে অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হতে হয়েছে (১৯৬৯) তাঁকে। *কল্লোলের* সঙ্গে নিগূঢ় সূত্রবদ্ধতাকে চিহ্নিত করতে হলে এখানে প্রকাশিত তাঁর রচনার সংখ্যার বিচার নয়, বরং *কল্লোলের* মর্মলক্ষণের সঙ্গে একাত্মতার বিচারই প্রাধান্য পাবে। এ বিচারেই সম্ভবত তাঁকে *কল্লোলের* 'কথা-কোবিদ' [৯] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *কল্লোলের* সঙ্গে যুক্ত সময়টিই মূলত তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সূচনাপর্ব। বিশেষত *কল্লোলে* 'বন্দীর বন্দনা' কবিতা প্রকাশিত হবার পর তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তিতে রয়েছে এর সাক্ষ্য—

> ...কয়েক মাস পরেই 'বন্দীর বন্দনা' কবিতা লেখা হয়ে গেলো। এতদিন শূন্যে ঝুলে থাকার পর আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম এবার— অন্তত একটু দাঁড়াবার জায়গা।[১০]

বুদ্ধদেব বসু অজিতকুমার দত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে মাসিক পত্রিকা *প্রগতি* প্রকাশ করেছিলেন, তাতে ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস *সাড়া* প্রকাশিত হয়। *প্রগতিতে* *সাড়া* আংশিকভাবে (দ্বিতীয় বর্ষঃ প্রথম সংখ্যাঃ আষাঢ়, ১৩৩৫ থেকে তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যাঃ আশ্বিন ১৩৩৬ পর্যন্ত) প্রকাশিত হবার পর ১৯৩০-এ কলকাতার গুপ্ত ক্রেন্ডস এন্ড কোং থেকে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। পরে পরিমার্জিতরূপে *সাড়ার* দ্বিতীয় (১৯৪৭) এবং তৃতীয় (১৯৫৯) সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের বিশ বছর বয়সে রচিত *সাড়ার* কাহিনীসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

নোয়াখালির এক মফস্বল শহরে বঙ্গোপসাগরের উৎসমুখ-নদীটির কাছাকাছি বসবাস করে দিনেদিনে বেড়ে উঠছে হাকিম ব্যোমকেশ রায়ের কিশোরপুত্র সাগর। তার একমাত্র সঙ্গী ও সখী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর সরকারী কর্মচারী পিতা হরনাথবাবু নোয়াখালি থেকে রাজশাহী বদলি হয়ে চলে গেলে লক্ষ্মীর বিচ্ছেদে কিশোর সাগর অনুভব করে জীবনের প্রথম রোমান্টিক বেদনা, এবং তারপর, মায়ের মৃত্যুতে তার হয় শূন্যতার উপলব্ধি। একসময়ে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয় সে। হোস্টেলের অচেনা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ প্রথমে পীড়া দিলেও পরে তা সয়ে আসে সহবাসিন্দা সত্যবানের সহায়তায়। জীবনের নতুন মধুর দিক উন্মোচিত হয় তারই সৌজন্যে, পত্রলেখার সঙ্গে পরিচয়ের পর। কিন্তু, ঢাকায় স্বক্রীত বাড়ি রয়েছে, এমন একজন অবসর প্রাপ্ত এস.ডি.ও-র একমাত্র সন্তান সাগরকে বিয়ের জালে বন্দী করার কূটচক্রান্ত আঁটে পত্রলেখা ও তার জননী। দুর্নামে, অপমানে জর্জরিত সাগরের মোহভঙ্গ ঘটে। এখানেই হয় তার প্রথম মৃত্যু, মানসিক মৃত্যু। এর পরের সাগর পরিবর্তিত।

ব্যর্থ-প্রত্যাশিত অপমানিত সাগর ফিরে আসে ঢাকায়, পিতার কাছে। পড়াশোনা শেষ না হতেই, বড়োকথা,বি.এ. পরীক্ষার মাত্র দু'মাস আগে,তার বাড়ি ফিরে আসায় বিস্মিত হলেও বিচক্ষণ পিতা তার মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে সমর্থ হন। কোনো প্রশ্ন না করে ছয়মাসের মধ্যে তার বিয়ের ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করেন তিনি। পেনশনভোগী পিতার ঢাকার ওয়ারির বাড়িতে, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এবং স্ত্রী মণিমালার সাহচর্যে জীবনপলাতক সাগরের দিন কাটে কর্মহীন আলস্যের মধ্যদিয়ে। বিয়ের চারমাস অতিবাহিত হবার পর, এক পর্যায়ে তার সম্বিত ফেরে মণিমালার কথায় এবং হঠাৎ পথে দেখা হয়ে যাওয়া কলেজ-জীবনের বন্ধু বিনোদের ভর্ৎসনায়। একঘেয়ে দাম্পত্য আয়েশী জীবন কাটাতে কাটাতে শরীর-মনে নেমে আসা স্থবিরতা থেকে মুক্তি পেতে তার নিজের কবিপ্রাণও সম্ভবত অস্থির হয়েছিল। একঘেয়েমিক্লান্ত এ জীবন থেকে মুক্তিপ্রত্যাশায় এবং কর্মলাভের উদ্দেশ্যে সে কলকাতায় যায় এবং সত্যবানকে খুঁজে বের করে। জানতে পারে— পতিতা নারী নির্মলার আনুকূল্যে তার জীবনযাত্রা নির্বাহ হচ্ছে। খুব শিগগিরই তারা একত্রে সংসার জীবনও শুরু করবে।

এখানে এসে সাগর তার জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। সারা দিনের কর্মশেষে ক্যালকাটা হোটেলের দোতলায়, নিভৃতকক্ষে চলে তার সাহিত্যসাধনা। এরই একপর্যায়ে, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে শৈশব-কৈশোরের সখী লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। লক্ষ্মী এখন অধ্যাপক মুকুলেশ সেনগুপ্তের স্ত্রী। মুকুলেশের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দুজনে প্রত্যাবর্তন করে তাদের বারো-তেরো বছর পূর্বের অতীতে। স্মৃতি রোমন্থনে কাটে তাদের দীর্ঘ সময়। কিন্তু লক্ষ্মীকে যে আবার চলে যেতে হবে স্বামীর সঙ্গে, তার নতুন কর্মস্থল এলাহাবাদে! অনেক রাত অবধি লক্ষ্মীর সঙ্গে কাটিয়ে সাগর ফিরে আসে তার হোটেলে। কাল খুব ভোরে লক্ষ্মী আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে। ছাদে পায়চারি করে করে বিনিদ্ররাত অতিবাহিত করে সাগর। ভোররাতে, কল্পনার চিত্তবিভ্রমে লক্ষ্মীকে দেখে দু'হাত বাড়িয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে রাস্তায়। হয়তো ফিরে পাওয়া অতীতলোকে অবস্থানের অভিলাষেই রোমান্টিক মানস তাকে প্ররোচিত করে এ আত্মহত্যায়। ঘুমপাড়ানি গান, কাকস্নান, সোনার শিকল, অবগাহন, সাড়া— এই পাঁচটি খণ্ডে বিন্যস্ত *সাড়া* উপন্যাসের সার-সংক্ষেপ এই।

সাড়া উপন্যাসের 'ঘুমপাড়ানি গান' অংশে— মা ও লক্ষ্মীকে ঘিরে কিশোর সাগরের নিরুপদ্রব জীবন, লক্ষ্মীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, মায়ের মৃত্যুতে সাগরের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি। 'কাকস্নানে' তার কলকাতার হোস্টেল জীবন, বন্ধুলাভ, বিকাশোন্মুখ কবি-প্রতিভার স্ফুরণ, পত্রলেখার প্রেমে জড়িয়ে নতুন জীবনানুভূতির আস্বাদলাভ। 'সোনার শিকল' অংশে— বিবাহিত সাগরের স্মৃতিচারণে রয়েছে— পত্রলেখা ও তার মায়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বিব্রত, অপদস্ত হয়ে তার কলকাতা ছেড়ে আসার কথা। রয়েছে তার বিবাহিত, অলস জীবন, মণিমালা ও বিনোদের কথায় নিজের লেখকজীবন সম্পর্কে তার সচেতন হওয়া ও কলকাতায় যাওয়া। তারপর 'অবগাহনে' কলকাতার জীবনে সত্যবান ও নির্মলার সঙ্গে একাত্মতা, কেরানীর কর্মগ্রহণ ও হোটেলের নিভৃত কক্ষে বসে সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট হওয়ার কথা আছে। *সাড়ায়* আছে —সংসার রচনার উদ্দেশ্যে নির্মলা ও সত্যবানের কলকাতা ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত, তিনজনে পথে বেরোলে প'র হঠাৎ লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া ও লক্ষ্মীর সঙ্গে অতীতের স্মৃতিচারণে রত হওয়ার বিষয়টি। তারপর হোটেলে ফিরে, সারারাত পায়চারী করে, ভোররাতে অলৌকিক দর্শন হয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাগরের আত্মহত্যা করা।

নিতান্তই ভীরু ও মুখচোরা স্বভাবের সাগর, অনেকটা বয়স পর্যন্ত তার পৃথিবী ছিল মায়ের গায়ের গন্ধে ভরা। প্রায় নিঃসঙ্গভাবেই সে বেড়ে উঠছিল, উইলিয়ম শেক্সপীয়রের গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে, তার রহস্য ভেদ করার স্বপ্ন রচনা করে করে। যতোদিন তা সম্ভব হয়নি নিজের চিন্তা ও অনুভূতিকে ছুটিয়ে বেড়িয়েছে সে কল্পনার বিচিত্র জগতে। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবার কথায় জননীনির্ভর কিশোর সাগর ভীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, মনে মনে প্রার্থনা করেছে সে যেন কখনো বড়ো না হয়। একদিকে জননী, অন্যদিকে লক্ষ্মী তাকে ভরিয়ে রেখেছিল পরম নির্ভরতায়। ঘুমে কিংবা জাগরণে নিজের মতো করে স্বপ্ন সাজিয়েছে সে তাদেরকে ঘিরে, কিন্তু সে স্বপ্ন স্থায়ী হয়নি। তারা সরে গেছে একে একে, সরে গেছে তার চেনা পরিবেশটুকুও। তখন থেকেই তার অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এক ধরনের নৈঃসঙ্গ্যবোধে। মাতৃকেন্দ্রিক নির্ভরতায় বেড়ে ওঠার ফলে সে হয়ে উঠেছিল এক পরনির্ভরশীল মানুষ। এই পরনির্ভরশীল স্বভাব তাকে বিব্রত করেছে কলকাতায় পড়তে যাওয়ার পর, কলেজ হোস্টেলে অবস্থানের প্রথম দিনটিতে। প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন কলকাতার যান ও জনস্রোতের মধ্যে নিজেকে তার একাকী আর অসহায় মনে হয়েছে। পরবর্তীকালে বন্ধুদের সঙ্গে মিশে গেলেও মাঝে মাঝেই তাকে টেনেছে প্রকৃতি ও পরিজনের পরম নির্ভরতাময় অতীতজীবন।

শৈশব থেকেই, কল্পনাবিলাস তার স্বভাবের একটি বড়ো লক্ষণ। এ বিলাসে তার বেদনার অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। লক্ষ্মীকে চড় মেরে ফেলে, তাকে বিদায় জানাতে স্টেশনে যেতে না পারায় 'নিজেকে যথাসম্ভব দুঃখী কল্পনা করিয়া নানারূপ বিলাস' করেছে সে। শৈশব-কৈশোর থেকে বিচিত্র বয়সের নারী— দেহধারী কিংবা কাল্পনিক— তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। অস্ফুট থেকে স্ফুটনোন্মুখ চেতনায়— প্রেমাবেগতীব্রতা থেকে আশাভঙ্গজনিত হতাশা, প্রাপ্তি, প্রাপ্তিজনিত ক্লান্তি থেকে ফের মুক্তজীবন পিপাসা— ইত্যাকার বিচিত্র অনুভূতিতে তার জীবন-মানসকে তারা আলোড়িত করেছে পর্যায়ে-পর্যায়ে। জননী-নির্ভরতা তাকে স্বাবলম্বী ও বাস্তববাদী পূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে দেয়নি। তার পরিবর্তে সে হয়ে উঠেছে দায়িত্বহীন এবং পলায়নপ্রবণ এক মানুষ।

কৈশোরে, সুতীব্র অথচ অবাঙ্‌মুখর অনুভবে তাকে প্লাবিত করেছে লক্ষ্মী। জননী ও লক্ষ্মী তার অনুভূতিতে একাত্ম হয়েছে কখনো কখনো। লক্ষ্মীর বিচ্ছেদে বিবশ সাগরকে সান্ত্বনারত মায়ের দিকে তাকিয়ে আনন্দবিস্ময়ে শিহরিত হয়েছে সে 'সেই দুইটি কালো চোখ (লক্ষ্মীর) তাহার চোখের উপর তেমনি মোহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে'। ১/১০৬ দুঃস্বপ্নপীড়িত সাগর ছাদে, মায়ের কাঁধের উপর মুখ রেখে তার চুলের সুগন্ধ অনুভব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জোয়ারের সময়ে স্ফীত জলরাশির শোভা দেখতে দেখতে পাশে দাঁড়ানো লক্ষ্মীর ল্যাভেন্ডারের ঠাণ্ডা মৃদু সুগন্ধে তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছে। যৌবনে পত্রলেখার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে মায়ের চেহারার সঙ্গে তাকে অভিন্ন মনে হয়েছে। বিবাহিত জীবনে, ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে জননীর অভাব অনুভূত হয়েছে তার।

কলকাতার যান ও জনবহুল রাস্তায় অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্মীর দেখা পেয়ে গেলে সে যেন পরম নির্ভরতাময় অতীতকেই ফিরে পেয়েছিল। একে আর হারাতে দেয়নি সে। পত্রলেখার মধ্যে প্রিয়া ও জননীকে কল্পনা করে ক্ষণিকের স্বর্গ রচনা করেছিল মাত্র। ভবানীপুরের দীপোজ্জ্বল দোতলা বাড়িটিতে এসে সে পরিচিত হয়েছিল এক পরম সুখকর অনুভূতির সঙ্গে, আবার এখানে বসেই সে লাভ করেছিল প্রতারণাময় এক ঘৃণিত দিকের পরিচয়। ফলে এখান থেকে আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রত্যাবর্তন করেছে তার নিজস্ব বৃত্তে। এ থেকে মূলত আর ফেরা হয়নি তার। সাগরের মর্মনিহিত রোমান্টিক কবিআত্মার স্বাভাবিক প্রেরণায় তার মধ্যে কাজ করেছে মৃত্যুর অনুভূতিঃ

> দিন ফুরাইয়া রাত্রি আসিল; একটি তারা ডুবিয়া আর একটি দেখা দিয়াছে। সাগরের মনে হয়, আর তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই, জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ সে জানিয়াছে, শুধু মৃত্যুই এখনও অনাবিষ্কৃত। ১/১৯১

Dhaka University Institutional Repository

তারদিকে তাকিয়ে মৃত্যুপ্রবণতার অস্ফুট লক্ষণ আবিষ্কার করেছিল লক্ষ্মীও। সাগরের এই মৃত্যুপ্রবণতার মূল নিহিত তার জীবনপলাতক স্বভাবের মধ্যে। শৈশব-কৈশোরের জননী-নির্ভরতার কারণে দায়িত্ববান পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারেনি সে। সত্যবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পরও তার মাথাধরায়, কোঁড়ার যন্ত্রণায়, কী জ্বরে কাতর অবস্থায় সহানুভূতিজ্ঞাপক কোনো কথা উচ্চারণ করেনি সে। সত্যবানের অসুস্থতা বেড়ে যাবার পর একদিন, পত্রলেখার সঙ্গে সিনেমায় যাবার আহ্বানে, প্রথমে ক্ষণিক দ্বিধায় দোলায়িত হলেও নিজের রোমান্টিক আবেগ-তাড়িত হৃদয়ের কাছে পরাজিত হতে সময় লাগেনি তার। পত্রলেখা ও তার জননীর চক্রান্তে অপমানিত ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং বাবা তাকে কোনো প্রশ্ন না করায় সে মনের মধ্যে আরাম অনুভব করেছে। বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি করেনি, কারণ— বাকি জীবন তার এই বাড়িতেই অতিবাহিত হবে। পত্রলেখার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতা-যাত্রার পূর্বে মণিমালার সঙ্গে, নিজের জনকের সঙ্গে শোভনসঙ্গতভাবে বিদায় নেবার দায়িত্বটুকু পালন করেনি সে। দায়িত্ব এড়ানো ছাড়াও পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার পরিবর্তে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তার স্বভাবের মধ্যে—

> তর্কের সম্ভাবনা দেখিলেই সে গায়ে পড়িয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া অন্যের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। ১/১৬৭

রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতা এবং অতি-সংবেদনশীলতা সাগরের নৈঃসঙ্গ্য চেতনার অন্যতম সৃষ্টি-উৎস। কল্পনাপ্রবণ, সংবেদনশীল ও আমিত্বশাসিত চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের কারণেই সে অন্য কোন মানুষের সঙ্গে নির্মাণ করতে পারেনি আন্তঃমানবিক সম্পর্ক।[১১] ফলে, বৈরী বাস্তবতায় ক্লান্ত এবং মূলত নিঃসঙ্গ সাগর শেষপর্যন্ত লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যেই লাভ করেছিল তার কল্পনা-বাসনার অমৃত-আস্বাদ। তার যৌবনের মানসগঠনকে বিশ্লেষণ করলে এর বিবর্তনের ধারাটিকে লক্ষ করা যায় এই রকম—স্বপ্ন-কল্পনা-স্বপ্নভঙ্গ, স্থবির তৃপ্তিময়তা-অতৃপ্ত অস্থিরতা এবং জীবনপলায়নের জন্যে অবশেষে মৃত্যুযাত্রা।[১২] লেখকের রোমান্টিক মানসধর্মের এক বিশেষ লক্ষণ আশ্রয় করেই এসেছে উপন্যাসের পরিণতি, সাগরের মৃত্যু। রোমান্টিসিজমের তিনটি বিশেষত্ব— সিনিসিজম, বিষণ্নতা এবং মৃত্যুকামনা। জীবনের শুরুতে লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিতি, লক্ষ্মীর সঙ্গে বিচ্ছেদে বেদনার অনুভূতি, মায়ের মৃত্যু ও শূন্যতার অনুভূতি— সবমিলিয়ে শৈশব-কৈশোরের নিঃসঙ্গতায় গড়ে ওঠা সাগরের জীবনমানসেই সূচিত হয়েছিল তার পরিণতির পূর্বাভাস। একাধিকবার স্বপ্নদৃশ্যে, পাহাড়শীর্ষে ব্যর্থ আরোহন-প্রয়াসের মধ্যদিয়ে লেখক সম্ভবত ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন বিশালতা-পরিব্যপ্ত মুক্তির ঊর্ধ্বলোকে তার উত্তরণের অভিলাষ ও অসামর্থ্য। বিবাহিত জীবনে, নিরলস সুখভোগ, দাম্পত্য একঘেয়েমি তাকে স্থবির করে দিলেও গ্রন্থের জগৎ তাকে মুক্তিও দিয়েছে।

হোস্টেলে নবাগত সাগরকে আপন করে নিতে, নিজে 'একটা বিশ্রী মাথাধরা'য় কষ্ট পেয়েও বন্ধুদের আনন্দের খোরাক জুগিয়ে সুখ পায় যে স্বল্পভাষী যুবকটি, নাম তার সত্যবান মিত্র। 'সত্যবান যেন একটা নিবিয়া-যাওয়া সূর্য, তাহার আলো নাই, তাপ নাই, কিন্তু আকর্ষণীশক্তি আছে'। তাই, হোস্টেলের সাতাশ নম্বর ঘরটিতে আড্ডা জমজমাট হয়ে ওঠে এই সত্যবানকে আশ্রয় করে। 'দুই-তিন ঘণ্টায় সে দুই তিনটি কথা বলে কিনা সন্দেহ' তবু সাগর-চরিত্রের বিবর্তনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার গুরুত্ব যথেষ্ট। তাছাড়া অচেনা ও অস্বস্তিকর কিংবা অসহায় ও বৈরী পরিস্থিতিতে সাগরের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে সে একাধিকবার। হোস্টেলের প্রথম দিনটিতে তার বইপত্র, বিছানা খুলে সাজিয়ে দিয়েছিল সে, আবার যাবার

Dhaka University Institutional Repository

দিনেও বিমূঢ় হয়েপড়া– তার জিনিসপত্র গুছিয়ে, এমনকি পকেটে টাকা পর্যন্ত রেখে দিয়ে সহায়তা করেছে সে-ই। পত্রলেখার খেয়ালি হৃদয়ে তার অবস্থিতির ধরন জানা যায় না, তবে পত্রলেখার প্রতি তার হৃদয়ানুভূতির ইঙ্গিত মেলে– ফোঁড়ার ব্যথা ও জ্বরসহ শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তার নামোল্লেখে মুখে 'লাবণ্যের আভা' খেলে যাওয়ায়। কিন্তু স্বভাব-নিভৃতে নিহিত নিস্পৃহ-ঔদাসীন্যের কারণে আকর্ষণীয়া এই তরুণীটিকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন রচনার লক্ষণ দেখা যায়নি তার মধ্যে। বরং তার অন্য এক জীবনবৃত্তের সন্ধান মেলে– তারই ভাষায় 'কুতকুতে' চোখ, 'চ্যাপটা' নাক, 'তামাটে' গাত্রবর্ণ, কথায় যার 'বাঙ্গালদিশি টান'– এমনি বিশেষত্বের অধিকারিণী, পতিতা নারী নির্মলাকে ঘিরে। সাগরের স্মৃতিচারণের মধ্যে এ সম্পর্কটির ব্যাখ্যা মেলে এইভাবে–

> সত্যবান পত্রলেখাকে গোড়া থেকেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই নির্মলাকে আশ্রয় করিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ১/১৫০

সত্যবানের নিস্পৃহ এবং উদাসীন স্বভাবের পরিচয় মেলে তার লেখা চিঠির বিশেষত্বে, যার মধ্যে 'তাহার নিজের কথা ছাড়া পৃথিবীর আর যাবতীয় কথাই থাকে।' সাগরের সঙ্গে পরবর্তীতে সাক্ষাৎ হলে তার স্বল্পভাষী স্বভাবে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বন্ধনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ যেমন নয়, তেমনি বন্ধনমুক্তির পিপাসাও তার মধ্যে লক্ষ করা যায়না। এম.এ. ডিগ্রীর প্রতি আকর্ষণহীন, বেকারত্বের প্রতি তোয়াক্কাহীন মনোভাবের পরিচয় রয়েছে তার কথায় ও আচরণেঃ 'নানা ঘাটের জল খেয়ে ঠিক করলাম, আর ঘাটে নেমেই কাজ নেই'। (১/১৮৩) স্কুল মাস্টারি, ফিরিঙ্গি হোটেলের স্টুঅর্ড, প্রাইভেট টিউশনি, ফের স্কুলমাস্টারি, কেরানিগিরি– এর কোনোটা স্বেচ্ছায়, কোনোটা সে বাধ্য হয়ে ছেড়েছে এবং কর্মপ্রাপ্তির জন্যে কোনো গরজ আর তার আছে বলে মনে হয় না, কারণ নির্মলা তার 'আজীবন আলসেমীর ব্যবস্থা করেছে'। চরিত্র-নিভৃতে এই নিস্পৃহ ঔদাস্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে তার একের পর এক চাকরি গ্রহণ ও ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে। বর্তমানে, সফল যুবক অধ্যাপক মুকুলেশের সংসারে নানান টুকটাক কাজকর্মে তাকে প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজন পড়ে, তাঁর নতুন কেনা ফিয়াট গাড়িতে চড়ে স্ত্রী যখন শপিং-এ বেরোন, তখন সঙ্গে থেকে তাকে সহযোগিতা করতে হয়। খুব একটা সরাসরি না হলেও প্রচলিত বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধযুক্তিকে সমর্থনের, কিংবা পুরোহিতের আনুকূল্যে সমাজসমর্থিত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার প্রতি ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাবের ইঙ্গিত রয়েছে তার কথাবার্তার ধরনের মধ্যে।

অন্ত্যজ সমাজস্তরবাসী মানুষের হতশ্রী জীবন ও পরিবেশের চিত্র বুদ্ধদেবের রচনায় দুর্লক্ষ হলেও সহনশীলতা ও ত্যাগের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে এখানকার নির্মলা চরিত্রটি। পতিতার পেশায় নিয়োজিত থাকলেও মর্মনিভৃতে রয়েছে তার শুদ্ধাচারী নারীর সংস্কার, তাই প্রয়োজনের তাগিদে তাকে যা করতে হচ্ছে, তাকে সে পাপ বলেই গণ্য করেছে। প্রত্যক্ষ পরিচয়সূত্রে সাগরের সঙ্গে সখ্য, তার জন্যে উৎকণ্ঠা, সমবেদনা অনুভব এবং সেবা ও মমতার ঐশ্বর্যে তার তুলনা সে নিজেই। শুদ্ধনারীর সংস্কার ও প্রেমে নিষ্ঠার কারণে তাকে শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী কিংবা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিয়ের মতো এক পবিত্র বন্ধনের প্রতি তার শ্রদ্ধা রয়েছে। পুরোহিতের মন্ত্র বিনা বিয়ে যে সিদ্ধ নয়, এ সংস্কারও তার মধ্যে বিদ্যমান। তাই, কোনো পুরোহিত গণিকার বিয়েতে মন্ত্র পড়াতে চাইবে না বলে সত্যবানকে নিয়ে তার বিবাহবিহীন একত্রবাসের সিদ্ধান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

> পুরুৎ ছাড়া যে বিয়ে হয়, তা কি বিয়ে? এমনিতে দু'জনে থাকি— সে আলাদা কথা। পাপ করেছি– বেশ, সংসার-সমাজের বাইরেই থাকবো। ... কিন্তু আইনের বুলি আউড়ে (রেজিস্ট্রি) বিয়েকে মুখ-ভ্যাংচানো সে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। সমাজ না মানি, সে এক রকম, তার প্রাশ্চিত্তি নিজেরাই করবো, কিন্তু ঈশ্বরকে অপমান করতে পারি না তো। ১/১৯৭

সত্যবানের ভাষায়—'বোকা মেয়ে নির্মলা, ওকে আমি যা বলি, তা-ই বিশ্বাস করে।' নির্মলা-চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে তার জীবনবাদিতা ও শুদ্ধজীবনে প্রত্যাবর্তন-পিপাসার মধ্যে। বাধ্য হয়ে যে জীবন যাপন করেছে, তার সবকিছু ত্যাগ করে সে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। এখানকার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছে, এমনকি, তার উক্তিতে জানা যায়— ফরমাশ দিয়ে শরীর গড়াতে পারলে তাকেও বদলাতো সে।

উপন্যাসে বিনোদ চরিত্রটির ভূমিকা স্বল্পকালীন হলেও এর গুরুত্ব রয়েছে। *কল্লোল*ধর্মের অন্তত একটি লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে তার উচ্চারণে। সাগর বিয়ে করেছে শুনে সে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, শুধু তাই নয়—'বিনোদের দেবতা উঁচু আকাশ হইতে ধুপ করিয়া শক্ত মাটির উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। পাংশু মুখে সে বলিল,— সত্যি? কেন এ-ভাবে নিজের জীবনের সর্বনাশ করলেন? ... বিবাহিত জীবনের সংকীর্ণতা—... আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সাগরবাবু, বিয়েটা আপনার সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে মারাত্মক হচ্ছে'। ১/১৬৭ জীবনপলাতক সাগরকে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে সে-ই। পরস্পর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিত্রিত, পত্রলেখার ড্রইংরুম-বিহারী চরিত্ররাও কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে নানাভাবে। কন্দর্পের 'কালোমুখের উপর কালো চোখ দুইটি হাসিতে জ্বলজ্বল, পৃথিবীতে আসিয়া অবধি সে যেন শুধু হাস্যাস্পদ দৃশ্যই দেখিয়া আসিতেছে, এমন কিছু ইহলোকে নাই, যাহা দেখিয়া তাহার হাসির উদ্রেক না হয়। (১/১৩২) পত্রলেখার ড্রইংরুমবিহারীদের একজন হলেও ভবিষ্যৎ-সাফল্যের ইঙ্গিত ছিল তার 'একজামিনের বছর'কে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে। 'বি.সি.এস-এ ফর্স্ট হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' হয়েছে, শুধু তাই নয় 'যে -মেয়েকে (পত্রলেখা) নিয়ে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে গেছে, আর কেউ এগিয়ে না এলেও অপরিসীম ঔদার্যে সে তাকে বিয়ে করেছে। পত্রলেখার বক্তব্যে— 'গণেশ ঘোষ, বিখ্যাত আর্টিস্ট' তার কণ্ঠস্বর নারীকণ্ঠ নিঃসৃত বলে মনে হয়েছে সাগরের কাছে। মুখের বর্ণ তার গৌর, ঘাড় পর্যন্ত আর্টিস্ট সুলভ কোঁকড়ানো চুল। নিজেকে, বিশেষ করে পত্রলেখার সামনে সুবিন্যস্ত রাখতে তার চেষ্টার অন্ত নেই। পরবর্তীকালের বিবেচনায় 'বোকাসোকা ভালো মানুষ' হিসেবেই তার স্মৃতিচারণ করেছে সাগর। পত্রলেখার মন পাওয়ার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত নেই, আবার তার সম্পর্কে সাগরের চোখ খুলে দিয়েছিল সে-ই। গণেশের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বিচার করে পরবর্তীকালে সাগরের মনে হয়েছে—

> গণেশ নিশ্চয়ই বিবাহের পরদিন থেকে পত্রলেখাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে এবং নানা উপায়ে কন্দর্পের মন জোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারা! ১/১৫০

সাগরের জীবনের প্রথম অধ্যায়টিকে প্রভাবিত করা এবং পরবর্তী অধ্যায়ে তার পরিণতি ঘনিয়ে তোলার সহায়ক চরিত্ররূপে লক্ষ্মী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের মধ্যে মণিমালা-চরিত্রটি স্পষ্টবিন্যস্ত এবং বাস্তবানুগ হয়ে ফুটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গণিকানারীর কথাবার্তা, আচরণ, তাদের জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন বুদ্ধদেব নির্মলা ও তার ঘরের বর্ণনায়—

> সারাটা ঘর একটা বিশ্রী গন্ধে ম-ম করছে, মেঝেতে কয়েকটা খালি মদের বোতল আর অনেকগুলো আধপোড়া সিগারেট গড়াগড়ি যাচ্ছে, এক পাশে একটা বাটিতে খানিকটা রান্না-করা মাংস, তার উপর মাছি বসেছে। ... [নির্মলার] চোখদুটো টকটকে লাল, কপালের শির উঁচু হ'য়ে উঠেছে,— চোখ কালি, আর মুখটা— মুখটা বিশ্রী। ১/১৩৯
>
> কালরাত্তিরে— কালরাত্তিরে অনেক বাবুরা এসেছিলেন— ঢের টাকা, ফেরাতে পারলুম না। দুটোর পর গেলো সবাই। বমি ক'রে ঘর-টর ভাসিয়ে— সে এক বিশ্রী কাণ্ড। নিজের হাতেই তো কাচাতে হ'লো সব! ১/১৮১

নগরকেন্দ্রিক মানুষের জীবনাচরণের অনুষঙ্গরূপে বুদ্ধদেবের অনেকগুলো উপন্যাসে এসেছে ড্রইংরুম মুখরিত আড্ডা ও যান্ত্রিক প্রেমবিলাস চিত্র। *সাড়া* উপন্যাসে পত্রলেখার বাড়ির পরিবেশে এর সন্ধান মেলে। অনুমান করা যায়— এইসব পরিবেশ সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে তাঁর একধরনের সমালোচনার মনোভাব। শিক্ষা, চিন্তা ও মননে অগ্রণী বলে সঙ্গতনিয়মেই অর্থনৈতিক সঙ্কটে আক্রান্ত ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিতদশা — এসবই মূলত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই মধ্যবিত্ত মানসচেতনারই অধিকারী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। অন্তঃসারশূন্য, আভিজাত্যের মুখোশপরা এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে মর্মবাসী ক্ষোভ ও আক্রোশকে তাই প্রায়ই তিনি প্রকাশ করেছেন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যদিয়ে। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাদের অগভীর বোধ ও চিন্তার উপস্থাপনও রয়েছে এই উপন্যাসের পরিসরেঃ

> গণেশ একবার চুলে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, আজকাল কবিতা লেখা একটা ফ্যাশন হ'য়ে উঠেছে।
>
> মুকুলেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিল, যা বলেছো। এ-সব কি আর কবিতা হচ্ছে ? ম্যাথু আর্নল্ড যা ব'লে গিয়েছেন—
>
> সাগর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোন সবের কথা বলছেন ?
>
> মুকুলেশ যেন একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিল, এই আজকালকার So-called সাহিত্যের কথা। এ নিয়েই এত জাঁক ! পোপ পড়েছ ? হ্যাজলিট- এর–
>
> —কিন্তু আপনি কি আজকালকার কিছু পড়েছেন ?
>
> — পড়তে হয় না হে, আমাদের পড়তে হয়না। কার যে কী দাম তা আমরা না-প'ড়েই বুঝি—
>
> গণেশের গলা দিয়া ইঁদুরের চীৎকারের মতোএকপ্রকার শব্দ বাহির হইল। ঐটাই হাসি— পড়বার মতো কিছু থাকলে তো! রবীন্দ্রনাথের মতো একটি লাইন এরা কেউ পারবে লিখতে ? —'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকির ঐ ডালে-ডালে'— আ-হা!
>
> মুকুলেশ বলিয়া উঠিল, এ আর তেমন কী ? ধরুন—'পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে—'

Dhaka University Institutional Repository

> মুকুলেশ আবেগসহকারে আবৃত্তি করিতেছিল, হঠাৎ পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল, গণেশ চট করিয়া পকেট থেকে আয়না-চিরুনি বাহির করিয়া চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইল, ত্রস্ত হাতে অন্য পকেট থেকে পাউডর-পফ বাহির করিয়া মুখে একটু ঘষিয়া লইল। পত্রলেখা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল,তখন গণেশ এক পোঁচ ফর্সা হইয়া গেছে। ১/১৩৫

পত্রলেখার মন জয় করার জন্যে তার অস্থিরচিত্ত স্বভাব ও আচরণকে 'এটা কিন্তু খাঁটি Artistic temperament- এর লক্ষণ' বলে তোয়াজ করেছে কেউ, কেউ চকলেট এনে উপহার দিয়েছে, গানের অজস্র প্রশংসা ঝরিয়েছে, আর একটি গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে কেউ। আর এইসব দেখেশুনে, পত্রলেখার প্রভাবে আচ্ছন্ন অভিভূত হয়েও সাগরের মনে হয়েছে—

> এখানেও সে [কন্দর্প] শুধু মজা দেখিতেই আসিয়াছে;— সে নিজে নির্লিপ্ত, হাসিতে হইবে বলিয়া একটা টিকিট কিনিয়া এই প্রহসন দেখিবার জন্য দর্শকদের চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছে মাত্র। ১/১৩৩

সাড়া উপন্যাসে ছাড়াও লেখকের এই প্রবণতার সন্ধান মেলে *সানন্দা, যবনিকা পতন, রডোডেনড্রনগুচ্ছ, অতনুমিত্র, সাবিত্রী সেন আর বুলু* ইত্যাদি রচনায়। উচ্চমধ্যবিত্ত অভিজাত সমাজের কৃত্রিম জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখক যেন একধরনের বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন।

আবার কলেজ-হোস্টেলের বাসিন্দা যুবকদের কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধদেবের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে তাঁর বর্ণনায় এবং পরবর্তীকালে এ সবকিছু নিয়ে সাগরের স্মৃতিচারণেঃ

> যথাসাধ্য উদরপূর্তি এবং যথাসম্ভব ঘর নোংরা করিয়া একে-একে সবাই নিজ-নিজ ঘরে চলিয়া গেল। ১/১১৮

> হাসাহাসি, তর্কবিতর্ক পুরামাত্রাতেই চলিতে থাকে। একবার চায়ের পালা শেষ হইলেই আবার স্টোভ জ্বলে; ... চায়ের সঙ্গে শক্ত পাঁউরুটি এবং নিজের ও পরস্পরের মস্তক চিবাইয়া-চিবাইয়া খাওয়া হয়। ১/১২৬

> কিন্তু উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে যেটুকু দেরি হয়, তাহার মধ্যে আলো নিবিয়া গেছে। অন্ধকারে হুড়াহুড়ি করিয়া সবাই গমনোদ্যত হয়, কেহ জুতা খুঁজিয়া পায় না, কেহ বা নিজের এক পাটি, অন্যের এক পাটি পরিয়া, কেহ বা খালি পায়েই বাহির হইয়া যায়। বিনোদ কোনো অখ্যাত কবির লাইন আওড়ায়, অন্ধকারে হারিয়ে গেছে আমার চটির পাটি। ১/১২৭

এই জীবন একদিন শেষ হয়, এর নানান ঘটনা ও চরিত্র স্মৃতি হয়ে উঠে সাগরকে নস্টালজিক বেদনায় আপ্লুত করে তোলে ঃ

> মিহির, ভোম্বল ইত্যাদি দলের আর সবাই কে যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কাহারও কোনো পাত্তা পাওয়ার উপায় নাই। অথচ, তখন মনে হইয়াছিল, হস্টেলের সাতাশ নম্বর ঘরটির আড্ডা কোনোকালেই ভাঙিবেনা। সময়ের ভোজবাজি এমন আশ্চর্য— ১/১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মনস্তাত্ত্বিক বিচারে কোনো কোনো চরিত্রকে, বিশেষ করে সাগর চরিত্রটিকে বিন্যস্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। নিজেকে নিজে কষ্ট দিয়ে মানসিক আরাম পেতে চাওয়া— মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে– মর্বকাম– কিশোর সাগর তা-ই পেতে চেয়েছে একাধিকবার। লক্ষ্মীকে চড় মেরে ফেলে 'সমস্তদিন সাগর নিশ্বাসের সঙ্গে বিষ টানিতে লাগিল'। বাবার সামনে চায়ের পেয়ালা ভেঙে ফেলে, বাবার সিগারেটের কৌটা জলে ফেলে দিতে চেয়ে কিংবা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কল্পনা করে— মার খেয়ে বাঁচতে চেয়েছে সে। লক্ষ্মীর অভিমান ভাঙলে প'র—

> জানিস লক্ষ্মী আমি ইচ্ছে ক'রেই প'ড়ে গিয়েছিলাম। ... নয়তো তুমিও তো আজ আসতে না লক্ষ্মী, আরো কয়েকদিন হয়তো রাগ ক'রে থাকতে। ১/৯৮

লক্ষ্মীকে বিদায় জানাতে স্টেশনে যেতে না পারায়, পরদিন সে দুপুর পর্যন্ত স্নানাহার না করে শুয়ে থাকলো। 'এই দুঃখের অনুভূতিতেই যেন লক্ষ্মীর বিরহ কানায়-কানায় ভরিয়া যাইবে'। এ ছাড়াও, সাগর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ দেখিয়েছেন লেখক—হোস্টেলে, প্রথম দিনে সত্যবানের প্রতি তার বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ মনোভাব কেমন করে অল্পে-অল্পে পরিবর্তিত হয়েছে, তার মাধ্যমে। সত্যবানের গায়েপড়া আচরণে ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা সাগরের প্রথমে ইচ্ছে করেছে— 'সবচেয়ে মোটা বইখানা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারে', তারপর তার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছেঃ

> দিব্যি কালো রং, অর্থাৎ কিনা বেশ কালো, মানে খুবই কালো। কিন্তু তৈল-মসৃণ উজ্জ্বল কালো নয়, মুখের মধ্যে কেমন একটা পাংশুতা আছে। মুখের চামড়ায় কয়েকটা বসন্তের দাগ এমনভাবে বসিয়া গেছে যে কালো রঙের মধ্যে তাহার মিশিয়াই আছে প্রায়। পাৎলা ঠোঁটের উপরে চোখা নাকটা ঝুলিয়া আছে, ১/১১৩

কিন্তু সত্যবান কর্তৃক তার বিছানা ও বইপত্র গুছিয়ে দেওয়া, নিজের রুমে চায়ের আসরে নিয়ে যাওয়া, হোস্টেল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে সহায়তা করায় তার মনের ভাব ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে উঠেছে। 'বিতৃষ্ণায় সাগরের গা রী-রী করিয়া উঠিল' থেকে সে দ্রুত পৌঁছে গেছে 'তার চেয়ে আসুন না দু'জনে একসঙ্গে (ক্লাশ) কামাই করি'—তে। মাঝখানের মানস-পরিবর্তনের পর্যায়ক্রমিকতা রক্ষা করেছেন লেখক ধারাবাহিক মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

> প্রথম কয়েকদিন কলকাতা ইট-সুরকি লোহা লক্কড়ের একটা প্রকাণ্ড পিণ্ড বই আর-কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন... কোন পরম সুখকর আঘাতে কলিকাতা তাহাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিতে চায়। ১/১১৯-২০

কখনো তার রোমান্টিক অনুভূতিতাড়িত হৃদয় অনুভব করে— যেন, কলকাতার 'আকাশ গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের ভারে নামিয়া আসিয়াছে'। একটি মেয়ে সাগরের কবিতা পড়ে তার সঙ্গে পরিচিত হতে উন্মুখ হয়ে আছে জেনে— 'সাগরের মনে লোভ ও লজ্জা সংগ্রাম করিতে লাগিল'। পরিচয়ের একমাস পর, সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এলে— 'সাগর ঘোষণা করিল যে সে যাইবে না'। কিছুক্ষণ প'র 'পত্রলেখার ললাটের উপর লুটাইয়া পড়া দুই একটি অলকগুচ্ছ' তার মনে পড়লো। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সেদিনই শুধু গেলনা, এর পরের এক রবিবারে আপনা থেকেই তার মনে হলো—

Dhaka University Institutional Repository

> এখন একবার পত্রলেখার কাছে গেলে কেমন হয় ? দিনের আলোয় সে তো তাহাকে কখনো দ্যাখে নাই। ... পনেরো মিনিট পরে কলেজ স্ট্রীটে সে একখানা বাস ধরিল। আরো মিনিট কুড়ি পরে রমেশ মিত্র রোডের মোড়ে নামিয়া সে বুঝিল, তাহার বুক ঢিপঢিপ করিতেছে। করুক। ১/১৩৪-৩৫

প্রথমদিন তার মনে হয়েছে— পত্রলেখার হাসিকে সে যেন মায়ের মুখে ফুটে উঠতে দেখেছে, দেখেছে আরব্য উপন্যাসের রাজকুমারী কি বাতায়ন-পার্শ্বে জুলিয়েটের ঠোঁটে। আজ অন্য কারো সঙ্গে না মিলিয়ে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে সে নিজে সৃষ্টি করে নিলো। পত্রলেখার প্রেমের জোয়ারে সাগর যখন ভাসছে, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে তার ধন্য হয়ে যাবার কথা—সেখানে তাকে জোর করে বাধ্য করানোর চেষ্টায়— যদিও তার 'চুম্বনের স্বাদ তাহার মুখে এখনো লাগিয়া আছে'— তবু, তার 'অন্তরাত্মা বিমুখ' হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে তার উপলব্ধ চেতনায় ধরা পড়েছে—

> সত্যবান পত্রলেখাকে গোড়া থেকেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই নির্মলাকে আশ্রয় করিয়া সে বাঁচিয়া গেল। সাগর ছিল শিশু, সেই জন্যই ... ১/১৫০

সাগরের অনুভূতির আলোকে মণিমালা-চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখক—

> সে যদি তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে চিঠিটা তুলিয়া দিত, তাহা হইলে কোনো গোলমালই বাধিত না, মণিমালা চিঠিটিকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিত। কিন্তু এই বাধাটুকু দিয়া সে চিঠিটার প্রতি যে প্রাধান্য আরোপ করিল, তাহাই মণিমালার মনে সন্দেহের সঞ্চার করিবে;— মণিমালা অভিমান করিবে, রুষ্ট হইবে, আহত হইবে— মোটকথা, চিঠিখানা না-দেখিয়া কিছুতেই ছাড়িবেনা। ১/১৫৭

উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে রয়েছে নানামাত্রিক ঈর্ষার লক্ষণ—

> পত্রলেখাকে অত অন্তরঙ্গভাবে সম্বোধন করিতে দেখিয়া সত্যবানের দিকে কেহই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে না- তাকাইয়া পারিল না। গণেশ ঠোঁটটা একটু বাঁকাইয়া প্যাসনেটা খুলিয়া আবার পরিয়া নিল, মুকুলেশ পাথরের মতো নিরেট দৃষ্টি দিয়া সত্যবানকে বিঁধিতে লাগিল, আর কন্দর্প চট করিয়া একবার তাকাইয়াই হাসিয়া ফেলিল। ১/১৩২

প্রতারণার ফাঁদে ফেলে পত্রলেখা ও তার জননী সাগরকে যেভাবে বিব্রত ও বিধ্বস্ত করেছিল, তার মহড়াটুকু পূর্বেই শুনতে পেয়েছিল গণেশ। সাগরের বিরুদ্ধে এক ঈর্ষামিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে তাদের বন্ধ দরোজায় সে কান পাতে এবং জননী ও তার কন্যার কথোপকথন শোনে। কিন্তু প্রথমেই সাগরকে সাবধান করে না দিয়ে ঘটনাটি ঘটে যাবার পর সে এসব কথা তাকে বলে—

> বলিয়া সে সুখ পাইয়াছিল, শুনিতে-শুনিতে সাগরের মুখ যে পর-পর শাদা আর লাল, লাল আর শাদা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সে ততোধিক সুখ পাইয়াছিল। ১/১৫১

গণেশের এই বলে দেওয়ার ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করলে এর নিভৃতে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত ঈর্ষাক্রান্ত মানসিকতার কথা জানা যায়। সত্যবানের চিঠি পড়ে পত্রলেখার কথা জানতে পেরে মণিমালার মনে একধরনের ঈর্ষাপূর্ণ অনুভূতি জেগেছে। এ ঈর্ষা ধরা পড়ে সাগরের সঙ্গে তার কথাবার্তার ধরন এবং আচরণের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

সাড়া উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসেছে অন্তত পাঁচবার। রবীন্দ্রভঙ্গি অনুকরণের ইঙ্গিত রয়েছে গণেশ ঘোষের আচরণেঃ

> গণেশ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের ধরনে হাতের মুঠি একবার খুলিয়া একবার বন্ধ করিয়া বলিল, ১/১৩২

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে অগভীর বোধ ও অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাঁর প্রতি অন্ধ ভক্তি প্রদর্শনের নমুনাঃ

> রবীন্দ্রনাথের মতো একটি লাইন এরা কেউ পারবে লিখতে ?— 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকির ঐ ডালে-ডালে' — আ-হা!
>
> মুকুলেশ বলিয়া উঠিল, এ আর তেমন কী ? ধরুন— 'পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে—' ১/১৩৫

স্ত্রী মণিমালার সঙ্গে তামাশা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যবহার করেছে সাগরঃ

> তুমি ন্যায়ত আমাকে নিশ্চয়ই বলতে পারো, কবিতা লিখে কী হয়, 'মিলিবে কি তাহে হস্তী-অশ্ব, না মিলে শস্য-কণা;' ১/১৬১

নিজের কলকাতায় যাবার সময়টিতে জীবনের চলার চিরন্তনতার সঙ্গে একাত্ম করতে মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছে সাগরঃ

> 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর'। মানে প্রায় দ্বিপ্রহর। এগারোটা পঞ্চাশে ট্রেন ছাড়ে। ১/১৭৩

কলকাতায় গিয়ে সাগরের সৃষ্টিশীল আবেগ তীব্র হয়ে উঠেছে এবং তার লেখার প্রবণতা ও গতি এতোটাই বেড়ে গেছে যে, তার চিন্তার মতো দ্রুত লিখতে পারছেনা বলে সে আফসোস করেছে। রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতার*—

> অমিত রায়কে ঠাট্টা করিয়া সে বলে, যদি ভাবাই দিলে, ঈশ্বর, তবে একজনকে এত বেশি দিলে কেন ? মাঝ-পথে অন্য কাউকে কিছু দিলেও তো পারতে— যেমন ধরো ঐ নিবারণ চক্রবর্তীকে। ১/১৯২

একদিকে বুদ্ধদেব বসুর কবিসত্তা, অন্যদিকে প্রেমচেতনা পাশাপাশি অবস্থান করে তাঁর ঔপন্যাসিক বিশেষত্ব স্পষ্ট করেছে। তবে এই প্রেমচেতনা শারীরধর্মকে কখনো গৌণ বিবেচনা করেনি। তিনি যে কালপ্রবণতার ফসল— তাতে করে নরনারীর প্লেটোনিক প্রেম নয়, বরং দেহকে ঘিরে 'প্রবৃত্তি কামনার যে আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণা ও গূঢ়চারী রহস্য'— তাকেই আশ্রয় করতে চেয়েছেন। দেহবাদ এবং দেহবাদিতাসূত্রে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে সেকালে নিন্দার ঝড় তোলা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। জীবনদৃষ্টির পার্থক্য সত্ত্বেও গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁকে ডি. এইচ. লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করেছেন যৌন ও কাব্যচেতনাগত সাদৃশ্যের জন্যে।[১২] তবু একথা সত্য যে, স্থূল দেহজবাসনাবন্দী নয় তাঁর দেহবাদ, কিংবা তা নিয়ে সরাসরি বর্ণনা ও বিশ্লেষণে যাননি তিনি। লরেন্সে যেখানে আদিম যৌনচেতনা প্রকট, বুদ্ধদেব তাকে কাব্যসুষমামণ্ডিত করে অপূর্ব মাধুর্যে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর কবিসত্তা ব্যঞ্জনাময় এক রসের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছে একে। আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গল্প 'রজনী হ'লো উতলা'য় রয়েছে এর পরিচয়, তাতে লরেন্স ছাড়াও অল্ডুস হাক্সলির (১৮৯৫-১৯৬৩) প্রভাব ছিল বর্তমান।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন— সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৬) এবং হ্যাভলক এলিসের (১৮৫৯-১৯৩৯) যৌনতা বিষয়ক মতবাদের দ্বারা। তবে সরাসরি যৌন চিত্রায়ণের অভিযোগ আনা চলেনা তাঁর বিরুদ্ধে। যৌনপ্রসঙ্গকে প্রায়ই আভাসে ইঙ্গিতে অথবা কাব্যময় ব্যঞ্জনায় শিল্পাবৃত করে পরিবেশন করেছেন তিনি। যেসব লক্ষণ-বিচারে বুদ্ধদেবকে দেহবাদী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে *সাড়ায়* তা একেবারেই অনুপস্থিত। অশ্লীল বিষয় কিংবা বিষয়ের ইঙ্গিতও মেলেনা এখানে। বরং আবেগশাসিত হৃদয়ধর্মের এক স্পষ্ট উচ্চারণ অনুভব করা যায় উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে। সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা সত্ত্বেও সাগর ও লক্ষ্মীর আকর্ষণের মূল দেহাতীত মাধুর্যের মধ্যে নিহিত। পূর্বেও লক্ষ করা গেছে— প্রেমে হৃদয়ধর্মের মহিমা তাকে পত্রলেখার দেহনির্ভর প্রেমের স্থূল আমন্ত্রণের ইঙ্গিত অতিক্রম করে স্নিগ্ধ শান্ত প্রেমের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মী ও তার স্মৃতিময় স্থানটিতে পরিভ্রমণ করিয়েছে মনে-মনে। দেহসম্পর্কহীন অকলঙ্ক প্রেমের শৈল্পিক রূপায়ণই *সাড়া* উপন্যাসের রচয়িতার লক্ষ্য। কাললগ্ন আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, হতাশা ও বিতৃষ্ণাময় জগতের বিপরীতে এক রোমান্টিক অনুভূতিময় ভাবজগৎ আবিষ্কারের শিল্পরূপ এই *সাড়া*।

উপন্যাসের কোথাও কোথাও প্রাসঙ্গিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের উপলব্ধিজাত বক্তব্য—

> সকল দোষের মধ্যে নির্বুদ্ধিতাই সবচেয়ে ক্ষমার যোগ্য নয় কি ? কেননা, ইচ্ছা করিয়া কেহ নির্বোধ হয় না, না-হইয়া পারেনা বলিয়াই হয়। ১/১৫১
>
> যে-মেয়েকে তুমি ভালোবাসো বলিয়া বিশ্বাস করো, সে যদি একদা সন্ধ্যাকালে হঠাৎ তোমার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ বাড়াইয়া আনে, তাহা হইলে তাহাকে চুম্বন না করাই বরং পাপ। ১/১৫২
>
> [সাগর] সমগ্র স্ত্রীজাতির—এমন একটা দিকের পরিচয় পাইয়াছে, অবিবাহিত অবস্থায় যাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ১/১৬১
>
> সুস্থ ও সুসম্পূর্ণ দেহের মতো এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য শা-জাহানের তাজমহলও নয়। অথচ, তাজমহল দেখিয়া কত কবিরই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মনুষ্য-দেহকে কোনো কবিই উপযুক্ত অভিনন্দন জানায় নাই, নবাবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রথম কবি ছাড়া। ১/১৬৩
>
> ঈশ্বরের উদ্দেশে সে অনেক সময় অনেক বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া লক্ষ-লক্ষ আকাশ ছাইয়া কেহ- একজন যে প্রতিটি মুহূর্ত জাগিয়া আছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই;— নহিলে এই সৃষ্টিকে ভালোবাসিবে কে ? আর এই সৃষ্টির মূলে যদি কোনো-একজনের প্রেম না-ই থাকিবে, তাহা হইলে এতকাল ইহা টিকিয়া আছে কী করিয়া ? প্রেম বিনিদ্র, কারণ প্রেমের দায়িত্ব এত মহান যে মুহূর্তের জন্য চোখ বুজিবার অবসর নাই, প্রেমের আনন্দ এমন নিদারুণ যে তাহা মুহূর্তের জন্যও ঘুমাইতে দেয় না। ১/২০৫

সাড়া উপন্যাসটি সাগরের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত। বর্ণনার ফাঁকে, লেখকের প্রকরণ পরিচর্যার মধ্যে চেতনাপ্রবাহরীতির আশ্রয় রয়েছে কোথাও-কোথাও।

Dhaka University Institutional Repository

> সাগর রায় ডুব দিল। জীবনের অতলস্পর্শ সমুদ্রের ফেনিল আলিঙ্গন তাহাকে লুফিয়া লইয়াছে। কাচের ঘরে মহার্ঘ অর্কিডের মতো দুর্লভ জীবনের অসাধারণ সুখ সে জানিয়াছে; এইবার ভাঙো, কাচের দেয়াল ভাঙিয়া ফেলো, ছায়ালোকের চির-গোধূলি রৌদ্রসম্পাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক, কবুতর-বুকের ধুকধুকানি আর সহিতে হইবে না— সংকোচ আতঙ্কে আশঙ্কায় আর প্রতিমুহূর্তে ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।
>
> বাঁচিয়া সুখ আছে।
>
> সাগরের দিনগুলি পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, রাত্রিগুলি গানের গুঞ্জনের মতো অলক্ষিত দ্রুততায় ফুরাইয়া যায়— একের পরে আর, অন্তহীন দিন-রাত্রির মিছিল। রোজ ভোরে ঘুম ভাঙা মাত্র সাগরের মনে হয়, আর-একটি দিন। রোজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাবে, কাল আর-এক দিন! যতদূর তাকাইতে পারে, ভবিষ্যতের শেষ সীমারেখা পর্যন্ত এই দিন-রাত্রি সারি-সারি দাঁড়াইয়া আছে—অন্তহীন, অন্তহীন।
>
> ...আপিশের আগে সে প্রায় তিনঘন্টা সময় পায়—পড়াশুনোর জন্য। এতদিনে সে সত্যই শেক্সপিয়র পড়িবে। ছেলেবেলায় সে যে-সচিত্র বইখানার মর্মোদ্ঘাটন করিবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িয়াছে, সকল রহস্যের চাবি তাহার হস্তগত হওয়া অবধি সেই বইখানার গায়ে ধুলা জমিতেছে। সেই ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া এক মৃত অতীতকে সে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায়— ১/১৮৯-১৯০

ভাষাশৈলীর বিশেষত্ব বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের আরেক অনন্যসাধারণ দিক। সাধুরীতির আশ্রয়ে রচিত হলেও *সাড়া* উপন্যাসের ভাষায় একটি সহজ চাল বর্তমান। তাঁর ভাষাশিল্পের বিশেষত্ব এই যে, বিষয়চ্যুত না হয়েও অপূর্ব এক কাব্যময়তাকে আশ্রয় করে তা রসশিল্পের রাজ্যে উন্নীত হয়েছে। তাঁর গদ্যভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম সাংকেতিক ব্যঞ্জনার আবহ লক্ষ করা যায়। এই কারণেই তাঁর ভাষা গতিময়। ভাষার কাব্যসুরভিত শব্দ-বাক্যের লীলাচাতুরি পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। শিল্পকৌশলকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বিষয়কে নিয়ে রসাবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। অনেক সময়ে বিষয়ের চেয়ে তাঁর বাগভঙ্গিই হয়েছে আকর্ষণীয়। আবার, বিষয় ও তার মর্মগত প্রাণধর্মকে আড়াল করে, এমন অসঙ্গত কাব্যময়তা নয়, বরং তাকে সহজে পরিস্ফুট করার সেই কৌশলটি বারবার প্রয়োগ করেছেন তিনি— যার নাম অলঙ্কার। পাণ্ডিত্যময় আড়ম্বরের পরিবর্তে নতুন ও আকর্ষণীয় ভাষারীতির অনুসন্ধান, চিত্রকল্পময়তা— সব মিলিয়ে অবারিত প্রবাহ তাঁর গদ্যশৈলীর এক বিশেষ ধর্ম। শিল্পসফলতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের ভাষা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইংরেজি বাক্যরীতির ঢঙ্ সত্ত্বেও শব্দের চয়ন, তার বিন্যাস ও ধ্বনিস্পন্দ পাঠকহৃদয়কে আকর্ষণ করে। ইংরেজি বাক্যবন্ধের অনুকরণে বাংলা বাক্য গঠন করেও তাকে নমনীয় করে তুলেছেন তিনি। মুখের ভাষার কাছাকাছি, অথচ তাঁর ভাষার পারিপাট্য অসাধারণ। কাব্যময় ব্যঞ্জনা এবং যতিচ্ছেদের প্রাচুর্য এর অন্যতম লক্ষণ। বুদ্ধদেবের গদ্যভাষায় ইংরেজিঘেঁষা শব্দ ও বাক্যরীতি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছেনঃ

> পড়তে পড়তে খটকা লেগেছে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি। মনে মনে ভাবছিলেম এখনকার যুবক-যুবতীরা সত্যই কি এমনতরো তর্জমাকরা কথাবার্ত্তা কয়ে থাকে? অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় তো আমি এতটা

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করিনি। কথাবার্তার এ রকম কৃত্রিম ঢংটাতে রসভঙ্গ হয় কেননা তাতে সমস্ত জিনিষটার সত্যতাকে দাগী করে দেয়। এই ত্রুটি সত্ত্বেও তোমার সমস্ত বইটার গৌরব আমি স্বীকার করতে পেরেছি।[১৩]

এ চিঠির উত্তরে বুদ্ধদেবও জানিয়েছেন–

আমার কাছে–প্রত্যেক আধুনিক বাঙালি লেখকের কাছে–কিন্তু বিশেষ করে' আমার কাছে আপনি দেবতার মত। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি। সে ভাষা আপনার পছন্দ হয়না। আমারই দুর্বলতা, অক্ষমতা। উৎস স্রোত স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ–আমি কি তাকে ঘোলাটে করে তুলি আমার বেসামাল ইংরিজি শিক্ষা দিয়ে? কিন্তু তর্ক করবো না; শুধু এই সুযোগ গ্রহণ করছি আপনাকে আমার অন্তরের গভীরতম ধন্যবাদ জানাবার–আপনি আমাকে ভাষা দিয়েছেন বলে। [১৪]

সমালোচক অচ্যুত গোস্বামীও বুদ্ধদেবের ভাষার উপর রবীন্দ্রপ্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫] তাঁর গদ্য সযত্নরচিত, সুমিত ও পরিচ্ছন্ন। সংক্ষিপ্ত বাক্যের পরিবর্তে মাঝেমধ্যে জটিলবাক্য ব্যবহারের পক্ষপাতী তিনি। 'এককথায় তাঁর (ভাষার) প্রধান বৈশিষ্ট্য– মেজাজে, পদান্বয়ে ও বাক্যরীতিতে ইংরেজী ভাষার নিকট আত্মীয়।'[১৬] উপন্যাসের গদ্যভাষায় বুদ্ধদেব এভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করেছেন। নানামাত্রিক বিচারে তাঁর অন্য উপন্যাসের মতো *সাড়ার* ভাষাগত শিল্পমূল্যও কম নয়। আর এ শিল্পমূল্য সাধিত হয়েছে তাঁর উপমা, চিত্রকল্প, সমাসোক্তি, অনুপ্রাস, শব্দচিত্র প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের অনন্যতায়।

উপমাঃ

ক. মাঘের সকালে সরস্বতী পূজারীরা যেমন জোর করিয়া চোখমুখ বুঁজিয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি নিজেকে একরকম ধাক্কা দিয়াই খাট হইতে নামাইয়া ফেলিল। ১/৮৯

খ. একটা চাদর টানিয়া দুইজনকেই তাহার মধ্যে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ভিজা পায়রার মতো কাঁপিতে লাগিল। ১/৯০

গ. সমস্তটা আকাশ একটা নীল পাথরের ছাদের মতো ধীরে-ধীরে তাহার মাথার উপর নামিয়া আসিতেছে। ১/১০৭

ঘ. পত্রলেখার ললাটের উপর লুটাইয়া-পড়া দুই-একটি অলকগুচ্ছ তাহার মনে পড়িল, আর বর্ষা-সমাগমে ভীরু কপোতের মতো তাহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। ১/১২৯

ঙ. সমুদ্র-গর্জনের মতো কলিকাতার অট্টরোলে সেই মৃদু কথাটি ঝড়ের মুখে হালকা একটি পাখির মতো কোথায় উড়িয়া যাইত। ১/১৪৪

চ. দুইসার রক্তবর্ণ আলোক-ভাণ্ড হইতে মুমূর্ষু গোধূলির শেষ শিখাটির মতো নিস্প্রভ আলোকের আবীর ঝরিয়া পড়িতেছে। ১/১৪৪

ছ. তাহার যে-ভবিষ্যৎ আকাশের মতো বিশাল, সূর্যালোকের মতো অজস্র হইয়া দেখা দিয়াছে, মণিমালা সেখানে একটি রঙিন পতঙ্গের মতো, একটি পাখির পালকের মতো উড়িতেছে মাত্র। ১/১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

উৎপ্রেক্ষাঃ

ক. প্রকাণ্ড দুইটি চোখ নিজেদের পরিপূর্ণতার ভার সহ্য করিতে না-পারিয়া প্রতি মুহূর্তে ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া টলমল করিতেছে— দুইটি নির্ঝরিণী চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া দুইটি হ্রদে পরিণত হইয়াছে, সেই হ্রদ দুইটি কূলে-কূলে কালো জলে টলমল করিতেছে— এই যেন ছাপাইয়া যাইবে ! ১/১০৩

খ. উত্তরে সে যাহা বলিল তাহার মধ্যে ভাবের পারম্পর্য বা ভাষার শৃঙ্খলা বিশেষ ছিল না, কিন্তু পত্রলেখা এমনভাবে শুনিল যেন বহুকাল বর্বরদ্বীপে আবদ্ধ থাকিবার পর এই সে প্রথম সভ্য মানুষের ভাষা শুনিতেছে। ১/১৩৭

গ. আলো জ্বালানো, কাগজ-কলম বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলি সে এমনভাবে সম্পন্ন করিল, যেন সে কোনো দেবমন্দিরের নৈবেদ্য সাজাইতেছে। ১/১৩৩

শব্দবাক্যের কুশলতায় বুদ্ধদেবের বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে চিত্রময় হয়ে উঠেছে।

ক. সেখানে অসীম তুষার প্রান্তর তার অসীম আকাশে ধু-ধু করিতেছে; আকাশে রৌদ্র ও বর্ষা একই সঙ্গে নামিয়াছে, আর রামধনু রঙিন টুকরা-টুকরা বরফ পাখির পালকের মতো হালকা হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া একটু জিরাইয়া নিতেছে। ১/৭৯

খ. ভাটার সময় নদীটা শিটাইয়া মরার মতো পড়িয়া থাকে, ওপরে সুপারি-নারিকেল-পল্লবিত কূলরেখা শ্যামল হইয়া ফুটিয়া ওঠে, পুবদিকে শান্তাসীতা দ্বীপের চোখমুখটা দেখা যায়, মাঝে-মাঝে অসংখ্য ছোটো-ছোটো চর মাথা চাড়াইয়া উঠিয়া পৃথিবীর আকাশ- বাতাসের সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয় করিয়া লয়। ১/৯০-৯১

গ. ট্রামের তারে-তারে, মোটরের চাকায়-চাকায়, মানুষের কণ্ঠে-কণ্ঠে কলিকাতা আকাশ-বিদারণ অট্টহাস্য করিয়া ফিরিতেছে, এক বর্বর যুবতী এইমাত্র নিজের যৌবন সম্বন্ধে সচেতন হইল; তাহার শিরায়-শিরায় উচ্ছলিত পশুশক্তির আদিম উল্লাসে সে আকাশকে কুচি-কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। ১/১২৩

ঘ. ছবির পর্দাটিকে আড়াল করিয়া দিয়া প্রকাণ্ড একটা নীলফুল তাহার চোখের উপর এই মুহূর্তে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, তাহার কোনো-কোনো পল্লবকে যেন লাল রঙে ডুবাইয়া নিয়াছে, দুই রঙের সম্মেলনে আরো কত রঙ্ জন্ম নিয়া রামধনু তরঙ্গের মতো সাগরের চোখে ঝলমল করিয়া উঠিল। ১/১৪৫

ঙ. এবার আর তুষার নয়, রুক্ষ কঙ্করাকীর্ণ ধূসর একটি পর্বত— চারিদিকে ভূমির তরঙ্গিত সমুদ্র আকাশের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। কোথাও একটু হরিতের চিহ্ন নাই;— মাটিতে ধূসর বালুতরঙ্গ, আকাশে দগ্ধ পাংশুতা... অকুরন্ত ভূমি আর অসীম আকাশের মাঝখানে পর্বতকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। ১/১৫৯

চ. কলকাতার মসৃণ ধূসর রাস্তাগুলির মুখে প্রভাতের হলুদ রৌদ্রালোক তখন সবেমাত্র প্রথম প্রলেপ মাখিয়া দিয়াছে। ১/১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

কখনো আবার এই চিত্রকল্প পাঠকের শ্রুতিচেতনাকে স্পর্শ করে—

ক. জনতার বিচিত্র বাকবিস্তারের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া ভিতরের বাজনার শব্দ কোনো আশ্চর্য ভাষার মতো সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে ছড়াইয়া পড়িল। ১/৮৭

খ. জলের ঝপাঝপ শব্দের সঙ্গে ইলেকট্রিক পাখার গুঞ্জন মিশিয়া একটি একঘেয়ে, মন্থর শব্দের মোহ বুনিয়া চলিয়াছে— সমস্ত স্টিমারে, নদীর জলে, আকাশের বিস্তারে দুপুরের অলস নিদ্রালুতা। ১/১৭৪

বুদ্ধদেবের রোমান্টিক কবিসত্তা কখনো আবার এখানকার গদ্যভাষায় সমাসোক্তি অলঙ্কার সৃজনে সহায়ক হয়েছে—

ক. তীব্র সুগন্ধ ক্রমানুক্রমিক সমুদ্রতরঙ্গের মতো সাগরের নিঃশ্বাস হরণ করিয়া লইবার উপক্রম করিল, ১/৯৮

খ. তাপদগ্ধ আকাশ আপনার চারিদিকে একখানি নীলিমক্লান্তি টানিয়া দিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণাকৃতি নদীটির আর তর সহিতেছে না, তাহার শীর্ণ তনুর সকল দারিদ্র্য অপসারিত করিয়া জোয়ারের জল কখন তাহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় সে ব্যাকুল। ১/১০২

গ. যে-মুহূর্তে রাস্তায়-রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়া ওঠে, ঠিক তাহারই আগের মুহূর্ত। কলিকাতা নিজের পরিপূর্ণতার ভার ঠিক এই মুহূর্তটিতে আর ধরিয়া রাখিতে পারেনা, নিজেকে টুকরা-টুকরা করিয়া সহস্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। এ যেন কোন যৌবনগর্বিতা অভিসারিকা সারা অঙ্গে মণিমুক্তা ঝলমলাইয়া, চুল এলো করিয়া দিয়া অজানা প্রিয়তমের সন্ধানে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে;— যাহার জন্য এত আয়োজন, তাহাকে না-পাইলে আকাশটাকে দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ১/১৪৩-৪৪

ঘ. আরো কিছুদিন কাটিলে দোতলার বারান্দার ইজি-চেয়ারটা সত্যই তাহাকে জড়বস্তুতে পরিণত করিত। ১/১৬৮

ঙ. সমুদ্রের মুখে মুখ রাখিয়া নূতন আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকাশের নিচে পড়িয়া থাক, লৌহময় কর্কশ চীৎকারে কলিকাতা তাহাকে ডাকিতেছে— সে ডাক উপেক্ষা করা অসম্ভব। ১/১৬৮

অনুপ্রাসনির্ভর ধ্বনিবিন্যাস লক্ষ করা যায় তাঁর কোনো কোনো বাক্যে—

ক. মুখের কাছে মুখ নিয়া নিঃশ্বাস-পাতের মতো নিঃশব্দে বলিল, ১/৯০

খ. আরামে আমার মনে মরচে ধ'রে যাচ্ছে। ১/১৭১

গ. শরীরে যার টোকা সয়না, তার আবার টাকা রোজগারের শখ কেন ? ১/১৮৪

ঘ. বুক টান ক'রে সটান হুজুরের কাছে হাজির হও গে— ১/১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. চাপরাশির রাশি দেখে ঘাবড়ে যেওনা। ১/১৮৬

চ. সাহেবরা বাসিমুখের চাইতে হাসিমুখ পছন্দ করেন। ১/১৮৬

এ ছাড়াও রয়েছে অনুপ্রাসযুক্ত কিছু কিছু শব্দ—

গানের গুঞ্জন, কবির নবিশী, কবুতর-বুকের ধুকধুকানি, সন্ধ্যার সঙ্গী, তুমুল তোলপাড়ের পর, ইঙ্গিতময় ঈষৎ হাসি, কটিতট, দারুনয় দৃঢ়কণ্ঠে, আইনের অণুবীক্ষণে, রোগারোগ্যের পরে, প্রকাণ্ডপিণ্ড, দীপোজ্জ্বল দোতলা বাড়ি প্রভৃতি।

কোথাও লক্ষ করা যায় ভাষায় লেখকের কারুকার্যময় বিন্যাস—

ক. এক অঞ্জলি জ্যোৎস্না মলিনার দেহে আসিয়া পড়িল। ১/৮১

খ. ব্যোমকেশ ততক্ষণে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল আবর্তে ডুবিয়া গিয়াছে। ১/৮৩

গ. মোমবাতির শিখায়-শিখায় এক প্রলুব্ধ চঞ্চলতা। ১/৮৭

ঘ. নির্ঝরিণীকে ছোটো-ছোটো শিলা দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা কেন আর! শিলার আঘাতে বাজিয়া-বাজিয়া স্রোতস্বিনী তো আরো নৃত্যময়ী হইয়া ওঠে, আরো কলভাষিণী। ১/১৩৪

ঙ. বইগুলির জন্য সে তেমন আরামের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, কিন্তু নিবিড় ব্যবহারে এই অনাদরের পূরণ হইতেছে। ১/১৭৫

চ. আজ এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় অতীত জল্পনার ক্লোরোফর্মে লুপ্তচেতন হইয়া বসিয়া থাকিতেই তাহার ভালো লাগিতেছিল। ১/১৫৬

ছ. অজস্র কথার শেফালিতে তাহার মন শুভ্র ও সুরভিত হইয়া ওঠে। ১/১৯১

কোথাও রয়েছে সাংকেতিক ব্যঞ্জনার বিন্যাস—

তারপর এদিক-ওদিক একবার চাহিয়া নিয়া ঃ

— শোনো—

নিশ্বাসের শব্দে একটি-দুটি কথা হইল, একটু চুড়ির শব্দ, অস্পষ্ট একটু দেহভঙ্গি! গাড়ি চলিয়া গেল। ১/১৪৬

কোনো ঘটনা বা চরিত্রের আচরণ বর্ণনা করার পরিবর্তে লেখক সৃষ্টি করেছেন এক আভাতমসার আবহ—

তারপর কি হইল, পরদিন সকালে সাগর নিজেও তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ করিতে পারে নাই। একখণ্ড সুনীল সুকোমল মেঘ তাহাকে বেষ্টন করিয়া মধুর সৌরভ বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার চারিদিকে যেন সহসা কোন নীল, নীল কুহেলিকা কী এক উন্মাদনার জাল বুনিয়া চলিয়াছিল;— এই পৃথিবীর মধ্যেই আর এক পৃথিবী— মদিরগন্ধ মেঘখণ্ড ভাঙিয়া-ভাঙিয়া তাহার দেহের সঙ্গে কণায়-কণায় মিশিয়া গিয়াছিল— আবেশে অভিভূত হইয়া শুধু মরিতেই বাকি ছিল তাহার। ১/১৪৫

শারীরিক বা মানসিক অনুভূতির বর্ণনায় রয়েছে লেখকের শিল্প-কুশলতার পরিচয়। অত্যধিক পরিশ্রমজনিত শারীরিক প্রতিক্রিয়া বোঝাতে—

Dhaka University Institutional Repository

ক. নিশ্বাস বায়ুর দুর্ভিক্ষে সে হাঁপাইয়া উঠিল। ১/৭৯

খ. তাহার শরীরের গাঁটগুলিকে কে যেন চিবাইয়া খাইতেছে। ১/৭৯

মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝাতে—

ক. লক্ষ্মীর কান দুইটা ঝা ঝা করিতে লাগিল, সমস্ত মুখ ভরিয়া প্রায় দুই মিনিট ধরিয়া অসংখ্য আলপিন ফুটিল তারপর সারাটা গলা বুজাইয়া দিয়া কী-যেন কতগুলি উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, মুখের মধ্যে নোনা স্বাদ পাইল, চোখ দুইটা ভিজিয়া আসিল, এবং ঠোঁট দুটি ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ১/৯৫-৯৬

খ. বুধবার হইতে সে আর লক্ষ্মীকে দেখিতে পাইবেনা, একথা সহসা মনে পড়িয়া গিয়া সাগরের বুকের কলকব্জাগুলি যেন মোচড় দিয়া উঠিল। ১/১০২

গ. ওই সুসজ্জিত ঘরের পরিমিত বায়ু তাহার নিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়; যে-কণ্ঠস্বরের অপরূপ ঘুম-পাড়ানি মদিরতা তাহার জীবনের প্রথম সান্ত্বনা, প্রথম শোক আনিয়াছে, সেই স্বর তাহাকে কানেও শুনিতে হইবে, অথচ নিতান্ত ভদ্রলোকের মতো সোফায় বসিয়া মৃদু আলাপ-গুঞ্জন করিতে হইবে, এ-ও কি সম্ভব! ১/১২৩

ঘ. রসনিপীড়িত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মতো তাহার মন নিজেকে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না— এখনই অসহ্য আনন্দে ফাটিয়া পড়িবে।

তাহার মনের মধ্যে অপরূপ কবিতা জন্ম নিতেছে, উন্মাদ যন্ত্রণায় তাহার হৃৎপিণ্ডটা মোচড় দিয়া উঠিল। ১/১৩৩

গূঢ় তাৎপর্যে বিন্যস্ত হয়েছে কোনো বাক্য—

উভয়েই [সাগর ও লক্ষ্মী] নিষ্কলুষ শৈশবের প্রগাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল,— এমন ঘুম তাহাদের জীবনে আর আসিবেনা, একথাটা তাহারা কেহই তখন বুঝিতে পারিল না। ১/৯০

কী কবিতায়, কী গদ্যে আঞ্চলিক, গ্রাম্যশব্দ ব্যবহারে বুদ্ধদেবের তেমন আগ্রহ লক্ষ করা না গেলেও সামান্য সময়ের জন্যে এখানে তা এসেছে প্রাসঙ্গিকতাকে আশ্রয় করে। যেমনঃ নিম্নস্তরবাসী গণিকা নারীর ভাষায়—

শখ দ্যাখো চাঁদের। এই পের্তুষে কেউ যেন ওঁর পিত্যেশি হ'য়ে ব'সে আছে! এ-দোকান সকালে খোলা থাকে না গো— শুনছো!— সেই রাত হ'লে এসো।

... যাও বাবু, স্বচক্ষে পেরতক্ষ ক'রে 'সো। ১/১৮০

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের কথোপকথনে ইংরেজি শব্দওবাক্যের ব্যবহার করেছেন লেখক। উপন্যাসে আঠাশটি ইংরেজি শব্দ, তিনটি ইংরেজি পূর্ণ বাক্য রয়েছে। নায়ক সাগর ইংরেজিতে দু'টি কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করেছে। তাছাড়া, সাগরের আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে তার ভাবকল্পনায় যা ধরা পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে তার রোমান্টিক অনুভূতি-তাড়িত হৃদয়ের আবেগ-প্রাবল্য। বুদ্ধদেব তার বর্ণনায় নির্মাণ করেছেন এক আলোআঁধারময় আবহ—

Dhaka University Institutional Repository

সাগর দুইহাত বাড়াইয়া দিতেই সমস্ত আকাশ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; তাহার শরীরে রাত্রির স্পর্শ, তাহার চেতনায় বিশ্বের চুম্বন; হাওয়ার উন্মত্ততা তাহার রক্তে, তারার আবর্তন হৃৎপিণ্ডে। ঐ চুল তো আকাশের অন্ধকার, ঐ শাদা শাড়ি তো ছায়া পথ— আর সে, সে-ই তো ঐ আকাশ, এই রাত্রি, আর বাতাসের এই উদ্দামতা। চিন্তা তার রুদ্ধ, সত্তা লুপ্ত—অন্তহীন মুহূর্ত, চিরন্তন জীবন। এই উন্মাদ বিশ্ব-বিদারণ যাত্রার কি শেষ নাই, কখনও শেষ নাই, কোনোখানে সীমা নাই ?

কিন্তু শেষ আছে, সীমা আছে, আশ্রয় আছে হ্যারিসন রোডের ফুটপাতের পাথরে। ১/২০৫

সাড়া উপন্যাস প্রসঙ্গে বলা যায় বুদ্ধদেবের জীবন-অভিজ্ঞতার লক্ষণ প্রায়ই আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট। কথাবস্তুর চেয়ে কথনশিল্পের প্রতি গুরুত্বদান এবং কবিপ্রাণের আবেগ এর মূলে ক্রিয়াশীল। এরই ফলে উপন্যাসের প্রত্যাশিত দৃঢ়সংহত বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর ঘনত্ব বা জটিলতাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাক্যব্যঞ্জনা ও বাগবৈভবের অতিরেক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জটিল মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনাময় ইঙ্গিতগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। রোমান্টিক আতিশয্যের কারণে উপন্যাসটি বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। সমকালীন সমস্যা-সংকট ও তাৎপর্যকে আড়াল করে তুলেছে তাঁর বিষণ্ণপ্রেম ও কামনার সর্বব্যাপিতা। অবশ্য, আবেগময়তার কারণে জীবনবোধ আচ্ছন্ন হলেও জীবনকে উপেক্ষা করেননি তিনি। আর, সে জীবন অবশ্যই শিল্পিত এবং এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে ঔপন্যাসিকের জীবন চেতনা। মনে হয়, জীবন বলতে তিনি যেন প্রেমকেই বুঝেছেন ও বুঝিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সর্বত্র নায়ক-নায়িকার জীবন ঘিরে প্রেমের সৌরভ, স্বপ্নাবেশ–বেদনাকে বিচিত্র রঙে ও রসে রূপায়িত করেছেন। *যেদিন ফুটলো কমল*, *অসূর্যম্পশ্যা*, *বাসরঘর*, *সূর্যমুখী* প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের জীবনচেতনা এই সূক্ষ্ম কাব্যময় প্রেমচেতনার মাধ্যমেই পরিস্ফুট। তাঁর প্রথম উপন্যাস *সাড়া* এর ব্যতিক্রম নয়। তবে, *সাড়া* উপন্যাসে কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়না। যেমন, 'পত্রলেখা পুষ্পকে ঘিরিয়া যে-কয়টি ভ্রমর গুঞ্জন তুলিয়াছিল', তাদের মধ্যে সাগর এবং অধ্যাপক মুকুলেশও ছিল। সাগরের প্রতি মুকুলেশের কথাবার্তা ও ঈর্ষান্বিত আচরণের ধরনে তাদের মধ্যেকার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি ঠিক ধরা পড়ে না। আবার, পত্রলেখার পাণিপ্রার্থী সচ্ছল-যুবকের ভিড়ে তার ড্রইংরুম যখন জমজমাট, সাগরও তার প্রতি নিবিড়ভাবে অনুরক্ত, তখন তাকে এবং তার জননীকে কেন সাগরকে বিয়ের জালে বন্দী করার জন্যে হীনচক্রান্তের আশ্রয় নিতে হয়েছে—তা বোঝা যায়না। সাগরকে লেখা চিঠিতে তার আকস্মিক অন্তর্ধানের কথা উল্লেখ করেছে সত্যবান। কিন্তু সাগরের অন্তর্ধান আকস্মিক ছিল না। প্রতারিত, অপমানিত সাগর কয়দিন যাবৎ 'রুগ্ন-পশুর মতো সত্যবানের বিছানায়' পড়ে থেকেছে। শেষে, সত্যবানই তাকে বাড়ি চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। ট্রেনের টিকিট কেটে এনে, তার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে, এমনকি তার পকেটে কিছু টাকা পর্যন্ত রেখে দিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। বিনোদ তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছে। তাছাড়া, সত্যবান আরও লিখেছে যে, 'ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে পৃথিবীটাকে চাখিয়া লইতেছে'— অথচ দেখা গেছে, পৃথিবীর স্বাদ চাখতে কলকাতা ছেড়ে সে কোথাও যায়নি। কলকাতায় নির্মলার আশ্রয়ে বসেই বিভিন্ন চাকরি নিয়েছে এবং ছেড়েছে। শেষে চাকরির চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মুকুলেশের সংসারে বেগার খাটতে আগ্রহী হয়েছে। শুদ্ধজীবনে প্রত্যাবর্তন-অভিলাষী নির্মলা তার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সব জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছে, শুধু তাই নয়— ফরমাশ দিয়ে শরীর গড়াতে পারলে সে নাকি তাও বদলাতো। অথচ, বসবাসের জন্যে বাড়ি কিনেছে সে এই গণিকাবৃত্তির টাকায়, এতে তার বিবেক আক্রান্ত হচ্ছে না। মুকুলেশের স্ত্রী-রূপিনী

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্মীকে প্রায় বারোতেরো বছর পর রাস্তায়, দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছে সাগর। অথচ সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে, কৈশোর থেকে পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ দুজনেরই অবয়বগত পরিবর্তন ঘটে যাবার কথা তখন। লক্ষ্মীর সঙ্গে এ দেখা হবার পূর্বে, তার হোটেলের কক্ষে বসে-বসে কল্পনায় একটি ছবি দেখেছে সাগর। এ ছবিটি কোনো বই থেকে, কিংবা ভোরের দিকে দেখা স্বপ্ন থেকে পাওয়া– তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনা সে। 'কিন্তু ছবিটি স্পষ্ট– রেখাগুলি দৃঢ়, রং মৃদু– রুপালি-ধুসর।' ছবিটি একটি মেয়ের, তার 'পরনে শাদা—বিধবার শাদা নয়, বধূর। কপালে ছোটো একটি কাটা দাগ। চুল এলো'। তার সঙ্গে বসে মেয়েটি 'In a Gondola' পড়ে। 'আলাদিনের প্রদীপ ঘষিলেই যেমন দৈত্যের উদয়, তেমনি চোখ বুজিলেই এই দৃশ্যের আবির্ভাব রোজ একরকম– একচুল এদিক-ওদিক নয়'। লক্ষ্মীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার পর লক্ষ্মীর কপালের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করেছে–

> তোমার ও দাগটা কিসের লক্ষ্মী ?
> —চুরি ক'রে লেমনেড খেতে গিয়ে ঐটি অর্জন করেছি। পাপের ছাপ।
> ...
> —তাই! ওটা তখন ছিলো না।

আবার,

> — তোমার এ-শাড়িটা ভারি সুন্দর।
> ...
> —কী চমৎকার শাদা! আমার মা-র ও-রকম একটা ছিলো।

সাগরের কল্পনার মেয়েটির সঙ্গে লক্ষ্মীর এতোগুলো বিষয় মিলে যাওয়া স্বাভাবিক মনে হয়না।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে *সাড়া* বুদ্ধদেবের সূচনাপর্ব মাত্র। কিন্তু সূচনা হলেও এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ *সাড়ায়* লেখকের ঔপন্যাসিক বিশেষত্ব পরিস্ফুট। তিনি নিজেও বলেছেনঃ

> এ-কথাও সত্য যে, মানুষের মৌল প্রকৃতির বদল হয় না, অন্তবর্তী তিরিশ বছরে আমার রচনায় যে-মানসতার বিবর্তন ঘটেছে তার অঙ্কুরোদ্গম 'সাড়া'তে লক্ষণীয় নয় তা নয়। সাগরের ভাবুক স্বভাব আমার উপন্যাসের নায়কদের কুললক্ষণ; তার শৈশবজীবন ও নগরপ্রীতি আমার পরবর্তী রচনায় বার-বার হানা দিয়েছে; প্রেমের চরম সার্থকতা যে দুঃখেই এই ধারণা আমি এখনো কাটাতে পারিনি। ... কিন্তু 'সাড়া' ভরপুর হ'য়ে আছে সেই কালের স্বাদে ও গন্ধে, যাকে সম্প্রতি 'কল্লোল'যুগ বলা হচ্ছে– তাঁর কাঁচা সবুজ ছেলেমানুষিটুকুও এতে বিদ্যমান–[১৭]

অর্থাৎ *কল্লোলের* যে লক্ষণগুলো বুদ্ধদেব লালন করেছেন তাঁর সত্তায় ও সৃষ্টিতে তা পরিস্ফুট হয়েছিল তাঁর কথাসাহিত্যজীবনের শুরুতেই। *কল্লোল*-প্রবণতার নিরিখে বিচার করলে তাঁর *সাড়া* এবং আরো অনেকগুলো উপন্যাসের মধ্যে স্বভাবধর্মগত সাযুজ্য লক্ষ করা যাবে। বুদ্ধদেব বসুর রচনায়, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে যেসমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট– তা হলো নায়করা প্রায়ই তরুণ কবি বা কথাসাহিত্যিক, সাহিত্যনিমগ্ন পাঠক বা অধ্যাপক। নিজস্ব ভাবনাচিন্তার জগতে তাদের বসবাস। তারা প্রায়ই নিঃসঙ্গ। নায়িকাদের মধ্যেও প্রায়ই এরকম লক্ষণ ধরা পড়ে। নায়ক-নায়িকারা মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, কখনো আবার হৃদয়বৃত্তির রিক্ততার কারণে এদের জীবন জুড়ে শুধু শূন্যতা। প্রেমের অন্বেষণ

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেবের গল্প বা উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কখনো ব্যঙ্গ, কখনো সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা, কখনো আবার রোমান্টিক স্বপ্নজগৎ গড়ে তুলে প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবনের আশ্রয় সন্ধান করেছেন তিনি। 'এই ভাবেই বুদ্ধদেবের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় 'সামাজিক' ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ-প্রবণতা এবং আত্মমুখী নির্জন স্বপ্নাতুরতা– এই দুই তথাকথিত 'স্ববিরোধী' প্রবণতা বিস্ময়করভাবে সহাবস্থান করেছে চিরদিন'।[১৮] প্রেমেরই জাগরণ, বিস্তার, আনন্দস্বাদ কখনো তাঁর উপন্যাসের বিষয়, কখনোবা প্রেমের অভাব, স্মৃতিতাড়না বা বিকারও হয়ে উঠেছে বিষয়।[১৯]

সহজ সাধারণ প্লট-আশ্রয়ী তাঁর উপন্যাস। চরিত্রের সংখ্যাও তাতে কম। 'আধুনিক জীবনের একাকিত্ববোধ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, বা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সৌন্দর্যময় ছবি, কখনো-কখনো পার্থিব সম্পদে ধনী কিন্তু মনের সম্পদে কাঙাল, আপাতসুখী সমাজের শূন্যতার বোধ– এইসব অনুভূতিমালা নিয়েই গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের উপন্যাসের জগৎ'।[২০] নগরজীবন সংক্রান্ত জটিলতা, শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিময়তা, মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিকসংকট, তার বিচিত্র হৃদয়ানুভূতির জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের শৈল্পিক রূপায়ণ তাঁর রচনা। তাঁর উপন্যাসের যারা নায়ক তাদের প্রায় সবার মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তি বুদ্ধদেবের প্রতিফলন। নগরসভ্যতা লালিত, কল্পনাপ্রবণ, কবি, শিল্পী, কৃতী ও সাহিত্যের ছাত্র তারা। প্রতিষ্ঠিত জীবনাচরণে প্রায়ই অনাগ্রহী। আত্মমুখিতা ও রোমান্টিক বিষণ্ণতা তাদের চরিত্রের সাধারণ ধর্ম। তাদের চিন্তা এবং কথাবার্তার যা বিষয়– তা যেন স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই কণ্ঠ নিঃসৃত। তারা বিচরণ করেছে নিজস্ব নিঃসঙ্গতার বৃত্তে। এ নিঃসঙ্গতার মূল সমকালীন জীবনযাত্রা ও চিন্তার মধ্যে নিহিত। জীবনসমস্যার টানাপোড়েনে অস্থির হওয়ার চেয়ে আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্নময়তার মধ্যে বিচরণ করতেই তারা বেশি আগ্রহী। *সাড়া*র নায়কের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে পূর্ববাংলার এক শান্ত নিভৃত অঞ্চল–নোয়াখালিতে, তারপরে কলকাতার নগরজীবনে ও অল্পসময়ের ব্যবধানে সে আবার প্রত্যাবর্তন করেছে পূর্ব বাংলারই শ্যামল মাটি ঢাকায়। অবশ্য, কাহিনীর শেষ পর্যায়ে কবিযশ প্রাপ্তির নামে মূলত মানসবিচ্ছিন্নতার কারণে সে আবার নগরজীবনে চলে গেছে। মৃত্যুপূর্বের কয়েকটি মাস তার সেখানেই কেটেছে। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ নায়কের মধ্যে পূর্ববাংলাপ্রীতির লক্ষণ বর্তমান। রোমান্টিক শিল্পিমানস যখন প্রত্যাশিত স্বপ্নকল্পনার বিপরীত, ঘোর বাস্তবতার পীড়ন অনুভব করে এবং এথেকে অব্যাহতি পেতে চায়, তখন সে আপাত মুক্তিলাভে পলায়নপ্রবণ হয়। এ পলায়ন ঘটে তার মর্মবিবরে, অথবা সুখস্মৃতিরঞ্জিত স্বস্তিময় অতীতলোকে। বুদ্ধদেব সমকালীন বিপর্যস্ত বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে একাধারে সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর নিভৃত কল্পনার শিল্পিত জীবনচিত্র। তাঁর চরিত্রদের নগরজীবন-কেন্দ্রিক সূক্ষ্ম পরিশীলিত অন্তর্জীবনও এতে প্রাধান্য পেয়েছে। বুদ্ধদেবের নায়কদের এই নগরজীবন পলায়ন যেন যুগলগ্ন বৈরীবাস্তবতা থেকে স্বয়ং লেখকেরই মানসপ্রত্যাবর্তন। প্রথম উপন্যাস *সাড়া* থেকেই এই প্রবণতার সূচনা। নায়ক ছাড়াও অন্যচরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায় এই স্বভাবধর্ম। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে কৌতূহল এবং আলোচনাই তাদের প্রিয়। *সাড়া*, *যেদিন ফুটলো কমল*, *বাসর ঘর* প্রভৃতি উপন্যাসে রয়েছে এই সব লক্ষণের পরিচয়। এই আত্মমগ্নতার লক্ষণ উপলব্ধি করে তাঁর রচনাকে আত্মস্মৃতি বা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেছেন সুকুমার সেন,[২১] অচ্যুত গোস্বামী[২২] প্রমুখ সমালোচক। বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে তাঁর ছেলেবেলার অনেক টুকরো কথা ছড়িয়ে রয়েছে এবং ... 'সেই ভগ্নাংশগুলিতে আত্মজৈবনিক যাথার্থ্য নেই বলা যায়না' বলে তিনি নিজেও উল্লেখ করেছেন।[২৩] তাঁর *সাড়া* উপন্যাসেই বোধহয় ব্যক্তি বুদ্ধদেবের প্রক্ষেপ সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। তাই *সাড়া*র

Dhaka University Institutional Repository

নায়কের কিশোরকালের বর্ণনাকে তাঁর আত্মজীবনী মনে হওয়া বিচিত্র নয়। লোকজনের মাঝখানে থেকেও, শৈশব থেকেই মনের মধ্যে বুদ্ধদেব ছিলেন এক নিঃসঙ্গ মানুষ।

> ক) আমাদের পরিবারে স্থায়ী সদস্য ছিলো চারজনঃ আমি, দাদামশাই-দিদিমা, আর তাঁদের এক বৃদ্ধা বিধবা আত্মীয়া। কিন্তু আমার ছেলেবেলার অনেকটা অংশ কেটেছে এক বৃহৎ যৌথ পরিবারের মধ্যে, নানাদিক থেকে সম্পৃক্ত নানাবয়সের মামা মাসি দাদু দিদিমার সংসর্গে। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো, কিন্তু যৌথ পরিবারের ভোজননির্ভর জটিলানুখর আলস্যাশ্রিত আমোদ-প্রমোদে আমি যোগ দিতে পারতাম না— আমার দিন কাটতো নিরিবিলি, আপন মনে, অধিকাংশ সময় শব্দহীনভাবে ব্যাপৃত। *আমার ছেলেবেলা* ৩/৪৯৫

সাগরের শৈশব-কৈশোরের মানসজীবনও এমনি নৈঃসঙ্গ্য দিয়ে ঘেরা।

খ) বুদ্ধদেবের উপর তাঁর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহের প্রভাব ছিল কার্যকর, আর সাগরের জীবনের নিভৃতে ছিল তার মা ও লক্ষ্মীর প্রভাব। দুজনেই মাতৃহীন, তফাৎ এই, বুদ্ধদেব তাঁর মায়ের কথা মনে করতে পারতেন না, মনে করতে চাইতেনও না।[২৪] সাগর বড়ো হয়েও মায়ের অভাব অনুভব করেছে।

গ) অল্পবয়সে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়নি বলে বুদ্ধদেব মনে মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তাঁর দাদামশাইকে। একই কারণে *সাড়া* উপন্যাসের সাগর হাতজোড় ক'রে ধন্যবাদ জানিয়েছে ঈশ্বরকে।

ঘ) বুদ্ধদেবের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে নোয়াখালিতে। নোয়াখালি থেকে পরে গেছেন ঢাকায় এবং তারপরে কলকাতায়। *সাড়া*র নায়কেরও তাই।

ঙ) শান্তা-সীতা নদীতে জোয়ার আসার যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক তাঁর *আমার ছেলেবেলায়*, ঠিক তারই সন্ধান মেলে *সাড়া* উপন্যাসের প্রথম অংশে। উভয়টির মধ্যেকার বর্ণনা-সাযুজ্য লক্ষ করার মতো।

> প্রতিবছর ভাদ্রমাসের অমাবস্যায়, মধ্যাহ্নের কোনো-এক লগ্নে সমুদ্র থেকে বান আসে নদীতে— স্থানীয় ভাষায় বলে 'শর'। ঘরে-ঘরে সেদিন সকাল থেকে চাঞ্চল্য, একটা উৎসবের ভাব। আমার যতদূর মনে পড়ে, স্কুলগুলোতে ছুটি থাকতো কিছুক্ষণ, কাচারি-আদালতেও কাজকর্ম স্থগিত— সেই সময়টুকুর জন্য সকলেই সেদিন নদীর ধারে, অন্তঃপুরিকা মহিলারাও ভালো কাপড় প'রে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসেছেন। যতদূর মনে পড়ে, দিনটি থাকতো প্রতিবছরই রৌদ্রোজ্জ্বল। আমরা দাঁড়িয়ে আছি পূর্বদিগন্তে তাকিয়ে — শান্তা-সীতার মোহানার দিকে— যেখানে ম্লান-সবুজ বনরেখার পরে মস্ত একটা দুয়ার যেন খুলে গেছে, আকাশ নুয়ে পড়েছে জলের উপর— তাকিয়ে আছি সেই ঝাপসা-ধোঁয়াটে অগ্নিকোণের দিকে, যেখান থেকে অগ্নিবর্ণ সূর্যের উদয় শীতের ভোরে অনেকবার আমি দেখেছি, আর যেখান থেকে, একটু পরেই, যে-কোনো মুহূর্তে, সমুদ্রের ঢেউ ছুটে আসবে আমাদের চোখের সামনে। ঐ আসছে।
>
> দুধের মতো শাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শোঁ-শোঁ শব্দে সমুদ্র এলো ঝাঁপিয়ে— মস্তবড়ো নদীটা যেন দুলে, ফুলে, গ'র্জে উঠে আরো অনেক প্রকাণ্ড হ'য়ে

Dhaka University Institutional Repository

ছড়িয়ে পড়লো— তার বিস্তার জুড়ে হাজার ঘোড়ার দাপাদাপি, হাজার স্টিমারের এঞ্জিন যেন পাকে-পাকে ছিটিয়ে দিচ্ছে তার ফেনা, তার ঘূর্ণি, তার সব নীল কালো বেগনি বাদামি শাদা রঙের ঝলক— দুপুর বেলার রোদ্দুরে আরো উজ্জ্বল— এক বিপুল রঙ্গ ঢেউ তুলে-তুলে পশ্চিম দিকে ছুটে চ'লে গেলো। দৃশ্যটির মেয়াদ হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি হবেনা, কিন্তু লোকেরা তা নিয়ে বলাবলি করে অনেকক্ষণ— কেমন হ'লো এবার, আগের বছরের চাইতে ভালো, না কি এবারে তেমন জমলো না? *আমার ছেলেবেলা* ৩/৫০৪

সাড়ায় এ বর্ণনাটি রয়েছে এই রকম—

পরের দিন ভাদ্রমাসের অমাবস্যা, দুই সপ্তাহ পূর্ব হইতে গুজব শোনা যাইতেছে যে এবার যে- 'শর' আসিতেছে, তাহার মতো সুন্দর ও ভয়ঙ্কর ইতিপূর্বে নাকি আর কোনো বছরেই আসে নাই। দুইদিন যাবৎ শহরের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে, ছেলে বুড়ার মুখে এই অতি-আসন্ন শোভার দুরন্ত মহিমা কীর্তিত হইয়া ফিরিতেছে।

একে রবিবার, তাহার উপর আকাশ সকাল হইতেই একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার; ভাদ্রের প্রখর রৌদ্রে ভাদ্রের প্রবল জোয়ার কেমন ফুলিয়া-ফুলিয়া দুলিয়া উঠিবে, সকালে চায়ের টেবিলে সাগর মা-বাবার মুখে এই আলোচনা শুনিল। ...একটার সময় 'শর' আসিবে, কিন্তু বেলা দশটা হইতে নদীতীরে নানাবয়সের ও নানাশ্রেণীর নরনারী জড়ো হইতে শুরু করিয়াছে। উগ্র রৌদ্রালোকে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতেছে, তাপদগ্ধ আকাশ আপনার চারিদিকে একখানি নীলিমক্লান্তি টানিয়া দিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণাকৃতি নদীটির আর তর সহিতেছে না, তাহার শীর্ণ তনুর সকল দারিদ্র্য অপসারিত করিয়া জোয়ারের জল কখন তাহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় সে ব্যাকুল।

... সহসা চারিদিক হইতে একটা তুমুল কলরোল শোনা গেল— ঐ যে, ঐ যে! সাগর চাহিয়া দেখিল, রাশি-রাশি লাল পর্বতশ্রেণীর মতো প্রকাণ্ড হইয়া ঝড়ের মুখে উড়িয়া আসিতেছে। আকাশের গায়ে অসংখ্য লাল ফিতা সাপের মতো পেঁচাইয়া-পেঁচাইয়া অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, আর পৃথিবীর বাতাসে একটি শীতল সুগন্ধ ভ্রাম্যমান। ১/১০৩

চ) কৈশোর কালে থিয়েটার দেখার স্মৃতি— ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে দেখা নাটকের কোনো-কোনো দৃশ্য মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে যাওয়া, পুরুষের স্ত্রী সেজে অভিনয় করা, যা কিনা কিশোর বুদ্ধদেবের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। এ প্রসঙ্গে নারীর নারীত্ব বিষয়ে তাঁর যে তীক্ষ্ণ অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন *আমার ছেলেবেলায়* তা সাগরের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তারও অনুভূতি ধাক্কা খেয়েছে— থিয়েটারের রাণী আসলে কোনো এক 'বটুদা'র নারী-সংস্করণ— এটা জেনে যাবার পর।

ছ) কিশোর বুদ্ধদেবের মতো নবযুবক সাগরও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে কবিখ্যাতি লাভ করেছে। বন্ধু মহলে তার গুরুত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি।

Dhaka University Institutional Repository

জ) বুদ্ধদেবের কবিআত্মার আবেগ শতধারায় উৎসারিত হয়ে যেন উপচে পড়েছে তাঁর লেখার খাতায়। কখনো আবার দেখা কিংবা অদেখা 'মেয়ে'কে ঘিরে তার রোমান্টিক চেতনায় জেগেছে প্রেম–

> কী ছিলাম আমি সেই সময়ে? একটা আবেগের পিণ্ড, বাস্তবে-কল্পনায় জট পাকানো একটা বান্ডিল– আগোছালো, অস্থির, দোলায়মান– মনের এ অংশে নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর অন্য অংশে অনেক বয়স্কের চেয়েও অধিক বয়স্ক। কাঁপছি আমি সারাক্ষণ, যে-কোনো হাওয়ায়, যে-কোনো ইঙ্গিতে, যেন আমি বড্ড বেশি খুলে যাচ্ছি, যেন আমার ভিতর মহলে অনেকের জন্য জায়গা থাকলেও আমার নিজেরই কোনো আশ্রয় নেই। ... প্রেমে প'ড়ে আছি যে-কোনো মেয়ের, বছরের মধ্যে যে-কোনো তারিখে– যাকে চিনি অথবা চিনি না, যাকে দেখেছি অথবা দেখিনি, অথবা শুধু নাম শুনেছি হয়তো– যে-কোনো একটা ছুতো পেলেই আমার নাড়ি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, মনের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু এত অপব্যয়ের পরেও আমার আবেগ আমি ফুরোতে পারি না; তা উপচে পড়ে আমার লেখার খাতায়, 'প্রগতি'র পাণ্ডুলিপি-সংখ্যাগুলিতে– পদ্যেগদ্যে অদম্য ও যেনিল। যেমন ছাপার বইয়ের অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে বুনো ঘোড়ার বেগে দৌড়ে চলি আমি, তেমনি আমার কলম চলে চিন্তাহীন ও মসৃণ–শব্দ, মিল, ছন্দ, সবই আমাকে অতি সহজে ধরা দেয়। যতক্ষণ লিখি, মৌজে থাকি; লেখার পরেও মনটা বেশ খুশি লাগে– *আমার ছেলেবেলা* ৩/৫৪৮-৪৯

আর *সাড়ায়* রয়েছে–

> কাগজের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একটানা সে লিখিয়া যায়– একটি- একটি করিয়া কথার ফুল ফোটে– কি আশ্চর্য সেই ফুল! –পৃথিবীর আর কিছুর সঙ্গে তাহার তুলনা হয়না। নিজের এই ক্ষমতায় সে নিজেই মুগ্ধ হয়, নিজের হাতের লেখার প্রেমে পড়িয়া যায়। তিনটি কথা– সাধারণ, অনাড়ম্বর তিনটি কথা পাশাপাশি বসাইলে তাহারা আর কথা থাকেনা– আগুনের মতো, আগুনের ফুলের মতো জ্বলিয়া ওঠে। –পৃথিবীতে আর মিরাকল ঘটেনা, একথা মিথ্যা। 'Out of three sounds I frame, not a fourth sound–'
>
> .... বসিয়া-বসিয়া সাগর একটি ছবি দেখে। ছবিটি সে কোথায় পাইয়াছে, তাহা নিজেই জানে না। হয়তো কোনো বই থেকে। হয়তো একদিন ভোরের দিকে এই স্বপ্ন দেখিয়া সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ছবিটি স্পষ্ট– রেখাগুলি দৃঢ়, রং মৃদু– রুপালি-ধুসর। আকাশে ঘন মেঘ–বৃষ্টি আসে-আসে। একটি প্রায়ান্ধকার ঘর মন্দিরের অভ্যন্তরের মতো ঠাণ্ডা। জানালা দিয়া সে আকাশ দেখিতেছে। তাহার শরীর যেন এমন পরিচ্ছন্ন যে-রকম মানুষের শরীর কখনো হইতে পারেনা। ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, একটি মেয়ে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েটির মুখ সে চেনে না, তবু যেন মেয়েটির সঙ্গে তাহার চিরকালের পরিচয়। পরনে শাদা– বিধবার শাদা নয়, বধূর। কপালে ছোটো একটি কাটা দাগ। চুল এলো। হাসিমুখ। মেয়েটি বলিল, এতদিন কেমন ক'রে ছিলে?

Dhaka University Institutional Repository

সাগর বলিল, এতদিন ছিলাম না,– এখন থেকে আছি।

...কিংবা কোনোদিন লিখিতে লিখিতে হয়তো খট্ করিয়া ঠেকিয়া গেল – একটা মিলের জন্য। সাগর সামনের চুলগুলি কপাল থেকে পিছনে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়– ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পাইচারি করে। এমন প্রাচুর্য কী করিয়া সম্ভব হয়? যেদিকে তাকায় সেখানেই কাব্যের বস্তু দেখিতে পায়, এত ঐশ্বর্য লইয়া কী করিবে সে? চিন্তার মতো দ্রুত গতিতে যদি লেখা হইত, তবে তাহার রচনা দিয়া ভেসুভিয়াসের বিশাল জঠর ভরিয়া ফেলা যাইত। কিন্তু কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে অসম্ভব সময় লাগে– কতকিছু অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে। ...

সাগর ছটফট করিতে থাকে। চুলের মধ্যে আঙুল ডুবাইয়া সে স্থিরচিত্তে কিছু ভাবিবার চেষ্টা করে। মনে-মনে হিসাব করিতে তাহার ভালো লাগে– যদি সত্তর বছর বাঁচি, যদি ষাট বছর বাঁচি, এমনকি যদি পঞ্চাশ ... ১/১৯১-৯২

ঝ) *আমার ছেলেবেলায়* উল্লিখিত যে বুদ্ধদেবকে আমরা পাই– ভীরু, সঙ্কোচ-স্বভাব, নির্জনতা প্রিয়– শুধু গ্রন্থরাজ্যেই তাঁর একচেটিয়া রাজত্ব– *সাড়া*র সাগরের মধ্যে যেন তাঁরই সন্ধান মেলে। সব মিলিয়ে *সাড়া* উপন্যাসে স্বয়ং বুদ্ধদেবের ও তার ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন সবচেয়ে বেশী করে লক্ষ করা যায়।

স্মৃতিময়তা, স্বীয় চরিত্রধর্মের নানান বিশেষত্বের প্রতিফলনের কারণে *সাড়া* উপন্যাসকে আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস বললে অসঙ্গত মনে হয়না।

স্বভাবগত আত্মমুখীনতা বুদ্ধদেবকে বিপর্যস্ত বাস্তবতা থেকে দূরে নিভৃত মর্মলোকে সৌন্দর্য ও ভালোবাসার শিল্পময় সৃজনে প্রাণিত করেছে। সমাজ ও জীবনবাস্তবতা থেকে তাঁর দূরত্ব রক্ষার আরেকটি প্রমাণ রয়েছে– পতিতা-নারী নির্মলার চরিত্র চিত্রণে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সৃষ্ট পতিতার ('বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে') মতো জীবিকা নির্বাহে কঠিন বাস্তবতার পীড়নক্লিষ্ট সে নয়, বরং ব্যাঙ্কে জমাকৃত তার টাকার পরিমাণ শুনে সাগর বিস্মিত হয়েছে। এর অর্ধেক দিয়ে জশিদি দেওঘরের মাঝামাঝি এক জায়গায় পুরনো বাড়ি কিনেছে নির্মলা, নতুনভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে। স্বভাব-শ্রবণতার দিক দিয়ে সে শরৎচন্দ্রীয়, সর্বংসহা জায়া কিংবা জননীসদৃশ নারী। বুদ্ধদেব বসু বাস্তবকঠিন সমাজজীবন চিত্রণে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর রচনার বিষয় ও চরিত্র প্রায়ই সমাজবাস্তবতা থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত ব্যক্তি বুদ্ধদেব নিজেও তা-ই ছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস রচনার কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের ও পরের সময়। উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা, এর চরিত্ররা প্রায় সবাই নগরজীবনের অধিবাসী। তবে সমকালীন কলকাতা তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক টানাপোড়েন বা জটিল জীবনচর্চা কখনো বুদ্ধদেবের উপন্যাসে ছায়া ফেলেনি। নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিও তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়নি। *সাড়া* উপন্যাসের সত্যবান কর্মহীন হলেও অর্থকষ্ট নেই তার। মুকুলেশ অধ্যাপক এবং নানাভাবেই সফল যুবক। অতি অল্পসময়ের চাকরিজীবনেই সে ফিয়াট গাড়ি কিনেছে। ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে থিসিস লেখার প্রস্তুতির কথা জানা যায় তার চিন্তাভাবনার মধ্য থেকে। বিনোদও অতি অল্পসময়ের মধ্যে 'লাইফ-ইন্‌শিওরেন্সের এজেন্সী' নিয়ে তার অবস্থা পরিবর্তন করেছে। পোশাক-পরিচ্ছদে পারিপাট্য, হাতে আংটি, রেস্তোরাঁয় খাবারের বিল পরিশোধ করে দেওয়া– এইসব কিছুর মধ্যে তার সচ্ছল অবস্থার ইঙ্গিত মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধোত্তর যুগের উপনিবেশ-কবলিত সংকট-সংকটোত্তরণ– সব মিলিয়ে এক জটিল দ্বন্দ্বমুখর প্রতিবেশ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রয়োজনে আত্মবিবরগামী মানসলক্ষণ বুদ্ধদেব বসুর এই আত্মবাদী প্রবণতার মধ্যে পরিস্ফুট। রোমান্টিক মানস-ধর্মের এও এক অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে তাই কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে– যেমনঃ রোমান্টিক অনুভব, স্মৃতিচারণপ্রিয়তা, বিষাদময়তা– বড়োকথা নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত মানসআশ্রয়ী এক শিল্পীর মনোধর্ম। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রাণিত হয়েছেন ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০), ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), লিও তলস্তয় (১৮১৮-১৯২০), টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫), জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) প্রমুখ সাহিত্যশিল্পীর দ্বারা। আধুনিক জীবনস্পর্শিত যৌবনের নানামুখী প্রবণতাকে আত্মস্থ করেছেন তিনি, অনুভব করেছেন তার মর্মদাহী যন্ত্রণাকে, কিন্তু প্রাধান্য দিয়েছেন প্রেমের অমৃত চেতনার নিগূঢ় আকৃতিকে। তাঁর কথাসাহিত্যে প্রেমের যে বিচিত্র রসাবেদন, তা এই পাশ্চাত্য প্রভাবসম্ভূত। কল্লোলশ্রবণতার সঙ্গে এর সাযুজ্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এই প্রবণতার কারণে এ পর্বের তরুণ সাহিত্যরচয়িতাগণ শুধুই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনতটকে আশ্রয় না করে এর বাইরে, আরো বৃহত্তর চিন্তা ও বিষয়ের মধ্যে নিজেদের ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব, পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের হৃদয়তলের গূঢ়গভীর বাসনা ও আর্তি বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যদিয়ে উন্মোচন করেছেন তাঁরা।

বুদ্ধদেবের রচনার বিশেষত্ব এই যে, প্রেম-বিরহ কিংবা তাঁর বক্তব্য আশ্রয়ী কোনো বিষয় বাস্তবতাস্পর্শী হয়েও তারমধ্যে ব্যঞ্জনাধর্মিতার লক্ষণ ধরা পড়ে, আর তা ধরা পড়ে তাঁর আত্মমগ্ন স্বভাবের জন্যে। বাহ্যিক জীবনবাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে প্রায়ই নিভৃত মনোলোকে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। আসলে তাঁর জীবনবোধটাই এরকম– বাস্তব মিলনপ্রয়াস নয়, বরং এ থেকে দূরে কল্পনার জগতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা। মানুষের বাস্তবসংসারের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে আরও বেশি কিছু চিন্তা করা। এদিক দিয়ে তিনি এবং তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক স্বতন্ত্র এক নিঃসঙ্গ জগতের মানুষ। আত্মমুখী এবং স্বপ্নচারী স্বভাবের কারণে তাঁকে বাস্তবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হওয়া বিচিত্র নয়। আর একারণেই সম্ভবত সমকালীন দেশকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা বিপর্যয় তাঁর সৃষ্টিতে সরাসরি কোনো প্রভাব ফেলেনি। গ্রামীণ জীবন-পরিবেশ ও ক্ষেত খামারের মানুষ কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার মতো কলকারখানার কর্মে নিয়োজিত শ্রমজীবী ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুখদুঃখময় জীবনরূপের পরিচয়ও তাঁর কথাসাহিত্যে অনুপস্থিত। সাধারণ ও বৃহত্তর সমাজচিত্রের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-পরিবেশ– বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিকজীবন প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। এর বাইরে যাবার তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। তাঁর গল্প উপন্যাসের পটভূমি নগরসভ্যতালালিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ও অনুভূতি আশ্রিত, সে জীবনও আবার ক্ষুব্ধ জটিল সংগ্রামে মুখর নয়, বরং পরিশীলিত নাগরিক জীবন ও হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়াশ্রিত। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে তিনি হয়েছেন তার আংশিক রূপকার। গ্রামীণ জীবন, পরিবেশ কিংবা নিম্নবিত্ত মানুষের কথা তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। *সাড়ায়* এ ক্ষেত্রে খুব সামান্য হলেও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। *কল্লোল*পন্থী লেখকদের নানা প্রবণতার একেকটি লক্ষণ এইভাবে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাঁরও বিদ্রোহী মানসচেতনার পরিচয় রয়েছে– নির্মলাকে নিয়ে সত্যবানের বিবাহহীন একত্রবাসের সংকল্পের মধ্যে এবং এ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সংস্কারমুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে। ন'টায় হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবার কথায় সত্যবানের উক্তি–

Dhaka University Institutional Repository

—আর বন্ধু! টাকা থাকলে স্বর্গের পিটরও দোর খুলে দেবে, আর এতো আমাদের ভজু দারোয়ন। ১/১১৪

জনকের কথার উত্তরে সাগরের উক্তিতে—

— দেখা যাক ঈশ্বরের হাতের উপর হাত চালানো যায় কিনা। ১/১৭১

নির্মলার সংস্কারে ঘা দেবার জন্যে সত্যবানের ব্যাঙ্গোক্তি—

—ঈশ্বর বেচারিকেও টেনে আনলে! কি পরিশ্রম ভদ্রলোকের— এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কে কী করছে সব নোট-বইতে টুকে রাখতে হয়। ...
কর্মচারীর মধ্যে তো উপস্থিত এক পুরুৎ-ঠাকুরকে দেখছি— ১/১৯৭

ঔপন্যাসিকের সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন—

বুদ্ধদেব সমাজ সচেতন লেখক নন। সমাজ পরিবর্তনের কিংবা সামাজিক ক্রিয়া-কৌশলের ভালোমন্দের কোন দায়দায়িত্ব তিনি বহন করেননি।[২৫]

বুদ্ধদেব জন্মভীরু লেখক, বিদ্রোহাত্মক বলিষ্ঠ উদ্দাম কল্পনা তাঁর আয়ত্তের বাইরে।[২৬]

সমালোচকের এসব বক্তব্য মেনে নিয়েও বলা যায় গণ্ডীবদ্ধ সামাজিক সংস্কারকে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। জীবিকার প্রয়োজনে *সাড়া* উপন্যাসের নির্মলা যা-ই করুক, শুদ্ধজীবনে প্রত্যাবর্তন-আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন দানের মধ্যেও রয়েছে লেখকের এই প্রয়াস।

গতানুগতিক সাহিত্যধারা ও সমাজপ্রচলিত চিন্তাভাবনাকে অতিক্রম করেছিলেন তিনি। অতিআধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রতিভাদীপ্ত লেখক বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচকঃ

'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক, 'কবিতাভবনে'র কর্ণধার বুদ্ধদেব বসুই ছিলেন বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে বহুমুখী, বহুপ্রসূ এক প্রতিভা।[২৭]

জীবন ও সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানা যায় তাঁকে লেখা চারখানা চিঠিতে। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাস সম্পর্কে কবির নিজস্ব অনুভূতির কথা, আধুনিক সাহিত্য বিচারের সমস্যার কথা, সবশেষে এই উপন্যাস তাঁর ভালো লাগার কথা জানা যায়। ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫-এ শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠিতে কবি জানিয়েছেন—

কিছুদিন আগে তোমার "বাসর-ঘর" বইখানি পৌঁচেছে আমার টেবিলে। গড়িমসি করে দেরি করেছি খবর নিতে। ভয় ছিল পাছে ভালো না লাগে। ...
তোমার বইখানি নিঃসংশয়েই ভালো লাগল, তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি। গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে।

... এ লেখায় গতিবেগের এমন প্রবলতা এবং রসের এমন প্রাচুর্য্য আছে যে এর মধ্যে পাঁচ মিশেলি বৈচিত্র্যের অভাব পীড়া দেয়নি। রচনায় বাইরের যে মসলা যোগ করেছ সে বিশ্বপ্রকৃতির। তাকে না হোলে বাসর-ঘর গড়া যায় না— এই দুটির যোগসাধন করেছ নিপুণ হাতে। তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে যেখানে শেষ হোলো বই, গল্পটা রয়ে

Dhaka University Institutional Repository

> গেছে তার পরের দিকে। ... এই তোমার গল্প না বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে।...[২৮]

সাড়ার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর অন্য উপন্যাসের তুলনা করলে দেখা যাবে, শৈশবাবধি অনেকটাই মাতৃকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ স্বভাব আশ্রয় করে বড়ো হয়ে উঠেছে *সাড়ার* সাগর, *ধূসর গোধূলির* নীলকণ্ঠ, *সূর্যমুখীর* মিহির, *পরস্পর* উপন্যাসের অশান্ত। তাদের কেউই শেষপর্যন্ত মায়ের প্রভাব এবং মাতৃনির্ভরতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি।

সাড়ার সাগর, *যবনিকা পতনের* মৃগাঙ্ক শেখর, *রডোডেনড্রন-গুচ্ছের* পুরন্দর, *যেদিন ফুটল কমলের* পার্থপ্রতিম– এদের সবারই প্রধান আশ্রয় সাহিত্যচর্চা।

কর্মহীন অলস সময় অতিবাহিত করতে আগ্রহী *সাড়ার* সাগর এবং *একদা তুমি প্রিয়ের* পলাশ। দু'জনেরই আত্মমগ্ন স্বভাব। কর্মহীন আনন্দভাবনায় নিজের মধ্যে নিজে নিবিষ্ট থাকতেই তারা পছন্দ করে বেশি।

বিচ্ছিন্নতা-আশ্রয়ী চরিত্র রয়েছে *সাড়া, রডোডেনড্রন-গুচ্ছ* এবং *পরস্পর* উপন্যাসে। হাসি আনন্দময়, আড্ডানুখর পরিবেশের মাঝখানেও বিচ্ছিন্নতার পীড়ন এবং নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি নিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে তারা।

> এই সুসজ্জিত ঘরের পরিমিত বায়ু তাহার নিঃশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ...সাগর ততক্ষণ সহজভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতে পারিল না, যতক্ষণ না কলিকাতা আবার তাহাকে আপনার কোলে ফিরাইয়া লইল। ও-বাড়িতে সে যতক্ষণ বসিয়াছিল, ততক্ষণ নিজের অস্তিত্বের চেতনা তাহার বিহ্বল মনকে পীড়া দিতেছিল, একটি নিমেষের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে সে পারে নাই। *সাড়া*:১/১২২-১২৩

> পুরন্দর ভাবছিলো, কেনইবা সে এখানে ব'সে আছে? বাড়ি চলে গেলেই তো পারে। এ-সব ঝঞ্ঝাটের যথেষ্ট হয়েছে – এখন তা'র ঘরে ফিরে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসা ছাড়া তো আর উপায় দ্যাখে না। হ্যাঁ – ঐ তাকে মানায়, বই পড়া। তিক্তভাবে, তিক্তভাবে সে উপলব্ধি করলে যে বইপড়া ছাড়া আর কোনো কাজেরই সে উপযুক্ত নয়; সমস্ত জীবন এ ছাড়া আর কিছু সে করেওনি। *রডোডেনড্রন-গুচ্ছ*: ২/৩৭৭

আর *পরস্পরে–*

> এককোনে চুপচাপ বসে' অশান্তর মনে হ'তে লাগলো সে একজন বাইরের লোক, এই আবহাওয়ায় কিছুতেই মানাবেনা, কখনোই নয়। ৬/২৯৩

আত্মমগ্নতায়, নৈসঙ্গ্যতায়, ভাবুক স্বভাবের দিক দিয়ে *সাড়ার* সাগরের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছে *ধূসর গোধূলির* নীলকণ্ঠ। আত্মমগ্ন, রোমান্টিক, কল্পনাবিহারী কবিস্বভাব *সূর্যমুখীর* মিহিরের মধ্যেও বিদ্যমান। সাগর ও নীলকণ্ঠ দুজনেই বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য। তারা শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়ায় আগ্রহী। সাগরের স্ত্রী মণিমালার প্রশ্ন –

> তুমি যে দিনভর নভেল আর সিগারেটের টিন নিয়ে এই ইজি- চেয়ারে প'ড়ে থাকো– সত্যি, ভালো লাগে তোমার? ১/১৬০

Dhaka University Institutional Repository

আর নীলকণ্ঠের ভাষ্যে জানা যায় –

> বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বই পড়া ছিলো আমার জীবনের উচ্চতম সুখ। ৪/৬৪

কল্পনাবিলাস, ভীরুতা আর আত্মবিশ্বাসের অভাব দু'জনেরই মানস-স্বভাবের বিশেষত্ব। এ স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল তাদের ভবিষ্যৎ-পরিণতিরও পূর্বাভাস। স্বাধীন ইচ্ছাক্ষম মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি তারা। বাড়ির পরিবেশ তাদের এ স্বভাব গঠনে সহায়ক হয়েছে। দু'টি বাড়িই শান্ত, চুপচাপ, জনমানুষের সংখ্যা সেখানে তিনের অধিক নয়।

> পাড়াটি চুপচাপ, বাড়িটি শব্দহীন, দিনগুলি নির্জন নিস্তরঙ্গ। এইতো ভালো, এছাড়া আর- কোনো ভালো সে চায় না। *সাড়া*ঃ১/১৫৬

> তাড়া নেই, আওয়াজ নেই। ছোটো পরিবার– আমার আর-কোনো ভাই-বোন ছিলো না– বাড়িটা আশ্চর্য রকম চুপচাপ। যেন কাচের বাড়িতে বাস করছি, বাইরের কোনো শব্দ এসে পৌঁচছেনা। সমস্ত শান্ত, আর ধীর, আর নিখুঁত রকম গোছানো।
> *ধূসর গোধূলি*ঃ৪/২০

স্থানে স্থানে দুটি উপন্যাসের ভাবগত সাযুজ্যও লক্ষ করার মতো–

> ছেলেবেলায় সে যে সচিত্র বইখানার মর্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িয়াছে, সকল রহস্যের চাবি তাহার হস্তগত হওয়া অবধি সেই বইখানার গায়ে ধুলা জমিতেছে। *সাড়া*ঃ১/১৯০

> পরে, বয়স যখন বাড়লো, যখন নিজের লেখা লিখে উঠে অন্যের লেখা পড়বার সময়ই প্রায় পাই না, তখন দেখলুম বালক-কালের সেই অনেক অসম্পূর্ণ- ক'রে বোঝা ইঙ্গিত, অনেক প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য ফিরে আসছে পরিপূর্ণ প্রকাশের মহিমা নিয়ে।
> *ধূসর গোধূলি*ঃ৪/২৭

কখনো দেখা যায় বিভিন্ন উপন্যাসের ভাষা বা বাকবিন্যাসগত মিল–

> রসনিপীড়িত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত তাহার মন নিজেকে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না– এখনই অসহ্য আনন্দে ফাটিয়া পড়িবে। *সাড়া*ঃ১/১৩৩

> আমার মন মূর্ছিত হ'তো আনন্দের নিপীড়নে– অত আশা তো আমি করিনি। *ধূসর গোধূলি*ঃ৪/২৬

> কাগজের সঙ্গে মাথা প্রায় ঠেকাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটানা লিখিয়া যায়– *সাড়া*ঃ ১/১৯১

> ফাউন্টেন- পেনটি তুলে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভেবে নিলে;– তারপর মাথাটা প্রায় টেবিলের সঙ্গে ঠেকিয়ে লিখতে আরম্ভ করলে। অকর্ম্মণ্য ঃ ১/২৭৭

*সাড়া*য় সাগর স্বপ্নদৃশ্যে তার আকাঙ্ক্ষিত সাদা মূর্তিকে ধরার বাসনায় পাহাড় আরোহন করছে এবং—

> সাগর উন্মাদ আগ্রহে হাত বাড়াইল, কিন্তু হঠাৎ আকাশ খুলিয়া ফাঁক হইয়া গেল এবং চক্ষের পলকে সেই মূর্তিকে গ্রাস করিয়া আবার বুজিয়া গেল। ১/১৬০

Dhaka University Institutional Repository

ধূসর গোধূলিতে নীলকণ্ঠ মায়াকে গল্পচ্ছলে জানাচ্ছে–

> স্বর্গ তো প্রায় দেখাই যায় এখান থেকে। আকাশটা একটু যদি ফাঁক হয়ে যায় কখনো– ৪/৭১

পরমপ্রাপ্তির পূর্ণতায় মৃত্যুকে আবাহন করেছে তারা দু'জনেই–

> সাগরের মনে হয়, আর তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই, জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ সে জানিয়াছে, শুধু মৃত্যুই এখনও অনাবিষ্কৃত। *সাড়াঃ* ১/১৯১

> ...সেই একটি বছর! তা এত সুন্দর যে অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। *ধূসর গোধূলিঃ* ৪/৭৮

পুরুষের কর্মহীন, রুদ্ধগতিময় জীবনযাপনের বিরুদ্ধে সমালোচনা রয়েছে *সাড়া, যেদিন ফুটল কমল* এবং *ধূসর গোধূলি* উপন্যাসে–

> ... এমন সময় মণিমালা আবার বলিল, তুমিই বলো, পুরুষমানুষের কোনো কাজকর্ম নেই, একি দেখতেই ভালো, না শুনতেই ভালো?
>
> ... ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, পুরুষের পক্ষে কাজের চেয়ে বড়ো আর- কিছু নেই। *সাড়া* ঃ ১/১৬১
>
> মানসী বাঁকা ঠোঁটে হাসলেন। – 'পুরুষদের কথা আলাদা। তারাতো কাজ করবেই। তারা কাজ না-করলে চলবে কী করে? *যেদিন ফুটল কমলঃ* ৩/২৫৯
>
> বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। .... পুরুষের যদি কোনো স্বতন্ত্র দিন-জীবন না থাকে– কোনো উদ্দেশ্যের প্ররোচনায়, কর্মের উদ্‌যাপনে, যদি তার দিন না কাটে, তাহ'লে সে বাঁচে কী ক'রে। *ধূসর গোধূলিঃ* ৪/১০১

সাড়ার সাগর একদিন বড়ো হবে, আর মা মরে যাবে– একথা সে কিছুতেই মানতে চায়নি তাই–

> দুর্বল স্বরে কহিল, না, তুমি মরবেনা, মরতে পারবেনা। ... তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ডও– *সাড়াঃ*১/৯৯-১০০

মায়ের ব্যাপারে *সূর্য্যমুখীর* মিহিরের মনোভাবও একই রকম–

> বয়েস বাড়ে, মানুষের শরীর ভেঙে পড়ে। কী ভয়ানক! কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর অন্যায়।
> ... বুড়ো– কথাটা শুনলেই গা-টা কী রকম শিউরে ওঠে না! সেই বুড়ো তার মা কখনো হবেন? অসম্ভব! *সূর্য্যমুখীঃ* ৪/২০৮

এই দু'টি উপন্যাসে উপমা ব্যবহারে সাযুজ্য রয়েছে কোথাও কোথাও–

> রুগ্ন পশুর মতো সত্যবানের বিছানায় সে পড়িয়া থাকিত– *সাড়াঃ* ১/১৫৩
> অন্ধকারের মধ্যে সুড়সুড় করে' সে বিছানায় গিয়ে শুলো, গুহার মধ্যে কোনো ক্লান্ত জন্তুর মত। *সূর্য্যমুখী* ঃ ৪/২৩৪
> সন্ধের একটু পরে মৃণাল তার সংসার, তার কাজ, সমস্ত ফেলে রেখে শুয়ে পড়লো বিছানায়, রুগ্ন পশুর মত। *সূর্য্যমুখী* ঃ ৪/২৮১

Dhaka University Institutional Repository

সাড়ায় পত্রলেখার এবং *অসূর্যম্পশ্যায়* সরমার জননী আভিজাত্য প্রদর্শনের তলায় তলায় তাদের কন্যাকে প্ররোচিত করেছে বহুপুরুষের সঙ্গে বাধাহীন মেলামেশায়। কন্যাকে পাত্রস্থ করার বাসনায় ধনাঢ্য যুবক-শিকারের হাস্যকর আয়োজন দু'টি উপন্যাসেই লক্ষণীয়।

সাড়ায় বুদ্ধদেবের আত্মপ্রক্ষেপ রয়েছে। সাগরের নোয়াখালি ও ঢাকার বাসস্থানের পরিবেশ বর্ণনায় তাঁর কৈশোর ও যৌবনকালকে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। *রভোভেনভ্রন*-গুচ্ছের সুমিত্রার ছাত্রজীবনের বর্ণনায়ও রয়েছে যেন তাঁরই আত্মজীবনের ধারাভাষ্য।

শূন্যগর্ভ, তথাকথিত সাহিত্যপ্রেমীদের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের মধ্যবিত্ত সমাজস্তরের বুদ্ধিজীবী আত্মার ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে ব্যঙ্গময়তা আশ্রয় করে। *সাড়ায়* পত্রলেখার ড্রইংরুমবিহারীদের আচার-আচরণ ও সাহিত্যালোচনার উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে তার পরিচয়।

> গণেশ একবার চুলে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, আজকাল কবিতা লেখা একটা ফ্যাশন হ'য়ে উঠেছে।
> মুকুলেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিল, যা বলেছো। এ-সব কি আর কবিতা হচ্ছে? ম্যাথু আর্নল্ড যা ব'লে গিয়েছেন—
> সাগর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোন সবের কথা বলছেন?
> মুকুলেশ যেন একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিল, এই আজকালকার So-called সাহিত্যের কথা। এ নিয়েই এত জাঁক! পোপ পড়েছ? হ্যাজলিট-এর—
> —কিন্তু আপনি কি আজকালকার কিছু পড়েছেন?
> — পড়তে হয় না হে, আমাদের পড়তে হয় না। কার যে কী দাম তা আমরা না-পড়েই বুঝি—
> গণেশের গলা দিয়া ইঁদুরের চীৎকারের মতো একপ্রকার শব্দ বাহির হইল। ঐটাই হাসি— পড়বার মতো কিছু থাকলে তো! রবীন্দ্রনাথের মতো একটি লাইন এরা কেউ পারবে লিখতে?— 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকির ঐ ডালে-ডালে'— আ-হা!
> মুকুলেশ বলিয়া উঠিল, এ আর তেমন কী? ধরুন—'পঞ্চশরে ভস্ম করে—' *সাড়া*ঃ ১/১৩৫

> সে (সুলতা) উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো, 'চমৎকার। জীবনের প্রতি এমন চমৎকার attitude; reason আর Faith-এর এমন চমৎকার Compromise, কল্পনার এমন-এমন-এমন—', সুলতা কথাটা ছেড়ে দিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করলে, Fine'
> সুলতার প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ শারীরিক যন্ত্রণার মত ইন্দ্রজিৎকে আঘাত করছিলো। ঈশ্বর, ঈশ্বর— মনে-মনে সে গাঢ় প্রার্থনা করছিলো— ঈশ্বর, আমাকে অন্ধ করো, পঙ্গু করো, আমার অকাল-অপমৃত্যু ঘটাও, আমাকে নিয়ে যা খুসি তা-ই করো; কিন্তু মূর্খ অশিক্ষিত নির্ব্বোধ লোকের কাব্যালাপ শোনবার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। *মন-দেয়া-নেয়া* ঃ ২/১০

> 'আপনার নতুন একখানা বই বেরিয়েছে—না?' এমন ক'রে বললেন যেন অপরাধীকে জেরা করছে উকিল। মৃগাঙ্ককে স্বীকার করতে হ'লো যে অভিযোগটা মিথ্যে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

'আমি অবশ্য পড়িনি, কিন্তু—কিছু মনে করবেন না— আমার কোনো-কোনো বন্ধু বলছেন যে বইখানা ভালো হয়নি।'

'আপনার কোনো-কোনো বন্ধুর সেটা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।'

'সত্যি বলতে আপনার কোনো বই-ই এ পর্যন্ত আমার পড়ে ওঠার সময় হয়নি; কিন্তু অনেকের মুখে আপনার প্রশংসা শুনেছি। আপনাকে দিয়ে সাহিত্যের স্থায়ী কোনো কাজ হবে ব'লে আমার মনে হয়।' *যবনিকা-পতন* ঃ ২/১৯০

তোমার একখানা উপন্যাস আমি পড়েছি— খুব ভালো। বাঙলা বই আমি সাধারণত পড়িনে, কিন্তু তোমার বইখানা আমি পড়েছি। বেশ বই।

... সেই যে— যেটাতে একদল প্রেমিক-প্রেমিকার কথা লিখেছ; সবারি দেদার পয়সা, মোটার গাড়ি হয় আছে, না হয় ইচ্ছে করলেই কিনতে পারে, সবাই— সাহিত্যিক না হ'লেও সাহিত্যঘেঁষা।

... কিন্তু আশ্চর্য পাতার পর পাতা এরা শুধু কথাই কইলো— কথা, কথা, কথা— ... কথা কওয়া ছাড়া আর কিছু করতেই যেন ওরা অপারগ। আশ্চর্য! সত্যি, খাসা লিখেছ বইখানা। এর পরেরটা— তা-ও কি ঐ ধরনের হবে'? *রডোডেনড্রন-গুচ্ছ* ঃ ২/৩৭৩

মনে-মনে আমি বললুম; 'সানন্দা, তোমার মাথায় একরাশ চুল আছে, মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে যখন তুমি হেসে ওঠো, দেখতে বেশ হয়; কিন্তু সে-মাথার ভিতর এমন-কোনো পদার্থ নেই, যা'র সাহায্যে বইয়ের ভালো-মন্দের শ্রেণী-বিভাগ তুমি বুঝতে পারো; অতএব, এসব আলোচনা থেকে তুমি বিরত হও। *সানন্দা*ঃ ৩/৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৯. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *বাংলা কথাসাহিত্যঃ প্রকরণ ও প্রবণতা* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণী, ১৯৯১), পৃঃ ১৯৯।

১০. বুদ্ধদেব বসু, *আমার ছেলেবেলা, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* ; প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫০।

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃঃ ১১৯।

১২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।

১৩. 'যে দিন ফুটলো কমল' গল্প সম্পর্কে বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

১৪. বুদ্ধদেব বসুর চিঠিঃ রবীন্দ্রনাথকে, *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* ; তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৯।

১৫. অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা* (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতাঃ পাঠভবন, ১৯৬৮), পৃঃ ২৫৮।

১৬. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'শিল্পিত স্ববিরোধঃ প্রবন্ধের শিল্পী', তরুণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপনী, ১৯৮৮) পৃঃ ২৪১

১৭. সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেব সম্পাদিত *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*; প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫) ভূমিকা, পৃঃ ৬।

১৮. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী *বাংলা কথাসাহিত্যঃ প্রকরণ ও প্রবণতা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

১৯. সুদক্ষিণা ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

২০. ঐ।

২১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬।

২২. অচ্যুত গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

২৩. বুদ্ধদেব বসু, *আমার ছেলেবেলা, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*; তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯।

২৪. '... তা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ অথবা অবকাশ আমার ছিলোনা'। ঐ, পৃঃ ৪৯৪।

২৫. সমরেশ মজুমদার, *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

২৬. অচ্যুত গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।

২৭. তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

২৮. রবীন্দ্রনাথের চিঠিঃ বুদ্ধদেব বসুকে, *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৫৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

একই কালের পটভূমি আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছিলেন *কল্লোল*লক্ষণের ধারক এই পঞ্চসাহিত্যকার। প্রবণতায় অভিন্ন হয়েও সৃষ্টিক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। এ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্ট বিষয়ের সংস্থাপন, চরিত্রের সৃষ্টি-নৈপুণ্য, ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য ইত্যাদি আরো বিভিন্ন দিকে লক্ষণীয়। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের শিল্পদক্ষতাকে নানামাত্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। তবু, পরস্পরের সৃষ্টির দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন নিজের নিজের রচনার ক্ষেত্রে। নিজেদের সৃষ্টির বিষয়, ভাব ও বক্তব্যের পুনরুচ্চারণ করেছিলেন তাঁদের পরের বিভিন্ন রচনায়। তাঁদের প্রথম রচিত এই পাঁচটি উপন্যাসে বিভিন্ন দিক দিয়ে নিম্নরূপ সঙ্গতি লক্ষ করা যায়।

নায়কের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে *বেদে*, *অসাধু সিদ্ধার্থ* ও *সাড়া* উপন্যাসে। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ আশ্রয় করেছে *পথিক* ও *পাঁক* উপন্যাস।

প্রেমের দেহবাদী বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছিলেন *কল্লোল*কালের তরুণ লেখকরা। এক্ষেত্রে তাঁদের কেউ কেউ হয়তো আতিশয্যই প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, আলোচ্য উপন্যাসগুলোর দেহবাদী প্রবণতার পরিস্ফুটন নেই। শারীরমিলনের বিষয়টি কোথাও ইঙ্গিতমাত্র, কোথাও পুরোপুরি অনুপস্থিত। বরং দেহস্পর্শহীন প্রেমের মহিমা প্রদর্শিত হয়েছে কোথাও কোথাও। যেমন, *বেদের* দাদাবাবু-মাধু এবং *সাড়ার* সাগর-লক্ষ্মীর আন্তরমিলনের মোহনীয়তায়।

দেহকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে *পথিক* এবং *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে—

> এই শরীরের মধ্যেই যে প্রেমের বাসা; শুক্তির বুকে মুক্তার মত প্রেম যে এই রক্তমাংস-পিণ্ডের মধ্যেই লুকাইয়া থাকে। *পথিক*/৪২৬

> প্রেমে যে পশুত্ব দিয়াছে সে-ও ধন্য। প্রেমে স্বর্গীয় দেহাতীত পবিত্রতা কল্পনা করিয়া মানুষের এই অতিষ্ঠকর কলরব কতদিনের ? দেহ স্বল্পজীবী, আত্মা অমর—কিন্তু দেহ কি মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছার বিগ্রহ নয় ? শিবের পূজা শুদ্ধমাত্র তাঁর মাঙ্গল্যের পূজা নয়—সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষয় রাখিবার তাঁর যে শক্তি তাহারও পূজা। *অসাধু সিদ্ধার্থ*:১/১৪৭

রোমান্টিক আবেগাশ্রিত উচ্ছ্বাস রয়েছে *বেদে* এবং *সাড়ায়*। বিষয়ের চেয়ে বিষয়বর্ণনার কারুকার্য এবং কাব্যময় বাকবিন্যাস রয়েছে *বেদের* স্থানে স্থানে এবং *সাড়ার* প্রায় সর্বত্র।

স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা রয়েছে *অসাধু সিদ্ধার্থ* এবং *সাড়ায়*। উভয় স্বপ্নদৃশ্যই নায়কচরিত্রের মনোবাস্তবতার রূপকচিত্র। মর্মগভীরে নিহিত তাদের মৌলসংকটের পরিচয় আভাসিত হয়েছে তার মধ্যে। পাহাড়-আরোহণের পর আকাঙ্ক্ষিত মূর্তিকে ধরতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে যেতে থাকে সাগর।

Dhaka University Institutional Repository

অজয়াকে অধিকার করতে আসা মৃতসিদ্ধার্থকে আক্রমণ করতে চেয়েছে নটবর, কিন্তু মুদীর তাড়া খেয়ে ছুটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যেতে থাকে সে।

নায়কের মনোভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো না কোনো চরিত্রের চেহারা পরিবর্তিতরূপে প্রতিভাত হয়েছে তার চোখে। *বেদেতে* মাস্টারের নির্যাতক স্বভাব জেনে যাবার পর কাঞ্চনের কাছে তার চেহারার পরিবর্তন ধরা পড়েছে। দুটি উদাস চোখের করুণা বর্ষণ করে যে মানুষটি একদিন গঙ্গার ধারে তার হাত ধরেছিল—

> এখন দেখি লোকটির সারামুখে বসন্তের দাগ, নাকের নিচে প্রকাণ্ড একটা ঘা হয়ে শুকিয়ে কদর্য একটা দাগ হয়ে আছে। ১/১২৬

আর *সাড়ায়* হোস্টেলের প্রথম দিনটিতে সত্যবানকে অসহ্য মনে হওয়ায়—

> সে তাহার দিকে কয়েকটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দিব্যি কালো রং, অর্থাৎ কিনা বেশ কালো, মানে খুবই কালো। কিন্তু তৈল-মসৃণ উজ্জ্বল কালো নয়, মুখের মধ্যে কেমন একটা পাংশুতা আছে। মুখের চামড়ায় কয়েকটা বসন্তের দাগ এমনভাবে বসিয়া গেছে যে কালো রঙের মধ্যে তাহা মিশিয়াই আছে প্রায়। পাতলা ঠোঁটের উপরে চোখা নাকটা ঝুলিয়াই আছে, ...
>
> সাগর মনে-মনে লোকটাকে কুৎসিত আখ্যা দিতে চেষ্টা করিল। ১/১১৩

কিন্তু সাগরকে বইপত্র গুছিয়ে দিয়ে, বিছানা পেতে দেবার পর—

> ঐ যে কী রকম একটা চিকণ হাসিতে উহার ঠোঁট দুইটি বাঁকিয়া আছে, বাঁ চোখের নিচে বোলতার কামড়ে ঐ যে ফুলিয়া গিয়া চোখটা একটু ভিতরের দিকে বসিয়া গিয়াছে, ইহারই জন্য উহার মুখে সবই যেন মানাইয়া যায়। ১/১১৫

আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে মানসিক আরাম পেতে চেয়েছে *পথিকের* শ্রীশ এবং *সাড়ার* সাগর। নিজের নিস্পৃহতাজনিত কারণে তটিনীকে হারিয়ে শ্রীশ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাচ্ছে এভাবে—

> যেখান হইতে তটিনীর দেওয়া আঘাতগুলি সবার অলক্ষ্যে অতি সহজে সে পাইতে পারে, এমন স্থান, সময়, সুযোগ সে খুঁজিয়া বাহির করিত! একান্ত নিষ্ঠার সহিত ঐ বেদনাকে সে আপনার বক্ষে ধারণ করিত। পৃঃ ৪৩৯

সাড়ার কিশোর নায়ক লক্ষ্মীকে চড় মেরে ফেলে—

> সমস্ত দিন সাগর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ টানিতে লাগিল। বিকালে তাহার বাবা কাচারি হইতে ফিরিলে পর সাগর হাত থেকে একটি চায়ের পেয়ালা ফেলিয়া দিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। মা তাহাকে কখনোই মারিবেন না, কিন্তু বাবার কথা বলা যায় না। আশান্বিত দৃষ্টিতে সে বাবার দিকে চাহিল; ...[যেন] সে একটু মার খাইয়া বাঁচে! ১/৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

আহ্লাদি আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে ব'য়ঃসন্ধিজাত রোমান্টিক যন্ত্রণা অনুভব করেছে বেদের কাঞ্চন—

> যাবার বেলায় আহ্লাদি তার বাতির স্মৃতিচিহ্নটি আমাদের জন্য রেখে গেছে। বাতিটা যদি বেড়ায় লেগে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে সমস্ত আশ্রম পুড়ে যায়, বেশ হয়। ১/১৪২

লক্ষ্মীকে চড় মারার পর *সাড়ার* সাগরের—

> তাহার ইচ্ছা হইল, বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দেয়, কিংবা বাবার সিগারেটের কৌটা জলে ফেলিয়া দেয়, ...১/৯৭

পথিক ও *সাড়া* উপন্যাসের প্রায় সবচরিত্রই সম্পন্ন পরিবারের সদস্য। উভয় উপন্যাসেই দু'জন নারী– তটিনী ও পত্রলেখার ড্রইংরুমে স্তাবক যুবকেরা এসে গল্প জমায়। *পথিকে* মিসেস ডি'র বাড়িতে নিমন্ত্রিত যুবকদের কেউ এক তরুণীকে গান গাইতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু—

> সে 'ফ্যারিন্‌জাইটিস্' নামক কণ্ঠরোগে আজ বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছে, তাহাড়া তাহার টনসিলাইটিস্'ত লাগিয়াই আছে, কথা কহিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়, তবু মানুষ বোঝে না! ... কিন্তু অর্গ্যানের চাবি টিপিতেই এক আশ্চর্য কাণ্ড হইয়া গেল! টনসিলাইটিস্ এবং ফ্যারিন্‌জাইটিস্ যাহা এতকাল তাহার কণ্ঠ চাপিয়া বসিয়াছিল হঠাৎ তাহারা পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠের স্বাভাবিক কোমল এবং তীব্র সুরগুলি সকলের কানে তৃপ্তি ঢালিয়া দিল। পৃঃ ১৯৬

আর *সাড়ার* পত্রলেখা একটি গান গাওয়ার পর তাকে আরেকটি গানের জন্যে অনুরোধ করা হলে সে–

> যথারীতি রাজি হইল না। সে ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ কি বিশ্রী গরম পড়িয়াছে, ইত্যাদি। ১/১৩৩

শ্রীশের কল্পনায় তটিনীর বর্তমান ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে এইভাবে—

> বিলাসী কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ, নিজের প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তার চারপাশে ভিড় করে বসে আছে, আর গানের সুরে, হাসির হিল্লোলে, দেহের ভঙ্গিমায়, চোখের ইঙ্গিতে প্রত্যেককে সে তুষ্ট ক'রে চলেছে। *পথিক*/৪২২

আর *সাড়ার* পত্রলেখা—

> সে-সন্ধ্যায় অত্যুজ্জ্বল আলোর নিচে সুসজ্জিতা সুন্দরী পত্রলেখাকে ঘিরিয়া চারিদিক হইতে মৃদু স্তবগুঞ্জন উঠিতেছে; এক করুণাময়ী দেবীর মতো সে ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করিতেছে– কাহাকেও একটু বাঁকা হাসি, কাহাকেও বা দুইটি ছোটো কথা। ১/১২৯

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্র গ্রন্থভুবনে আত্মগোপন করে বৈরী বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ লাভে প্রয়াসী হয়েছে। *পথিকের* সুপ্রকাশের বই পড়ার চেয়ে কেনার নেশা রয়েছে। ঘরে ঢুকলেই তার বড়ো বড়ো আলনারী-ঠাসা বই নজরে পড়ে। এমনি বই রয়েছে বেদের সৌম্যর ঘরে—

> চারিদিকে অতিকায় কতগুলি আলমারি– কাঁচগুলি প্রায়ই সব ভাঙা, সারি-সারি রাশি-রাশি বই সাজানো এলোমেলো করে– মেঝের উপর একগাদা বই টাল করে ফেলা– হিজি-বিজি। ১/২৪০

বই পড়ার নেশা সুতীব্র হয়ে ধরা পড়েছে এই সৌম্য ও *সাড়ার* সাগরের মধ্যে।

বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে প্রচলিত দু'টি ধারা– গান্ধীজীর অহিংস মতবাদআশ্রয়ী রাজনীতি ও মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক দর্শনআশ্রয়ী সাম্যবাদী রাজনীতির প্রথমটি *পথিকের* শ্রীশের চিন্তাচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আর দ্বিতীয় ধারাটি করেছে *পাঁকের* অশান্ত কর্মকারকে। এই মানসআদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছে তারা নিজের নিজের পেশা-নির্বাচনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে তারা দু'জনেই। গান্ধী-আদর্শের ধারক শ্রীশ খদ্দরের কারখানা খুলেছে, আর শ্রমিক-জীবন-সংশ্লিষ্ট থাকার বাসনায় জীবিকা নির্বাহের জন্যে অশান্ত বেছে নিয়েছে ঘোড়ার গাড়ির কচুরানের কাজ।

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছে *পথিকের* মুকুল ও *পাঁকের* অশান্ত। মুকুলের বক্তব্য—

> আমাদের দেশের মানুষ ভণ্ডামি ছাড়তে পারবে কি? আমাদের দেশের মানুষ হুজুক ছাড়া, গুরু ছাড়া পারবে কি চলতে কোন দিন? যখন আপনি জেলে যান, তখন আমাদের দেশের যে ব্যাপার দেখে গিয়েছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে তাই কি দেখছেন ?
>
> ... ঐ ক'দিনেই এত বদল হয়েছে, তারপর আপনার অন্যবন্ধুরা যখন ফিরবেন, তাঁরা তাঁদের জেলে যাবার 'কারণ'ও হয়ত ঠিক খুঁজে পাবেন না; আর বলবেন— What a blinking idiot I was ! *পথিক*/৬৫-৬৬

আর অশান্তর—

> এখানে যারা দেশ দেশ বলে চীৎকার করছেন ও করবেন তাঁরা যে দেশের 'দ'র জন্যেও কেয়ার করেন না এবং দেশ সম্বন্ধে তাঁদের দুর্ভাবনা যে কতটুকু তা আমি ভাল করেই জানি। তাছাড়া তাঁদের চিন্তা করারই ক্ষমতা নেই। তাঁরা মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেছেন— দেশ উদ্ধার কর, দেশের উন্নতি কর, স্বরাজ দাবী কর,...দেশের সত্যিকারের উন্নতি করতে গেলে আগে দরকার পরসাহায্যপুষ্ট অকর্মণ্য পরগাছাদের সমূলে উচ্ছেদ। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

সেকথা বলার সাহস তো দূরের কথা ভাবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই।...আমার কাছে দেশ নেই, স্বদেশীর হুজুক বুজরুকি... *পাঁক*ঃ ১/১০৯

রাজমিস্ত্রীর অধীনে যোগাড়ের কাজ করতে গিয়ে *পাঁকের* নারী-শ্রমিক নেত্য ভারা থেকে পড়ে যায়, তার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগার কথা জানা যায়। *বেদে* উপন্যাসেও একইভাবে পড়ে গিয়ে মারা যায় টমরুর নববধূ আরেক নারী-শ্রমিক লখিয়া। এছাড়াও উভয় উপন্যাসে রয়েছে শ্রমিক-নির্যাতনের কথা। কখনো কখনো অকারণে, নিছক মজা পাবার জন্যে শ্রমিক, কর্মচারী কিংবা গৃহভৃত্য-নির্যাতনের সাক্ষী মেলে উভয় স্থানেই।

মাড়বারের অখ্যাত পল্লীতে প্লেগ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে *পথিকে*। সেখানে, অসুস্থ মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন বিকাশের জনকজননী– সুচারু ও সন্ধ্যাতারা। আর *পাঁকে* মুচি ও মেথরবস্তিতে দেখা দিয়েছে জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা। অনলসভাবে ঘুরে ঘুরে সেখানে সেবা ও চিকিৎসাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন পাদ্রী স্ট্যানলি ও অশান্ত কর্মকার। উভয় উপন্যাসেই রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে লেখকদ্বয়ের উক্তি সাযুজ্যপূর্ণ। মাড়বারের 'সেই পল্লীতে প্লেগ মানুষের সংখ্যা হ্রাস করছিল' *পথিকে*। আর *পাঁকে* 'মুচিপাড়া আর তার পাশের মেথর-বস্তির অশোভন ও বোধহয় অনাবশ্যক জনসংখ্যা-সমস্যার মীমাংসা করার ভার নিয়েছিল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও তারই নিকট ও দূরসম্পর্কীয় কয়েকজন জ্ঞাতি-গোত্র'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যে যে সমাজবিচ্ছিন্ন ছিন্নমূল ব্যক্তিচেতনার উদ্ভব হ'লো, তারই রোমান্টিক প্রকাশ হয়েছে বোহেমীয় চরিত্রে। এমনি ধরনের চরিত্র-সৃষ্টির আগ্রহ লক্ষ করা যায় আলোচ্য কথাকারদের মধ্যে। এরকম বন্ধন-অসহিষ্ণু বোহেমীয় চরিত্রের সন্ধান মেলে *পথিকের* মুকুল এবং *বেদের* কাঞ্চন, দাদাবাবু ও অরুণের মধ্যে। তাদের অনিকেত মানসগঠনের পরিচয় রয়েছে মুকুলের উক্তি ও আচরণে। তারা ছাড়াও প্রচ্ছন্ন বোহেমিয়ানিজমের লক্ষণ রয়েছে *পথিকের* শ্রীশ ও *সাড়ার* সাগর-সত্যবানের মধ্যে। প্রত্যক্ষ কিংবা প্রচ্ছন্ন এই বোহেমিয়ান স্বভাবের কারণে কোনো চাকরিতে স্থিত হতে পারেনা কাঞ্চন ও সত্যবান। আর তাই প্রথমজন বস্তিনারী পানওয়ালী পুতলির অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, অন্যজন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে পতিতানারী নির্মলার অর্থে। দু'টি নারীই অন্তরৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ মানবী হলেও বাহ্যিক চেহারা তাদের অসুন্দর।

নারীপুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কে বন্ধুত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে *পথিক* এবং *বেদে* উপন্যাসে। *পথিকের* মায়ার উক্তিতে রয়েছে এর পরিচয়—

> বন্ধুত্বটা কি কিছু নয় জগতে? সেটার প্রয়োজন নেই জীবনে? আমরা স্বামী খুঁজি, স্ত্রী খুঁজি, প্রেম খুঁজি, কিন্তু বন্ধু বা বন্ধুত্ব খুঁজি না। পৃঃ ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

বেদের কাঞ্চন এ সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও নারীপুরুষের বিয়ের চেয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিয়েছে। বনজ্যোৎস্না ও তার দেবর এবং মৈত্রেয়ী ও তার নিজের মধ্যেকার সম্পর্কের উল্লেখে এর প্রমাণ মেলে।

বিয়ের বন্ধনহীন একত্র বসবাসের কথা রয়েছে *পথিক* এবং *সাড়ায়*। বিয়েবিহীন জীবনযাপনের মধ্যেই বিকাশকে জন্ম দিয়েছেন তার জনকজননী *পথিক* উপন্যাসে। আর *সাড়ায়* সত্যবান-নির্মলা বিয়ে ছাড়াই এক সঙ্গে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও ভালোবাসার প্রশ্নে দান্তে-বিয়েত্রিচের কথা উচ্চারণ করেছে *পথিকের সুপ্রকাশ* এবং *বেদের কাঞ্চন*।

উপন্যাসের নায়কচরিত্র রূপে বিবেচিত হয়েছে জনকজননীর অবৈধ সন্তান *পথিক* উপন্যাসের মুকুল, *পাঁকের* অশান্ত আর *অসাধু সিদ্ধার্থের* নটবর। এদের মধ্যে মুকুল ও অশান্তের জন্ম-পরিচয় জানা যায় না।

সহায় সম্বলহীন শিশুদের জননীসদৃশা নারী *পথিকের* তটিনী এবং *অসাধু সিদ্ধার্থের* অজয়া। তটিনী চলে যাবার পূর্বে শ্রীশকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছে—

> তুমি মানুষ করবে সহায় সম্বলহীন সন্তানদের। মনে রেখো তারা আমারই সন্তান। ...আমি তাদের দেখব না কোনদিন, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি কথা আমায় জানিও; আর জানিও তাদের মা একজন আছে যে তাদের ভালবাসতে শিখছে। পৃঃ ৪৫২

আর নটবরকে রজত জানাচ্ছে—

> অজয়ার অনেকগুলি পালিত পুত্রকন্যা আছে। রাস্তা থেকে অনাথ ছেলেমেয়ে কুড়িয়ে এনে— তা সে যে জাতেরই হোক, যেভাবেই তাদের জন্ম হয়ে থাক— কুড়িয়ে এনে, এক ডিপো করেছে, সেখানে নিয়ে তুলবে। ছ'মাসেই ছাব্বিশ-সাতাশটি সংগ্রহ হয়েছে। ১/১০৬

পথিক এবং *বেদেতে* রয়েছে বধূ-নির্যাতনের কথা। *পথিকের* রাধা নিগৃহীত হয়েছে তার নির্যাতক স্বামীর দ্বারা। তার উক্তিতে এ নির্যাতনের ধরন জানা যায়—

> আমার প্রথম মেয়ে আমার স্বামীর পদাঘাত বুকে নিয়ে অসময়ে আমার কোলে এল। কিন্তু পৃথিবীর আলো-বাতাস তার সইল না— তখন আমার পুতুল- খেলার বয়স কাটে নি।
>
> —তারপরেও তিনটি সন্তান এই স্বেচ্ছাচারী স্বামীর অত্যাচারে পৃথিবীতে এসেই বা আসবার পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। পৃঃ ৩৫৫

বেদেতে সৌম্যের দিদি নির্যাতিত হয়েছে তার স্বামী ও শাশুড়ি কর্তৃক। সৌম্যের উক্তিতে জানা যায়—

Dhaka University Institutional Repository

> দিদিকে ওর স্বামী আর শাশুড়ী ঘরে ঝুলিয়ে রেখে লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাঁকা দিত। স্বামী একটু আধুনিক ছিল, হাস্টারের বাড়ি মারত। শাশুড়ী ছিল সাবেকি, দিদির হাতটা মেঝের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে ছেঁচত। ১/২৫৪

অর্থবিত্ত এবং বাহ্যিক আবরণে অভিজাত অথচ মূলত অসংস্কৃতমনা মানুষদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে *পথিক* এবং *সাড়ায়*। অর্থপ্রাচুর্যের জোরে সমাজে এরা প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মর্মগত শূন্যতাই এদের আশ্রয়। *পথিক* উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে– সামাজিক মিলনানুষ্ঠানে পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ পোষণ, বিষোদ্গার, পরচর্চা ইত্যাদির ভাষাচিত্র রূপায়ণে রয়েছে এর পরিচয়। *সাড়ায়* রয়েছে– যথার্থ যোগ্যতাবিহীন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার অপপ্রয়াসের চিত্রায়ণ।

বেদের কাঞ্চন ও *সাড়ার* সাগরের মধ্যে মাঝে মাঝেই স্ফুরিত হয়েছে নস্টালজিক বেদনার অনুভূতি, প্রত্যাবর্তন করেছে তারা কৈশোরানুভূতিকেন্দ্রিক তাদের মানসাশ্রয়ে। রোমান্টিক অতৃপ্তি-তাড়নায় কাঞ্চন স্থির হতে পারেনি কোথাও, পথে পথে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে। সাগরেরও আপাতনিশ্চিন্ত, পরিতৃপ্ত, সুস্থিত জীবনের অন্তরালে মূলত বহমান ছিল এক আগ্রাসী অতৃপ্তি। এরই কারণে সামান্য ইশারাতেই সে ঘরের আরাম, স্ত্রীর বাহুবন্ধন, পিতার স্নেহচ্ছায়া এক মুহূর্তে সরিয়ে ফেলে চলে আসতে পেরেছে নগর কলকাতায়।

বেদের সৌম্য ও *সাড়ার* সাগর অদৃশ্য অধরা প্রিয়ার সঙ্গে মানসসম্মিলনে খুঁজে পেয়েছে যেন অমোঘ অমৃতলোকের আভাস। নোফালিসের নীলফুলের কথা উচ্চারিত হয়েছে *বেদেতে*, কাঞ্চন ও সৌম্যের কথোপকথনের মধ্যে। আর *সাড়ায়* প্রকাণ্ড এক নীলফুল সাগরের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে।

নগর-সংশ্লিষ্ট বস্তি ও তার পরিবেশ, বস্তিবাসী এবং তাদের জীবনবাস্তবতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে *পাঁক* এবং *বেদেতে*। এখানকার বিরূপ পরিবেশের প্রভাবে নষ্টতার সীমা অতিক্রম করেছে উভয় উপন্যাসের কিশোর-কিশোরীরা। *পাঁকে* তারা আধপোড়া কয়লা কুড়োয়, বিচিত্র বুলি আউড়ে আউড়ে ভিক্ষে করে। জনকজননীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আগ্রহে এদের কেউ হয় চোর, কেউ গাঁটকাটা, পতিতা কিংবা কুলি। জনক-জননীর সংশ্লিষ্টতার কথা জানা যায় আহ্লাদীর মানসভাবনায়–

> শুধু হাতে ফিরলে বাড়িতে মা বিশ্বাস করবে না, বলবে, 'সব খেয়ে এসেছিস'।১/৯৮

এভাবেই দশবছরের আহ্লাদী ভিক্ষের বুলি আওড়াতে দক্ষ হয়ে উঠেছে এবং তার ভাই নয় বছরের শশী হয়ে উঠেছে সমস্ত গালাগালে দুরস্ত। *বেদেতেও* অনাথ আশ্রমের কিশোর সদস্যরা ভিক্ষায় বেরুতে বাধ্য। আশ্রমের নেতিবাচক পরিস্থিতির প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তারাও। তারা বিড়ি ফুঁকতে, মারামারি কিংবা প্রতারণায় যতোটা পটু, পড়াশোনায় তার কিছুই নয়। মিথ্যেভাষণে এবং গালাগালে তারা দুরন্ত, যৌনমিলনেও পিছিয়ে নেই। একমাত্র কিশোরী সদস্য আহ্লাদি, সেও যৌনকর্মে লিপ্ত। *পাঁকের* আহ্লাদী এবং *বেদের* কাঞ্চনের আওড়ানো ভিক্ষাবুলির সাযুজ্য লক্ষ করার মতো।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে মানুষের স্বভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব– মনোবিজ্ঞানের এ তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে *পথিক* এবং *পাঁক* উপন্যাসে। *পথিকে* সুবর্ণ এবং *পাঁকে* আহ্লাদীর পরিবর্তিত চিন্তা, রুচি ও আচরণে রয়েছে এর সাক্ষ্য।

পাঁক উপন্যাসে যৌবনচাঞ্চল্যে অস্থির, নির্ঘুম নেত্য বিরক্ত হয়েছে পাশের ঘরের ঘুমন্ত বাড়িওয়ালী মোটা গয়লানীর নাক ডাকার শব্দে। তাকে 'থাবড়া দিয়ে জাগিয়ে' দিতে ইচ্ছে করেছে তার। একই মানসপরিস্থিতিতে, ঘুমন্ত 'আজিজ মিঞার নাকের কল বিগড়েছে' বলে তার নাকের মধ্যে কুপির কেরোসিন ঢেলে দিতে ইচ্ছে হয়েছে বেদের কাঞ্চনের।

Dhaka University Institutional Repository

গোকুল নাগ যেহেতু একটিমাত্র উপন্যাসই লিখেছিলেন, সেহেতু সেই রচনার সঙ্গে তাঁর অন্য উপন্যাসের তুলনার কোন সুযোগ নেই। তবু ওই একটিমাত্র উপন্যাস সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "পথিক' "আধুনিক" উপন্যাসের পথ দেখাইয়াছে'।[১]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলির আলোচনায় আমরা দেখেছি, তাঁদের প্রত্যেকের অন্য রচনায়, নিজের নিজের প্রথম উপন্যাসের কিছু না কিছু অনুসৃতি আছে। পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসে আলোচ্য পাঁচটি উপন্যাসের কোনো ছায়াপাত ঘটেছে কিনা, এ-প্রসঙ্গ এখন অনিবার্যভাবে এসে যায়। এসব উপন্যাসের যে দুটি লক্ষণ তখন বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তব জীবনচিত্রের অঙ্কন এবং সমাজবিগর্হিত যৌন সম্পর্কের আলেখ্যরচনা করে তার পক্ষসমর্থন। তবে প্রথম উপন্যাসে সকলেই যে তা করেছিলেন, তা বলা চলে না। *পথিক* ও *সাড়া* মধ্যবিত্ত মানুষের কাহিনী, কিন্তু তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে এই মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা এবং তুলনায় অসামাজিক বলে বিবেচিত জীবনধারার অকৃত্রিমতা।

উত্তরকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) রচনায় এই লক্ষণগুলি সমীকৃত হয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) ও *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)তে আমরা একইসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবনধারার বাস্তব পরিচয় পাই। অন্নের ক্ষুধা এবং শ্রেণীগত পরিচয়-নির্বিশেষে নরনারীর যৌনকামনার কথা সেখানে খুব অকপটভাবে বলা আছে। দ্বিতীয় বিষয়টির বিস্তার আমরা লক্ষ করতে পারি *সহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪৬), *অহিংসা* (১৯৪৮),এবং আরো প্রবলভাবে *চতুষ্কোণে* (১৯৪৮)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব আসন নির্মাণ করেছেন বীরভূমের আঞ্চলিক জীবনচিত্র অঙ্কন করে। লক্ষ করা যাবে যে, *রাইকমলে* (১৯৩৪) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, *কবিতে* (১৯৪২) কবিয়াল গোষ্ঠীর এবং *হাঁসুলি বাঁকের ইতিকথায়* (১৯৪৭) কাহার-সমাজের জীবনযাত্রার যে-ছবি তিনি এঁকেছেন, তা অভূতপূর্ব। বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এখানে যেমন গভীর যোগ ঘটেছে সহানুভূতির, তেমনি এরই মধ্যে বৈষ্ণবীয় প্রণয়লীলা, কবিয়ালদের যাযাবর-জীবনের মধ্যে দৈহিক উপভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং কাহারদের কারো কারো অবৈধ যৌনলালসা জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটির উপর আলোক-সম্পাত করেছে।

বেদে ও *পাঁকের* মতো নিম্নবর্গীয় বাস্তবজীবনের চিত্রকররূপে মনীশ ঘটক ওরফে যুবনাশ্ব (১৯০১-৭৯) খ্যাত ও বিতর্কিত হয়েছিলেন *পটলডাঙার পাঁচালীর* (১৯৫৬) গল্পগুলো লিখে। এইসব গল্পের বৈশিষ্ট্য অন্তত তাঁর *কনখল* উপন্যাসেও লক্ষ করা যাবে।

প্রবোধকুমার সান্যালকে (১৯০৭-৮৩) আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের লেখক বলে মনে হয়। কিন্তু, অন্তত একটি উপন্যাস *বনহংসীতে* তিনি একই সঙ্গে চিত্রিত করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অন্নবস্ত্রের অভাবের বাস্তবতাকে এবং অসংযত যৌনলালসাকে। এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাধারণভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নরনারীর কামহীন ভালোবাসার কথা বলতেই পছন্দ করেন বেশি, তবু মধ্যে মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা ও বন্ধনমুক্ত জীবনের জন্যে তাঁর পাত্রপাত্রীর যে প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা আমাদের আলোচ্য উপন্যাস পাঁচটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আরো কিছু উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সুবোধ ঘোষের (১৯১০-৮০) *গঙ্গোত্রী* (১৯৪৭) উপন্যাসে দুর্নিবার লালসার এবং প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যানের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা মানুষের মনের গভীরের প্রবৃত্তিকে আলোতে টেনে নিয়ে এসেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-৭০) *উপনিবেশে* (১৯৪৪) নরনারীর এই আদিম প্রবৃত্তির অনাবৃত রূপটি যেমন দেখা যায়, তেমনি *বিদূষকে* (১৯৫৯) নিম্নবর্গের মানুষের যাযাবর জীবনবৃত্তি ও অনিরুদ্ধ যৌনকামনার পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (১৯০৯-৬৯) *বৃত্ত* (১৯৪২) উপন্যাসে বিবাহিত জীবনে অতৃপ্ত নরনারীকে দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে বহুজনের মধ্যে সেই তৃপ্তি খুঁজতে দেখা যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-৭৫) *দেহমন* উপন্যাসেও তেমনি এমন পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা অবাধ যৌনসংসর্গের মধ্যে জীবনের সার্থকতা সন্ধান করেছে।

তবে অসামাজিক যৌনজীবনের কাহিনী রচনায় হয়তো সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন সমরেশ বসু (১৯২৪-৮৮)। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর তিনটি মাত্র উপন্যাসের নাম করা যায়ঃ *উত্তরঙ্গ*, *বিবর* (১৯৬৫) ও *প্রজাপতি* (১৯৬৭)। উল্লেখযোগ্য যে, অশ্লীলতার দায়ে *প্রজাপতি* উপন্যাস ও তার লেখক আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং যাঁরা তাঁর পক্ষসমর্থন করতে আদালতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। অন্যত্র— যেমন *বি. টি. রোডের ধারে*, *শ্রীমতী কাকে* (১৯৫৩) বা *গঙ্গায়* (১৯৫৭) সমরেশ বসু অতি সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন ও তার অমিত সম্ভাবনার কথা বলার চেষ্টা করেছেন। *গঙ্গায়* মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের যে- জীবনালেখ্য দেখি, তার মধ্যে অভিনবত্ব ও নৈপুণ্য—দুই আছে। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈতমল্ল বর্মনের (১৯১৪-৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) উপন্যাসটি স্মরণীয়। তিতাসপাড়ের মালো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা এমন দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আর কেউ অঙ্কন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তেমনি সুতীক্ষ্ণ বাস্তববোধ দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-৮২) দারিদ্র্যের ভয়াবহ চিত্র প্রকটিত করেছেন *বারো ঘর এক উঠোনে* (১৯৫৫)।

মধ্যবিত্ত জীবনের যে অসংগতি, বিতর্কপ্রিয়তা ও নৈঃসঙ্গ্যবোধের কথা আমাদের আলোচিত কোনো কোনো উপন্যাসে পাই, তার সমতুল্য চিত্র আছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের (জ.১৯০৪) *অসমাপিকা* (১৯৩০), *পুতুল নিয়ে খেলা* (১৯৩৩) ও ছয় খণ্ড *সত্যাসত্যে* (১৯৩২-৪২)।

হয়তো আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমরা যে সকল উদাহরণ দিয়েছি, তার উদ্দেশ্য একথা প্রতিপাদন করা নয় যে, সেসব রচনায় আমাদের আলোচ্য উপন্যাস পাঁচটির প্রভাব আছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, ওই পাঁচটি উপন্যাসে নতুন যা কিছু সূচিত হয়েছিল, তা

Dhaka University Institutional Repository

সেখানেই নিঃশেষিত হয় নি। বাস্তব জীবনযাত্রা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে গৃহীত জীবনধারা ও প্রচলিত মূল্যবোধ পালটে যায়। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটা অবশ্যম্ভাবী। গত সত্তর-আশি বছর ধরে বাংলার মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সুতরাং সেকালের জীবনচিত্র ও মূল্যবোধ অটুট থাকতো না। কিন্তু যে পাঁচটি উপন্যাস আমাদের মূল আলোচ্য, তা সেই সময়ে প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং বিকল্প জীবনযাত্রার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে শুধু সাহসিকতার সূচনা করেনি, যে পরিবর্তন তখনো অপেক্ষিত ছিল, যেসব প্রশ্ন দুরুচ্চার্য ছিল, তা সামনে নিয়ে এসে সবাইকে দেখিয়েছে ও শুনিয়েছে। এই অর্থেই এই পাঁচটি উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের যুগান্তরের সূচনা হয়েছে বলে দাবি করা যায়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ

পথিক ঃ (নতুন সংস্করণঃ কলকাতাঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৩), পৃঃ ১-৪৬৪।

পাঁক ঃ *প্রেমেন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃঃ ৬৫-১৪২।

বেদে ঃ *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃঃ ১২১-২৬১।

অসাধু সিদ্ধার্থ ঃ *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৫), পৃঃ ৭৩-১৫২।

সাড়া ঃ *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, (নতুন সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃঃ ৭৯-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ *কাকজ্যোৎস্না, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৮০),পৃঃ ২৬৩-৪২৭।

ঃ *প্যান, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৯-৫২০।

ঃ *আকস্মিক, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১-১২৮।

ঃ *বিবাহের চেয়ে বড়ো, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯-৩৩০।

ঃ *প্রাচীর ও প্রান্তর, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১-১৫৩।

ঃ *কল্লোল যুগ* (সপ্তম সংস্করণ; কলকাতাঃ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৯৫)।

অচ্যুত গোস্বামী ঃ *বাংলা উপন্যাসের ধারা* (দ্বিতীয় সংস্করণ;কলকাতাঃ পাঠভবন, ১৯৬৮)।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ *কালের প্রতিমা* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৪)।

ঃ *মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে*, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪)।

অশ্রুকুমার সিকদার ঃ *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮)।

আকিমুন রহমান ঃ *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

আবুল আহসান চৌধুরী ঃ *জগদীশ গুপ্ত* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)।

কবীর চৌধুরী ঃ *সাহিত্য কোষ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)।

কার্ত্তিক লাহিড়ী ঃ *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতাঃ সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৪৭)।

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাদিত)ঃ *শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র* (কলকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৫৪)।

Dhaka University Institutional Repository

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮০)।

ঃ *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ* (কলকাতাঃ অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, ১৯৭৭)।

ঃ *বাংলা কথাসাহিত্যঃ প্রকরণ ও প্রবণতা* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণী, ১৯৯১)।

গৌতম ভট্টাচার্য ঃ *কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতাঃ প্যাপিরাস, ১৩৯৪)।

ঃ *'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৩)।

জগদীশ গুপ্ত ঃ *লঘুগুরু, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২) পৃঃ ৩-৬৯।

ঃ *মহিষী, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫-২০২।

ঃ *দুলালের দোলা, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩-২৬২।

ঃ *তাতল সৈকতে, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬৩-৩৩২।

ঃ *নন্দ আর কৃষ্ণা, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ১৩৯১, পৃঃ ৩-৬৬।

ঃ *রোমন্থন, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭-১১৬।

জয়ন্তকুমার ঘোষাল ঃ *বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা* (কলকাতাঃ জয়দীপ ঘোষাল, ১৯৯২)।

জীবেন্দ্র সিংহরায় ঃ *কল্লোলের কাল* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭)।

জ্যোতির্ময় ঘোষ ঃ *সত্য যে কঠিন* (দ্বিতীয় সংস্করণ; রাচীঃ নয়ন, ১৯৯৭)।

ঃ *রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ১৯৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)ঃ *বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮)।

দীপ্তি ত্রিপাঠী ঃ *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং,১৯৮৪)।

দেবকুমার বসু ঃ *কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য* (কলকাতাঃ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৩৮৭)।

দেবীপদ ভট্টাচার্য ঃ *উপন্যাসের কথা* (কলকাতাঃ সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬১)।

দেবেশ রায় ঃ *উপন্যাস নিয়ে* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১)।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ *উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস* (কলকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৮০)।

ঃ *নবপর্যায়ে সাহিত্যভাবনা* (কলকাতাঃ পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৮১)।

পিনাকী ভাদুড়ী ঃ *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতাঃ টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্, ১৯৮৮)।

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ *জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে* (কলকাতাঃ বেস্ট বুক্‌স, ১৯৯২)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ *মিছিল, প্রেমেন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০),পৃঃ ১৪৫-২২২।

ঃ *আগামীকাল, প্রেমেন্দ্র রচনাবলী*,প্রথম খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৫-২৯০।

ঃ *উপনায়ন, প্রেমেন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০),পৃঃ ৫৩-১৫৮।

ঃ *কুয়াশা, প্রেমেন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯-২৬০।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ঃ *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসু ঃ *রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য*, (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯)।

ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক', *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (কলকাতাঃ নবার্ক, ১৯৮৬)।

ঃ *আমার ছেলেবেলা, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২), পৃঃ ৪৮৭-৫৫০।

ঃ *আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৯-৪৬৫।

ঃ *সাহিত্য চর্চা* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১)।

ঃ *অকর্ম্মণ্য, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড (নতুন সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃঃ ২০৫-২৮৮।

ঃ *মন-দেয়া-নেয়া, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-১০৩।

ঃ *যবনিকা পতন, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫-২৮৫।

ঃ *রডোডেনড্রন-গুচ্ছ, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৭-৩৮৪।

ঃ *সানন্দা, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২)।

ঃ *যেদিন ফুটলো কমল, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫-২৮৫।

ঃ *অসূর্যম্পশ্যা, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৩-৪৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ *ধূসর গোধূলি, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, চতুর্থ খণ্ড (বিশেষ সংস্করণ; গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২),পৃঃ ৩-১১৮।

ঃ *একদা তুমি প্রিয়ে, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* ,চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯-২০৪।

ঃ *সূর্য্যমুখী, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫-২৯০।

ঃ *পরস্পর, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, ষষ্ঠ খণ্ড (বিশেষ সংস্করণ; কলকাতাঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২),পৃঃ ২৬১-৩৭৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* (কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫২)।

ঃ *শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী* (কলকাতাঃ বুকল্যান্ড লিমিটেড, ১৯৪৮)।

ভূঁইয়া ইকবাল ঃ *বুদ্ধদেব বসু* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯২)।

ভূদেব চৌধুরী ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, চতুর্থ পর্যায় (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪)।

ঃ *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার* (চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯)।

মাহ্‌বুব সাদিক ঃ *বুদ্ধদেব বসুর কবিতাঃ বিষয় ও প্রকরণ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)।

মুহম্মদ রেজাউল হক ঃ *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

মোহিতলাল মজুমদার ঃ *সাহিত্য-বিতান* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ বিদ্যালয় লাইব্রেরী, ১৩৮৮)।

রণেন্দ্রনাথ দেব ঃ *বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়* (কলকাতাঃ বুকল্যান্ড, ১৯৬৪)।

রবিন পাল ঃ *কল্লোলিত ছোটগল্প* (কলকাতাঃ বুকট্রাস্ট, ১৯৮৮)।

Dhaka University Institutional Repository

রামরঞ্জন রায় ঃ *প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক* (মেদিনীপুরঃ কুশপাতা, ১৯৮৬)।

ঃ *ছোটোগল্পের রূপশিল্পীঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র* (মেদিনীপুর ঃ কুশপাতা, ১৯৮৫)।

রামেশ্বর শ' ঃ *আধুনিক বাংলা উপন্যাস* (কলকাতাঃ উত্তরসূরী প্রকাশনী, ১৯৮২)।

শামসুল আলম সাঈদ ঃ *নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

শিশির চট্টোপাধ্যায় ঃ *উপন্যাস পাঠের ভূমিকা* (কলকাতাঃ বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, ১৯৬২)।

শীতল ঘোষ ঃ *ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতাঃ বর্ণালী, ১৯৭৮)।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস*. (পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৭৮)।

ঃ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (সপ্তম সংস্করণ, কলকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪)।

ঃ *ভূমিকা, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প* (কলকাতাঃ গ্রন্থম, ১৩৬৬)।

সজনীকান্ত দাস ঃ *আত্মস্মৃতি*, প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ ডি, এম, লাইব্রেরী, ১৩৬১)।

সত্যব্রত দে ঃ *রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা* (কলকাতাঃ জিজ্ঞাসা,১৯৭১)।

সমরেশ মজুমদার ঃ *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর* (কলকাতাঃ রত্নাবলী, ১৯৮৬)।

সমীর সেনগুপ্ত ঃ *বুদ্ধদেব বসুর জীবন* (কলকাতাঃ বিকল্প প্রকাশনী, ১৯৯৮)।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৮)।

সুকুমার সেন ঃ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯)।

ঃ *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য* (পঞ্চম সংস্করণ; কলকাতাঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৩৮৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সুদক্ষিণা ঘোষ ঃ *বুদ্ধদেব বসু* (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭)।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ *শরৎচন্দ্র* (ষষ্ঠদশ সংস্ক রণ; কলকাতা ঃ এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৪)।

সুবীর রায়চৌধুরী ঃ *জগদীশ গুপ্তের গল্প*. (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১)।

সুমিতা চক্রবর্তী ঃ *প্রেমেন্দ্র মিত্র*. (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮)।

সোনামণি চক্রবর্তী ঃ *শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য* (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯২)।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় ঃ *বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতাঃ জগদীশ গুপ্ত* (কলকাতাঃ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক প্রবন্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ "বিচিত্রা হে বিচিত্রা", *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১।

অনিলবরণ রায় ঃ "আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ", *বিচিত্রা*, ভাদ্র ১৩৩৬।

অবন বসু ঃ "তিন ঈশ্বরের কালিকলম", *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭।

অমলেন্দু বসু ঃ "অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য", *কল্লোল*, আষাঢ় ১৩৩৪।

কবিতা সিংহ ঃ "জীবিতকালেই কিংবদন্তী শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন চিরতরুণ মানুষ", *যুগান্তর*, ১৯৮৮।

জগদীশ ভট্টাচার্য ঃ "শনিবারের চিঠি' ও সজনীকান্ত দাস", *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭।

দেবীপদ ভট্টাচার্য ঃ "বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর", *প্রবাসী*, বৈশাখ ১৩৩৩।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ "সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ", *প্রবাসী*, বৈশাখ ১৩৩৩।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ "কল্লোলের কাল", *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১।

বুদ্ধদেব বসু ঃ "অতিআধুনিক বাঙলা সাহিত্য", *কল্লোল*, ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৪।

ঃ 'ছোটগল্পের কথা', *কল্লোল*, ভাদ্র ১৩৩৪।

ভীষ্মদেব চৌধুরী ঃ "জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ছোটগল্প", *সাহিত্য পত্রিকা*, অষ্টাবিংশ বর্ষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা,১৩৯১।

রবিন পাল ঃ "কল্লোলিত কল্লোল", *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ঃ "সাহিত্যের নবকলেবর", *উত্তরা*, তৃতীয় বর্ষঃ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৪।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ "বাংলা ছোটগল্পের তিন দিকপাল", *দেশ*, ৫৯ বর্ষঃ ৩১ সংখ্যা, ৩০ মে ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সুনীল দাস ও অলমিতি
বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "বিশ শতকের সাময়িকপত্র নির্বাচিত তালিকা", *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭।

সুবীর রায়চৌধুরী ঃ "কবিতা' ও সে যুগের লেখক সমাজ', *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭।

সুমিতা চক্রবর্তী ঃ "সাহিত্যের মতোই নিত্য বহমান তাঁর সাহিত্যিক সত্তা", *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৮মে, ১৯৮৮।